শ্রীপত রায়, অমৃত রায় ও সারা ভারত শান্তি ও সংহতি
সংসদের সৌজন্যে।

প্রথম সংস্করণ ঃ ২০শে নভেম্বর '৬০ ॥

প্রকাশিকা ঃ আরতি চক্রবর্তী। অন্বেষা, ৮৯এ, এন, কে, ঘোষাল রোড,
কলকাতা ৭০০০৪২।

মুদ্রণ ঃ পরেশ পান। ইন্দ্রলেখা প্রেস, ১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলকাতা ৭০০০০৬।
বৈদ্যনাথ ঘোষ। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেস, ৪১।১, হিদারাম ব্যানার্জী লেন
কলকাতা ৭০০০১২ (উপন্যাস অংশ)

বাঁধাই ঃ ফ্যান্সি বাইণ্ডার্স। ১৪৭, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলকাতা ৭০০০০৯।

ব্লক ঃ টাইপোগ্রাফিক আর্টস। ৫৪।১ বি. পটুয়াটোলা লেন,
কলকাতা ৭০০০০৯।

প্রেমচন্দ শতবার্ষিকী সংকলন

[illegible] । অন্বেষা । কলকাতা ।

সূচীপত্র

গল্পগুলি অনুবাদ করেছেন ননী শূর

অন্যান্য অনুবাদকদের মধ্যে আছেন সৌমেন দত্ত,

সিদ্ধার্থ ঘোষ, বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রদীপ দাশগুপ্ত

প্রকাশিকার নিবেদন

বাংলা প্রকাশনার ভবিষ্যত ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে আসছে। তার নানাবিধ কারণ নিয়ে আমরা জনকয়েক বসে আলোচনা করছিলাম। নিছক আড্ডা বলা যেতে পারে। আলোচনা প্রসঙ্গে অগ্রজ স্থানীয় প্রদীপ দাশগুপ্ত হঠাৎ বল্লেন, 'জন্ম-শতবর্ষে "পশ্চিমবঙ্গ শান্তি ও সংহতি পরিষদের" তরফ থেকে বাংলার পাঠক-পাঠিকাদের কাছে স্বল্প পরিসরে প্রেমচন্দের একটা পরিচিতি রাখতে চাই। ব্যবস্থা করতে পারেন ?' প্রেমচন্দ সম্পর্কে আমাদের দুর্বলতা অন্তহীন, কিছুমাত্র দ্বিধা না করে ওঁকে জানালাম, 'আমাদের সামর্থ্য সীমিত, তবু এমন একটা কাজের সুযোগ পেলে নিষ্ঠার সঙ্গে সে দায়িত্ব পালন করবো।' সেই শুরু।

আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে ৺প্রিয়রঞ্জনসেন ও স্বর্ণপ্রভা সেন অনূদিত 'গোদান' বাংলায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি বহুকাল দুষ্প্রাপ্য। অধুনা কিছু ছোটগল্পের সংকলন ও একটি ছোট উপন্যাস বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। তবে তা থেকে প্রেমচন্দের বিশাল সাহিত্যসৃষ্টির একটি সার্বিক পরিচয় কোনক্রমেই পাওয়া যায়না। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের এই প্রচেষ্টার পরিকল্পনা। বাংলার সাধারণ মানুষ যদি প্রেমচন্দ সম্পর্কে উৎসাহী হন, তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে ঔৎসুক্য যদি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় তবেই আমাদের উদ্দেশ্য সার্থক।

এই প্রকাশনার ব্যাপারে বহুজনের কাছে আমাদের ঋণ থেকে গেলো। এঁদের কাউকেই নিছক 'ধন্যবাদ' জানিয়ে ছোট করলাম না।

কলকাতা। সেপ্টেম্বর '৮০ ॥ **মনীষা ভট্টাচার্য**

সম্পাদকের কথা

এ বছরের মে মাসে বিশ থেকে বাইশে পর্যন্ত দিল্লীতে সারা বিশ্বের লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা এসেছিলেন প্রেমচন্দ শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য। বিশ্বশান্তি সংসদ আয়োজিত এই সম্মেলনে সমবেত ভারতবাসীদের পক্ষে এ অভিজ্ঞতা ছিল এক আনন্দ ও গর্বমিশ্রিত বিস্ময়ের যে এই স্বল্পায়ু ও ঘরকুনো ভারতীয় কথাশিল্পী তাঁর কিছু অতুলনীয় সৃষ্টির প্রসাদ গুণে আজ দেশ ও কালের গন্ডী পেরিয়ে শতায়ু ও বিশ্বনাগরিকত্ব লাভ করেছেন। প্রেমচন্দ আজ শুধু উর্দু বা হিন্দী ভাষার লেখক নন, ব্যাপক অনুবাদের মাধ্যমে ভারতীয় ভাষা সমূহের এবং বিশ্বের প্রায় সব কটি প্রধান ভাষার পরিচিত লেখক।

দুঃখের বিষয়, আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যের লেখক হওয়া সত্ত্বেও, বাংলা ভাষায় প্রেমচন্দের অনুশীলন সে তুলনায় সামান্যই। তার একটা কারণ হতে

পারে এই যে তাঁর সময়ে আমাদের বাংলা সাহিত্যের আকাশে রবি এবং চন্দ্র দুই-ই প্রখর প্রভায় দীপ্যমান ছিলেন— অনতিদূর এই নক্ষত্রের আলো তেমন পৌঁছাতে পারেনি। বয়স এবং রচনার দিক থেকে শরৎচন্দ্র এবং প্রেমচন্দ ছিলেন সমসাময়িক। শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশায় তাঁর পুস্তক প্রকাশনা—১৯১৩-এ বড়দিদি থেকে ১৯৫৩-এ বিপ্রদাস পর্যন্ত। বয়সে বছর চারেকের কনিষ্ঠ এবং মৃত্যুতে দু বছর অগ্রগামী প্রেমচন্দ বই লিখেছেন ১৯০৬ থেকে ১৯৩৬। সাহিত্যের আসরে শরৎচন্দ্র কিছু কনিষ্ঠ হলেও, হিন্দী-ভাষী অঞ্চলে তাঁর ব্যাপক অপ্রতিহতগতি জনপ্রিয়তার দ্বারা মনে হয় প্রেমচন্দ আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এবং তাঁর প্রথম হিন্দী গল্প গ্রন্থ 'সপ্ত সরোজে'র একটি ভূমিকা লিখিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁর কাছে কলকাতায় এসে ছিলেন। শরৎচন্দ্র নাকি গল্প শুনে অভিভূত হয়ে বলেছিলেন, এত উচ্চাঙ্গের গল্পের ভূমিকা লেখার) অধিকার রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কারুর নেই। সপ্তসরোজ গ্রন্থের ভূমিকায় (১ম সংস্করণ উল্লিখিত এই কাহিনীর মধ্যে যে কোন অতিরঞ্জন ছিল না, এবং প্রেমচন্দের অনেক গল্পই যে বিশ্ব-মানের অধিকারী, তাতে আজ আর কারোর সন্দেহ নেই।

রচনাকালের বিচারে প্রেমচন্দ শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক হলেও, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ১৮৬৫ সালের দুর্গেশনন্দিনী থেকে সুরু করে শরৎচন্দ্র, কল্লোল-কালি কলম-প্রগতি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তর পেরিয়ে তারাশঙ্কর-বিভূতি-মানিক বাঁড়ুজ্জেদের পরিণতি কাল পর্যন্ত প্রায় শতবর্ষে যে উত্তরণ ঘটল এবং যার শীর্ষবিন্দুতে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—হিন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক প্রেমচন্দ—তাঁর ত্রিশ বৎসরের সাহিত্য জীবনে সেই উত্তরণের সাধনা করে গেলেন। এ এক অতি বিস্ময়কর ঘটনা। হিন্দী সাহিত্যের শক্তি ও দুর্বলতার এ একটা গবেষণার দিক।

বঙ্গ সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছিলেন হিন্দী সাহিত্যে প্রেমচন্দের আবির্ভাব সম্বন্ধেও হুবহু সে কথাই দু'একটি গ্রন্থের নাম পালটে দিয়ে এ ভাবে বলা যায়ঃ কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই সুপ্তি,— কোথায় গেল সেই "চন্দ্রকান্তা সন্ততি" সেই "বস্তান-এ-খয়াল", সেই বালক ভুলান কথা,- কোথা হইতে আসিল এত আলো, এত আশা, এত সঙ্গীত এত বৈচিত্র্য। ·· হিন্দী সাহিত্য সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতই প্রেমচন্দ আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত মুষলধারে এসে হিন্দী সাহিত্যের নদী নির্ঝরিণীগুলিকে পরিপূর্ণ করে তুলেছিলেন,— কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এই আগমন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন "সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ"— প্রেমচন্দের ক্ষেত্রে এই বর্ণনাটি বোধহয় সুপ্রযুক্ত হবে না। প্রেমচন্দের গুণমুগ্ধগন তাঁকে ভালবেসে "উপন্যাস সম্রাট" উপাধি দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু এই মানুষটির

জীবনে, আচার-আচরণে, ভাষায় এবং গল্পে "রাজকীয়তার" কোন লক্ষণই দেখা যায় না। এদিক থেকে প্রেমচন্দ শরৎচন্দ্রের মতই ছিলেন সহজ, সরল, ঘরোয়া, বৈঠকী আলাপচারী এবং পাঠকের নিতান্ত আপনজন। সারা ভারতবর্ষে তাই আজও জনপ্রিয়তায় এ দু'জনের আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

সমাজ সংস্কারের নব্যভাবনা এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ এই উভয় লেখকেরই ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যকে আলোড়িত করেছিল, উভয়েরই সাহিত্যে রয়েছে নারীর জন্য সুগভীর মমতা ও একপ্রকারের পক্ষপাতিত্ব এবং অবমানিত লাঞ্ছিতের জন্য অপার করুণা। এও নিতান্ত দৈব যোগাযোগ নয় যে উভয়েরই গ্রন্থ রাজরোষে পড়ে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। কিন্তু, এটা সহজেই লক্ষ্য করা যাবে যে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে (এবং বলা যায় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পসমূহের পরিমন্ডলেও) গ্রামগঞ্জের খেটেখাওয়া সাধারণ মানুষের আনাগোনা যদিবা সুরু হয়েছে,—এবং যদিও তাদের কেউ কেউ আশ্চর্যজনক ঔজ্জ্বল্যে অবিনশ্বর, তাহলেও এঁদের সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু "ভদ্রলোকে"রাই। তিরিশের দশক থেকে বাংলা সাহিত্যে শুরু হয়েছিল এক নূতন ধারা। শৈলজানন্দের কয়লাখনি, তারাশঙ্করের রাঢ় বাংলা, বিভূতিভূষণের নিশ্চিন্দিপুর আর বনবাদার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মাতীরবর্তী জনপদ কিংবা প্রেমেন্দ্র মিত্রের পাঁক থেকে উঠে সংসার সংগ্রামে পঙ্কিল, চাষী মজুর আদিবাসী, আদিম প্রাগৈতিহাসিক ব্রাত্যজনেরা মিছিল করে পৌঁছাল এসে বাংলা সাহিত্যে। প্রেমচন্দের গল্পে উপন্যাসে দেখি এই মানুষেরা এসেছে অভ্রপ্রধারায় এবং ক্রমে হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু।

প্রেমচন্দের বলার ভঙ্গীটি লৌকিক এবং সাজ-সজ্জা অলংকার-প্রসাধনে উদাসীন। বাংলা সাহিত্যের রীতি থেকে তা আলাদা। উদারপন্থী বুদ্ধিজীবী-গণের হাতে গড়ে ওঠা বাংলা সাহিত্য সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে অর্জন করেছে পরিশীলিত ভাষা, দুজ্ঞেয় মনোলোকের গহনচারিতা ও বৈদগ্ধ্য, এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাঙালীর ভাবাবেগ ও সূক্ষ্ম অনুভূতি প্রবনতা। এর পাশে প্রেমচন্দকে মনে হতে পারে অত্যন্ত সাদামাটা এবং অনেক সময় অতিসরল। তাঁর চরিত্রগুলিকে তিনি যেন সৃষ্টি করেন না, মাঠ ঘাট প্রান্তর থেকে তাদের সরাসরি তুলে নিয়ে আসেন। পাঠক ও গল্পকাহিনীর মাঝখানে লেখক প্রায় অনুপস্থিত থাকেন। তাঁর দেশজ রীতি তুলসীদাসের ঐতিহ্যানুসারী, সহজ সরল, রসঘন, এবং মূল্যবোধে স্থির।

সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্যি যে প্রেমচন্দ সাহিত্য ও সমাজচিন্তায় সমসাময়িক পৃথিবীর চলমান ধারার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। তাঁর নিজের অনুদিত

বাংলা, উর্দু ও বিদেশী পুস্তক তালিকা থেকে এটা স্পষ্ট হবে। তাঁর বিভিন্ন লেখায় এক বিশ্ববোধ সর্বদাই সঞ্চারিত রয়েছে। তাঁর সর্বশেষ লেখা "মহাজনী সভ্যতার" কোথাও কোথাও রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ রচনা "সভ্যতার সংকটেরই" যেন আগমনী শুনতে পাওয়া যায়। আধুনিক যুগ চেতনার আধারে তাঁর নিতান্ত লৌকিক রীতি যে উৎকর্ষতা অর্জন করেছিল, তাকে অনেকেই টুর্গেনিভ গর্কি, শেখভ প্রমুখের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। প্রেমচন্দের বিখ্যাত গল্প "কফন" এই উৎকর্ষতার একটি ফসল। গল্পটি পড়ে অনেকের শরৎচন্দ্রের "অভাগীর স্বর্গে"র কথা মনে হতে পারে। কিন্তু শরৎচন্দ্রে যেখানে শুনি অন্ত্যজ মানুষের মোহভঙ্গের করুণ আর্তি, প্রেমচন্দে সেখানে দেখতে পাই এক ঋষিকল্প নির্মোহ।

আমরা এই সংকলনের সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রেমচন্দের একটি পূর্ণাবয়ব চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তাঁর জীবনী, তাঁর সাহিত্য কর্ম ও সমাজ চিন্তা বিষয়ে হিন্দীভাষার কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত লেখকের আলোচনা, বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত তাঁর পুস্তকের একটি সূচী এবং সর্বোপরি তাঁর রচনার কিছু নির্বাচিত অংশ চয়ন করে সেই চিত্র আমরা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। আমরা মনে রেখেছি যে দেশ এবং কালেই ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে, এবং কাল যেহেতু প্রবহমান—ব্যক্তিত্বেরও তাই ক্রমবিকাশ ঘটে। আমাদের নির্বাচিত প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাসে সেই বিকাশটিকেও দেখাবার চেষ্টা করেছি, এবং প্রেমচন্দের লেখা গুলিকে রচনা কালের ক্রমানুসারে সাজিয়েছি, যাতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর বিবর্তনটিকে ধরা যায়।

সংকলনটির পেছনে যাঁদের সহৃদয় সহযোগিতা পেয়েছি, তাঁদের সবার নাম বলা সম্ভব নয়; কিন্তু উক্ত বা অনুক্ত তাঁদের প্রত্যেকের প্রতিই আমাদের কৃতজ্ঞতা সমান। সংকলনটি প্রকাশে নানাভাবে উপদেশ দিয়েছেন প্রেমচন্দ পুত্র ও স্বয়ং সাহিত্যিক অমৃত রায়, কলকাতায় ভারতীয় ভাষা পরিষদের নির্দেশক ডঃ প্রভাকর মাচওয়ে, সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংসদের সাধারণ সম্পাদক ওম প্রকাশ পালিওয়াল, এবং বিশিষ্ট প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও লেখক চিন্মোহন সেহানবীশ। হিন্দী থেকে বাংলা রূপান্তর ও রচনা নির্বাচনের কাজে অহরহ সহায়তা করেছেন অগ্রজপ্রতিম বন্ধু সুলেখক মনমোহন ঠাকোর। অধ্যাপক ডঃ স্বরাজব্রত সেনগুপ্ত, ডঃ শরদ নাগর এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক কবি নচিকেতা ভরদ্বাজের কাছেও আমরা ঋণী। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভূমিকা এবং পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রচ্ছদ এই সংকলনের সৌকর্য অনেক বাড়িয়েছে। এই সংকলনের বিভিন্ন লেখক ও অনুবাদকের কাছেও আমরা ঋণ স্বীকার করি। প্রেমচন্দের লেখাগুলি এখানে তাঁর দুই পুত্র শ্রীপত রায় ও অমৃত রায়ের সৌজন্যে প্রকাশিত হল। পশ্চিমবঙ্গ

শান্তি ও সংহতি সংসদের সম্পাদকমণ্ডলী বিশেষতঃ শ্রদ্ধেয় অমিয় মুখোপাধ্যায় ও অজয় দাশগুপ্তের উৎসাহ এবং প্রকাশক সংস্থার পক্ষে বন্ধুবর প্রদীপ ভট্টাচার্যের সহযোগিতা ব্যতীত এই সংকলন প্রকাশ সম্ভব হত না।

এই সব সহযোগিতা সত্ত্বেও ত্রুটি বিচ্যুতি রয়ে গেল অনেক। আমরা সেজন্য ক্ষমাপ্রার্থী। বিভিন্ন হিন্দী উর্দু নাম সম্বন্ধে একটি অভিন্ন বানান রীতি অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। লেখক ও অনুবাদকগণের বানান আমরা এখানে ছেপেছি। অনুবাদক বা সংকলনকারীর যেখানে নাম নেই, সেখানে সমস্ত দায়িত্ব সম্পাদকের। কিছু কিছু মুদ্রণ প্রমাদ রয়েছে, কিন্তু একটি শুদ্ধিপত্র যোগ করে তাকে আর প্রকট করে না তুলে সদয় পাঠকের উপরেই শুদ্ধির ভার অর্পণ করলাম। ভারতীয় সাহিত্যের এক মহানায়কের প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ আমরা যে এই সংকলনটি প্রকাশ করলাম, তাতে তাঁর রচনা পাঠে ও প্রকাশে যদি বাঙালীর উৎসাহ বৃদ্ধি পায় তবে আমাদের পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করব।

পশ্চিমবঙ্গ শান্তি ও সংহতি সংসদ — প্রদীপ দাশগুপ্ত

১৭৪, লেনিন সরণী, কলকাতা ১৩

ভূমিকা

কথাশিল্পী প্রেমচন্দ

এখন ঠিক মনে নেই, সম্ভবতঃ ১৯১৮ সাল হবে। বেনারসে থাকতে সেই অল্প বয়সেই প্রেমচন্দের দু'একটি লেখা প্রথম পড়ি। তুলির রেখার টানের মত গল্প বলার ধরণ। পড়েই আকৃষ্ট হই। কিন্তু, হিন্দী সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের কোন আত্মীয়তা গড়ে ওঠবার মত অবস্থা ছিল না। সর্ব ভারতীয় তেমন কোন মঞ্চও তৈরী হয়নি। তাই সাহিত্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেনি কখনও। প্রেমচন্দকে পরেও দূর থেকে জেনেছি। তাঁর ছোটগল্প, উপন্যাস পড়েছি। মূল হিন্দীতে পড়েছি, আবার প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় যখন "গোদানে"র অনুবাদ করেন, তাও পড়ে ফেলেছি সঙ্গে সঙ্গে। পড়ে মনে হয়েছে প্রেমচন্দ ভারতীয় সাহিত্যের আসরে এক বিস্ময়কর পুরুষ।

কিন্তু, প্রেমচন্দকে শুধুমাত্র অন্য আর দশজন সাহিত্যিকের মত বিচার করলে, তাঁর মহিমা বোঝা যাবে না। অন্য অনেক লেখক তো আছেন বাংলা বা ইংরেজী সাহিত্যেও। ক'জনের শতবার্ষিকী আমরা এ ভাবে পালন করছি? প্রেমচন্দ সেই জাতের লেখক, যাঁর কাছে এলে মনে হয় ভাষাগত বিভেদটা তুচ্ছ। এ জাতের লেখকরা নিজেদের দেশকাল অতিক্রম করে অখণ্ড মানবতাকে সৃষ্টি করেন।

যখন আমরা ডিকেন্স, ফ্রাঁস বা গর্কি পড়ি, তখন দেখি যদিও নিজের দেশ কাল ও পরিবেশের মধ্যেই এঁদের প্রকাশ ও বিকাশ—তাহলেও ঐ গণ্ডীটুকু অতিক্রম করে সার্বজনীন এক মানবসত্তা প্রকট হয়ে পড়েছে। দেশ ভাষা ও জাতির প্রাচীর গুলো সব মিথ্যে হয়ে যায় এঁদের সামনে। এঁরা গল্প বানান না। এঁরা যখন মানুষের কথা লেখেন, তখন সমস্ত মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টি-গত, সমস্যা ও সম্বন্ধ গত যেসব বাস্তব বিভাগ রয়েছে—তাকে অতিক্রম করে অখণ্ড মানবতার উদ্ভাসন মনের চোখে ভেসে ওঠে। এঁরা হলেন ক্ষণজন্মা লেখক,—মানুষের ধারা পরিবর্তনের প্রবাহকে এঁরা বেগ ও তাৎপর্য দিয়ে যান। প্রেমচন্দ হলেন এই জাতের লেখক। আর সেইজন্যই ভাষার গণ্ডী ছাড়িয়েও তিনি আমাদের আকর্ষণ করেন।

প্রেমচন্দের লেখার ধরণ ছিল আশ্চর্যজনক। সহজ, সাধারণের ভাষা, —মানুষের মুখের বুলিতে তিনি অনায়াস ভঙ্গিতে গল্প বলতেন। বলতেন সাধারণ মানুষের গল্প—যাদের রাস্তায় ঘাটে গ্রামে গঞ্জে আমরা প্রতিনিয়তই দেখি, তাদের কথা। তাঁর হাতে মানুষের সুখ দুঃখ বেদনার সুরগুলি যেন অনায়াসে খেলা করত, এ এক আশ্চর্যজনক ঘটনা, না দেখলে বিশ্বাস হয়না। এ কোন পড়ে শুনে কমিউনিস্ট হওয়ার ব্যাপার নয়, —মানুষের মধ্যে চলে গিয়ে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া, তাদের বোঝা, তাদের মনের গভীরেও যে কত রহস্যের মণিমুক্তা আছে তা অনায়াসে তুলে আনা, তাদের নাড়ীর স্পন্দনকে সূক্ষ্মভাবে ধরতে পারা,—কোন আইডিয়ার প্রতিমূর্তি রূপে নয় জীবন্তভাবে তাদের ছবিতে তুলে ধরা—ক'জনে তা পারেন? বিপুল প্রতিভার অধিকারী না হলে এসব সম্ভব হত না। প্রেমচন্দের চরিত্রগুলির মত একেবারে প্রসাধনহীন, অবিকল, অকৃত্রিম মানুষ সাহিত্যে খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়।

প্রেমচন্দের এই অনায়াস, সাবলীল রচনাশৈলী সত্বেও কিন্তু তাঁর গল্পের মধ্যে এক অসামান্য নির্মাণ কৌশল লক্ষ্য করা যায়—যা তাঁর রচনাকে এক অপ্রত্যাশিত গভীরতা দেয়। ধরা যাক তাঁর "নমক কা দারোগা" গল্পটি। খুব পরিচিত গল্প, অনেকে হয়তো এর কাহিনীটুকু জানেন। মুন্সী বংশীধর নুনের দারোগার চাকরী পেল। ব্রিটিশ সরকার এই ঈশ্বর দত্ত দ্রব্যের ব্যবহারের ওপর যখন নিষেধ আরোপ করল, তখন এই নিয়ে ঘুষ প্রবঞ্চনা গেল বেড়ে, আর ভাল ভাল পদ ছেড়ে লোকেরা ব্রিটিশ প্রশাসনের নূতন বিভাগ নুনের দপ্তরের দারোগা হবার জন্য আকুল হয়ে উঠল। এমনি সময় বংশীধর যখন এই পদটি পেল, তখন তার ধর্মপরায়ণ পিতা ভাবলেন এতদিনে ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। কিন্তু, বংশীধর ছিল অন্য জাতের

মানুষ। এক রাত্রিতে বিরাট ধনশালী জমিদার পণ্ডিত আলোপীদীন যমুনা নদীর পোলের ওপর দিয়ে সারি সারি গরুর গাড়ীতে নুন চালান দেবার জন্য অকুতোভয়ে এগোচ্ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল এ সংসারে ন্যায় নীতি সবই লক্ষ্মীর হাতের খেলার পুতুল। তাই যখন এই বে-আইনী কাজের জন্য বংশীধরের কাছে ধরা পড়লেন, তখন তাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না। প্রথমে তাচ্ছিল্য এবং পরে বাক চাতুর্য ও ঘুষের দ্বারা অব্যাহতি চাইলেন। ঘুষের অঙ্কের প্রস্তাব অবিশ্বাস্য চল্লিশ হাজারে উঠল, কিন্তু, নুনের দারোগা ধর্মে অবিচল রইল। পণ্ডিত আলোপীদীন গ্রেফতার হলেন। মামলা আদালতে উঠল। পণ্ডিতজীকে দেখার জন্য বিস্মিত লোকেরা দৌড়ে এল। বিস্ময় এজন্য নয় যে তিনি এ কাজ কেন করলেন। বিস্ময়ের কারণ হল, তাঁর মত অসাধ্য সাধনকারী, ধন ও বাক্-পটুতার অধিকারী মানুষ কিভাবে আইনের হাতে ধরা পড়লেন। "ন্যায়ের ময়দানে ধর্ম আর ধনের লড়াই শুরু হল।" বলাই বাহুল্য পণ্ডিত আলোপীদীন বেকসুর খালাস হলেন, দারোগার জুটল মৃদু তিরস্কার।...এবং শেষ পর্যন্ত নায়পরায়ণতার পুরস্কার স্বরূপ মুন্সী বংশীধর তার চাকুরিটিও খোয়াল। ঘরে ফিরে এই অবিবেচক মানুষটি সকলের কাছে ধিক্কৃত হল। কাহিনী এইভাবে এগোয়। কিন্তু, তারপর যা ঘটে, তা একেবারে অপ্রত্যাশিত। গল্পের নাটকীয় পরিণতি এক অতিবড় বিস্ফোরণের মত পাঠকের মনের উপর চূড়ান্ত আঘাতে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

একদিন সন্ধ্যায় মুন্সী বংশীধরের দরজায় পণ্ডিত আলোপীদীন এসে নামলেন। বংশীধরের পিতা তো পুত্রের কৃতকার্যের জন্য অনুশোচনায় একেবারে নুয়ে পড়লেন। কিন্তু, ছেলে তার আত্মসম্ভ্রমবোধ নিয়ে খাড়া রইল। এদকে বিনয়ে এবং বংশীধরের গুণপনার প্রশংসায় গলে পড়লেন আলোপীদীন। এবং আর্জি পেশ করলেন, দয়া করে বংশীধর কি তার একটা অনুরোধ রাখবেন? যমুনার তীরের মত আবার প্রত্যাখ্যান তো তাঁর কপালে জুটবেনা? বিনয়ের প্রতিদানে বংশীধরও অবণত হল। ছিঃ, ছিঃ, এসব কথা কেন, পণ্ডিতজী কত বড় ব্যক্তি, আর সে তো দাসানুদাস মাত্র। পণ্ডিত আলোপীদীন বংশীধরকে তাঁর নিজের সমস্ত বিষয়সম্পত্তির ম্যানেজার নিযুক্ত করতে চাইলেন। বার্ষিক ছ'হাজার টাকা বেতন, দৈনিক হাতখরচা আলাদা, উপরন্তু গাড়ী, বাড়ী, দাস-দাসী সব নিখরচায়। বংশীধর এই মহত্বে অভিভূত হল। তার চোখে জল এল। কিন্তু, সে আপত্তি করল এই বলে যে এ পদের জন্য সে তো যোগ্য ব্যক্তি নয়। পণ্ডিত আলোপীদীন হেসে বললেন, একজন অযোগ্য ব্যক্তিই আপাতত তাঁর

দরকার। কিছু মৃদু আপত্তির পর মুন্সী বংশীধর স্ট্যাম্প কাগজে সই করে দিল। পণ্ডিত আলোপাদীন তাকে জড়িয়ে ধরলেন। গল্প শেষ হল।

পাঠক এই আকস্মিক পরিণতিতে স্তম্ভিত হয়ে যান। কিন্তু জয় হল কার? নীতিপরায়ণ বংশীধরের, না সূক্ষ্মবুদ্ধি, বাকপটু ধনকুবের পণ্ডিতজীর? শেষ পর্যন্ত জিতল কে? ধর্ম না ধন? এই প্রশ্নে পাঠককে আন্দোলিত করে প্রেমচন্দ তাঁর গল্প শেষ করেন। এ সমাপ্তি একমাত্র প্রেমচন্দের দ্বারাই সম্ভব ছিল।

হিন্দী সাহিত্যের জগতে প্রেমচন্দের আবির্ভাবটাই একটা আকস্মিক ঘটনা। তিনি যখন এলেন, তখন হিন্দী গল্প উপন্যাসের কি মর্মান্তিক দৈন্যদশা। একেবারে মরুভূমিতে তিনি স্বর্গোদ্যান তৈরী করলেন! আর প্রেমচন্দ চলে যাওয়ার পরে হিন্দী সাহিত্যে তাঁর মাপের উপযুক্ত একজন উত্তর সাধকও আর এলেন কি? রুশ সাহিত্যে যেমন টলস্টয়, টুর্গেনিভ, শেখভ এর ধারা বেয়ে এলেন গর্কি—একেবারেই তেমন নয়। কিভাবে যে প্রেমচন্দ জন্মালেন, তা এক অপার রহস্য। অবশ্য সাহিত্যের জগতে এ ধরণের আকস্মিকতা নজীর বিহীন নয়। অন্তর্লীন ঘটনাবলীর কোন গোপন যোগসূত্রে এ রকম অসামান্য সাহিত্য-সৃষ্টি আকস্মিক ভাবে হয়। ইংরেজী সাহিত্যে যেমন শেক্‌স্‌পীয়র, কিংবা বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ। ইংরেজী বা বাংলা সাহিত্য বন্ধ্যা নয়, কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়র বা রবীন্দ্রনাথকে যদি তাঁদের পূর্বসূরী বা উত্তর পুরুষের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে দেখা যাবে নগেন্দ্র হিমালয়ের চূড়ার মত আর সবাইকে ছাড়িয়ে এঁরা কত উচ্চে মহিমময় ও দেদীপ্যমান। হিন্দী সাহিত্যের আসরে প্রেমচন্দের আসনও ঠিক তেমনি।



প্রেমচন্দ

'কলম কা সিপাহী'

বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজা নয়, রাজপুত্তুর নয়, এক সেপাই। সেপাই বেরিয়ে পড়েছে ঘর ছেড়ে দৈত্য-পুরীর পাষাণ-দুর্গ থেকে রূপকথার রাজকন্যাকে মুক্ত করতে। গজমোতির মালা তার 'বুকের পরে নাচে' না, পক্ষিরাজের আকাশ-বিহারী যাত্রার অনায়াস বিলাসের সুখভাগ্য তার জন্যে বরাদ্দ হয় নি। শক্ত পায়ে, ধু-ধু মাঠের শুকনো জমি পেরিয়ে অনেক তৃষ্ণা, অনেক পথ-হাঁটা মেহনতে ঘাম ঝরিয়ে তার যাত্রা সুদুর্গম লক্ষ্যের দিকে,—একক, নিঃসঙ্গ। তবু সে নির্ভয়, সংকল্পে অটল,—রূপকথার বন্দিনী রাজকন্যার মুক্তি অর্জনে।......

উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকার মানুষের মাতৃভাষা হিন্দী-উর্দু ভারতের প্রায় এক-চতুর্থাংশ মানুষের মুখের ভাষা, মনের ভাষা। বিশ শতকের গোড়াতেও এই ভাষার সাহিত্যে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে নি, গল্প-উপন্যাসের পটভূমিতে বিধৃত হয় নি সমকাল, এই ঘনবসতি সমভূমির মাটির-মানুষের পরিচয় মেলে না এখানকার সাহিত্যকর্মে, অতীতের অবক্ষয়ী রোমান্টিকতার অলীক অন্ধকারে চলমান, জীবনের আলোকরেখাকে আড়াল করে এ সমাজের সাহিত্যধারা বার্ধক্যের জীর্ণতায় ধুঁকছে। এমন সময় আবির্ভূত হলেন লেখনীকে হাতিয়ার করে মুন্সী প্রেমচন্দ, সংস্কৃতি-জীবনের অন্ধকার নাগপাশ ছিন্নভিন্ন করে দিতে,—এক দুঃসাহসী বীর সৈনিক, "কলম কা সিপাহী"!

মাত্র ছাপ্পান্ন বছরের জীবিতকালের ভেতর বারাণসীর চার মাইল দূরবর্তী লামাহি গাঁয়ের নিম্ন-মধ্যবিত্ত কায়স্থ পরিবারের সন্তান, পঁচিশ টাকা মাস-মাইনের কেরানী অজৈবলালের পুত্র প্রেমচন্দ হিন্দী সাহিত্যকে আধুনিক যুগের উপযোগী করে তুললেন তাঁর নিরলস সাহিত্য-সাধনার ভেতর দিয়ে। সমকালীন মানুষগুলো, বিশেষ করে উত্তর প্রদেশের আটপৌরে কৃষক হিন্দী সাহিত্যে প্রথম রূপায়িত হল

তার ভাব-ভাবনা, দুঃখ-সুখ, ভালোলাগা-মন্দলাগা, দোষ-গুণের সামগ্রিক পরিচয় নিয়ে,—জীবনধর্মের অনাবিল, প্রসন্ন স্রোতধারায় হিন্দী সাহিত্যের নবজন্ম ঘটলো,—হিন্দী সাহিত্য নবভারতের নবীন গতিধারায় সুপ্রতিষ্ঠিত হল, রূপকথার রাজকন্যা অবক্ষয়ের পাষাণপুরী থেকে পেল মুক্তি। তাই প্রেমচন্দ আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের পিতৃস্থানীয়।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই বারাণসী থেকে চার মাইল দূরে লামাহি গ্রামের এক নিম্নমধ্যবিত্ত কায়স্থ পরিবারে প্রেমচন্দের জন্ম হয়। ছ' বিঘে জমি আর বৃহৎ পরিবার—এই ছিল প্রেমচন্দের পিতামহ গুরুসহায় লালের উত্তরাধিকার। পেশায় তিনি ছিলেন পাটোয়ারী। প্রেমচন্দের বাবা অজৈবলাল ছিলেন পঁচিশ টাকা মাস-মাইনের পোস্টাফিসের কেরানী। মার নাম আনন্দী দেবী। সুরূপা, হাস্যময়ী, ভালোমানুষ এই মা-টি প্রেমচন্দের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিলেন। তাই প্রেমচন্দ তাঁর 'বড়ে ঘর কী বেটি' গল্পে মায়ের ছবিটি এঁকেছেন পরম শ্রদ্ধায়, গভীর মমতায়।

গাঁয়েই শৈশব কেটেছে প্রেমচন্দের। হিন্দু হলেও উর্দু ছিল তাঁর মাতৃভাষা, তাই ছেলেবেলায় মৌলবী সাহেবের কাছে উর্দু আর ফার্সী পাঠের ভেতর দিয়েই তাঁর বিদ্যারম্ভ হয়েছিল। প্রেমচন্দ তাঁর পৈতৃক নাম নয়, সাহিত্যচর্চার জন্য নেওয়া ছদ্মনাম। তাঁর আসল নাম ধনপত রায়। ছেলেবেলায় তিনি খুব দুরন্ত আর ডানপিটে ছিলেন, দিনরাত খেলে বেড়াতে, ক্ষেত থেকে ফল-পাকুড় চুরি করতে আর গুড় খেতে ভালোবাসতেন। একবার একটা টাকা চুরি করে তাঁকে কঠোর শাস্তি পেতে হয়। 'চোরি' গল্পে তিনি তাঁর এই শৈশবজীবনের যে ছবি অমর করে রেখে গিয়েছেন, নীচের উদ্ধৃতিটি তার কিছু পরিচয় দেবে :

"ছেলেবেলার কথা কি ভোলা যায়? ভাঙা-চোরা মেটে ঘর, খড়ের বিছানা, খালি গায়ে, খালি পায়ে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ানো, আম গাছে চড়ে আম খাওয়া—আজও আমার স্মৃতিতে অমলিন হয়ে আছে। কাঁচা আমের অম্লরস, ছোলা আর কাঁচা জামের অমৃতের কাছে কোথায় লাগে গুলাবী সরবৎ, পাকা আঙুর আর মণ্ডা-মিঠাই!"

ছেলেবেলায় প্রেমচন্দের সবচেয়ে প্রিয় খেলা ছিল ডাংগুলি আর ঘুড়ি ওড়ানো। তাঁর সেরা ছোটগল্পগুলোতেও ডাংগুলি খেলার প্রতি তাঁর অসাধারণ পক্ষপাতিত্বের পরিচয় চিহ্নিত হয়ে আছে। "বড়ো মাঠ বা খেলার জায়গার দরকার নেই, দরকার নেই জাল আর নানা সরঞ্জামের। গাছ থেকে একটা ডাল কেটে নাও, তা থেকে একটা গুলি বানাও—ব্যাস্! দুজন হলেই যথেষ্ট···শৈশবের মধুর স্মৃতিগুলোর

ভেতর এটাই সবচেয়ে মিষ্টি।" 'গুল্লিডাণ্ডা' গল্পটি প্রেমচন্দ শুরু করেছেন এইভাবে— সাত বছর যখন তাঁর বয়স তখন তাঁর মা মারা যান। তাঁর বাবা আবার বিয়ে করেন, কিন্তু মায়ের অভাব প্রেমচন্দ কখনো ভুলতে পারেন নি। মাতৃহারা কিশোরের দুঃখবেদনা তাঁর মনকে যে কতদূর প্রভাবিত করেছিল তা বেশ বোঝা যায় যখন আমরা দেখি যে তাঁর অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসের নায়ক শৈশবে মাতৃহীন।

আট বছর ফার্সী শেখার পর প্রেমচন্দ বারাণসীর কুইন্‌স্‌ কলেজিয়েট স্কুলে ইংরেজি পড়বার জন্য ভর্তি হন। এনট্রান্স পরীক্ষা দেবার আগেই ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। ফলে সংসারের সমস্ত ভার তাঁর ওপর এসে পড়ে। তিনি বারাণসী শহরে ছাত্র পড়িয়ে সংসারের অভাব মোচন করবার চেষ্টা করতে বাধ্য হন। রোজ সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত ছাত্র পড়িয়ে রাত আটটায় বাড়ি ফিরে তাঁকে এনট্রান্স পরীক্ষার পড়া করতে হত। এইভাবে লড়াই করে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

এরপর তিনি সেনট্রাল হিন্দু কলেজে ভর্তি হবার চেষ্টা করেন। কিন্তু পাটিগণিতে খুব দুর্বল ছিলেন বলে সফল হতে পারেন নি। তখন থেকে তিনি বারাণসীতে এক মাটির ঘরে থাকতেন আর পাঁচ টাকা মাস-মাইনেয় ছাত্র পড়াতেন। দু টাকায় তিনি নিজের খরচ চালাতেন আর তিন টাকা বাড়ি পাঠাতেন সংসার-খরচের জন্য। নিজের জীবনকথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি তাঁর ঐ সময়কার জীবনযাত্রার এক সুন্দর ছবি এঁকেছেন: "আমার মাস-মাইনে ছিল পাচ টাকা। আমি ঠিক করলাম যে দুটাকায় আমি আমার খরচ চালাবো আর তিন টাকা বাড়ি পাঠাবো। যে উকীলবাবুর ছেলেকে আমি পড়াতাম তাঁর আস্তাবলের ওপব একটা মাটকুঠুরী ছিল। তাঁর কাছ থেকে সেখানে থাকবার অনুমতি চেয়ে নিলাম। তারপর একটা চট বিছিয়ে ঘরটাকে বাসযোগ্য করে তুললাম। বাড়ি থেকে কিছু বাসনপত্র এনে, বাজার থেকে একটা বাতি কিনে নিয়ে গুছিয়ে বসলাম। সকাল-বেলায় খিচুড়ি রেঁধে খেয়ে বাসনপত্র মেজে আমি লাইব্রেরিতে চলে যেতাম রোজ। ছুতো গণিতশাস্ত্র পড়াশোনা করা। আসলে লাইব্রেরিতে গিয়ে আমি শুধু উপন্যাস পড়তাম।"

এভাবে দিনযাপন করতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হলেন প্রেমচন্দ, আর সে ঋণ শোধের জন্য একখানা পাঠ্য বই তাঁকে পুরনো বইয়ের দোকানে মাত্র এক টাকায় বেচতে হলো। এখানেই তাঁর পরিচয় হয় চুনারের এক মিশনারী স্কুলের হেডমাস্টারের সঙ্গে। তিনিই প্রেমচন্দকে তাঁর স্কুলে আঠারো টাকা মাস-মাইনেয় শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত করেন। তখন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ।

এভাবেই তাঁর দীর্ঘ শিক্ষক-জীবনের গোড়াপত্তন হয়েছিল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বারহাইয়াচ্-এর সরকারী জিলা স্কুলে শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন,—মাসিক বেতন ছিল পঁচিশ টাকা। তখনকার দিনে পঁচিশ টাকা মাস-মাইনের চাকরি মানেই 'রাজার চাকরি'। কয়েক মাস পর তিনি প্রতাপগড়ে বদ্‌লি হন। সেখান থেকে তাঁকে এলাহাবাদে পাঠানো হয় শিক্ষকতার ট্রেনিং নেবার জন্য। এর পরেই তিনি এলাহাবাদ মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দেন, সেখান থেকে বদ্‌লি হন কানপুরের সরকারী বিদ্যালয়ে। কানপুরে থাকবার সময়েই তাঁর সাহিত্যচর্চায় হাতেখড়ি হয়, আর এখানেই তিনি প্রথম পরিচিত হন উর্দু পত্রিকা 'জমানা'র সম্পাদক মুন্সী দয়ানারায়ণ নিগমের সঙ্গে। ক্রমে এই পরিচয় জীবনব্যাপী প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস থেকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের ভেতর প্রেমচন্দের প্রথম উর্দু উপন্যাস 'অসবারে মওগাবিদ' (মন্দির-রহস্য) বারাণসীর উর্দু সাপ্তাহিক 'আওয়াজ-এ-খাল্‌ক'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে তিনি মোহান্ত-পুরুতদের পাপকাহিনী বর্ণনা করেছেন। ধর্মের নামে ভণ্ডামির এক অতি-নাটকীয় রূপায়ণে তিনি সোচ্চার হয়েছেন এ উপন্যাসে। ধর্মধ্বজী গুরুবাদের বিরুদ্ধে লেখনী চালিয়ে প্রেমচন্দ তাঁর প্রগতিশীল মানসিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন বটে এ উপন্যাসে, কিন্তু তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার প্রকাশ এখানে অনুপস্থিত। প্রথম রচনা বলেই উপন্যাসখানি খুব কাঁচা হাতের লেখা, যৌবনের উচ্ছ্বাসমুখর,—চরিত্র-চিত্রণে দক্ষতার পরিচয় এতে নেই। জীবনের সার্থক রূপায়ণ এ উপন্যাসে ঘটে নি। দ্বিতীয় উপন্যাস "হম্‌খুরমা-ব-হম্‌সওয়ার" (হিন্দী রূপান্তর 'প্রেমা') এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। এই উপন্যাসের নায়ক এক ধনী কন্যার প্রেম উপেক্ষা করে এক তরুণী বিধবাকে বিয়ে করে সমাজের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে। তারপর গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সমাজের রক্ষণশীল প্রভুশক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জয়ী হয়। এই উপন্যাসেই আমরা প্রেমচন্দকে দেখতে পাই এক অকুতোভয় সৈনিকের ভূমিকায়,—যে সৈনিকের লেখনী পরবর্তীকালে সকল সামাজিক সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে, সমস্ত সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল। কিন্তু তাঁর কালজয়ী প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ এ উপন্যাসকে কেন্দ্র করে জলে উঠলেও পরিণত প্রতিভার সার্থক পরিচয় এখানে অনুপস্থিত। চরিত্রগুলো নিতান্ত সরল, হয় একেবারে ভালো, নয় একেবারে মন্দ, ভালো-মন্দে মেশা জটিল ও স্বাভাবিক যে দুর্জ্ঞেয় মানবচরিত্র জীবনের বাস্তবরূপ, তাকে রূপায়িত করবার সাধনায় প্রেমচন্দ তখনও সিদ্ধিলাভ করতে পারেন নি।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দেই 'জমানা' পত্রিকায় তাঁর তৃতীয় উপন্যাস 'কিশ্‌না'র বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৪২ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসখানির সন্ধান পরবর্তীকালে পাওয়া যায় নি। পুস্তক-সমালোচনা থেকে জানা যায় যে এখানা স্ত্রীলোকের অলংকারপ্রিয়তাকে ভিত্তি করে রচিত। মনে হয়, এই বইখানাই প্রেমচন্দের পরবর্তী উপন্যাস 'গবন্‌'-এর প্রেরণা যুগিয়েছিল।

পনেরো বছর বয়সে প্রেমচন্দের প্রথম বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু এ বিবাহ সুখের হয় নি। প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে মানিয়ে চলতে না পেরে প্রেমচন্দ তাঁকে তাঁর বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেন। আর তাঁর সঙ্গে কোন সম্পর্ক তিনি রাখেন নি। সমস্ত ব্যাপারটাই কিছুটা রহস্যাবৃত মনে হয়। এরপর প্রেমচন্দ এক বালবিধবা শিবরাণী দেবীকে বিয়ে করেন ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে। সে যুগের হিন্দু সমাজে এটা একটা বিরাট দুঃসাহসের কাজ ছিল সন্দেহ নেই। তাঁর শ্বশুর ছিলেন ফতেপুরের এক জমিদার। তাঁর পক্ষেও এটা চরম দুঃসাহসের কাজ ছিল বলা যেতে পারে। কাজেই প্রেমচন্দ শুধু লেখনীমুখেই সমাজ-সংস্কারের সাহস দেখান নি, নিজের জীবনেও তাকে রূপ দেবার মতো সাহস তাঁর ছিল।

শিবরাণী দেবীর লেখা প্রেমচন্দের জীবনী ('প্রেমচন্দ : ঘর মে') থেকে আমরা তাঁর ব্যক্তিগত দিনযাত্রার এক সুন্দর পরিচয় পাই। তাঁর বাবার মতোই তিনিও ছিলেন পেটরোগা মানুষ, প্রায়ই ভুগতেন এই রোগে। সরল আদর্শবাদী এই মানুষটি ছিলেন গভীরভাবে মানবদরদী,—মানুষকে তিনি কখনও অবিশ্বাস করতে পারতেন না। তাই তাঁকে ঠকতে হয়েছে অনেক, তবু তাঁর মানুষের জন্য ভালোবাসা কোনদিন হ্রাস পায় নি।

১৯০৫ থেকে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কানপুরে কাটান প্রেমচন্দ। এই দিনগুলি তাঁর খুব আনন্দে কেটেছে। 'জমানা' পত্রিকার অফিসে বন্ধু দয়ানারায়ণ নিগমের সাহচর্যে যে সাহিত্য-পরিবেশ গড়ে উঠেছিল, তাতে তাঁর হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ থাকতো। গরমের ছুটিতে যখন তিনি তাঁর দেশের বাড়ি লামাহিতে যেতেন, তখন তাঁর মন কানপুরের সুখময় পরিবেশকে ফিরে পাওয়ার জন্য হাহাকার করতো। এ সময়েই তিনি সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন এবং পরাধীনতার বেদনা তাকে চরমপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্বের অনুগামী করে তোলে। সে সময়কার 'জমানা' পত্রিকায় তাঁর লেখা রচনায় এই মনোভাবের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। তাঁর বন্ধু দয়ানারায়ণ নিগম ছিলেন নরমপন্থী, কিন্তু সেজন্যে দুজনের বন্ধুত্ব কোনদিন ক্ষুণ্ণ হয় নি। প্রেমচন্দের রাজনৈতিক চেতনা সম্পর্কে দয়ানারায়ণ নিগম বলেছেন, "প্রভু ইংরাজের সঙ্গে পরাধীন ভারতবাসীর অসম-

সংগ্রামে আপসের চিন্তাকে প্রেমচন্দ কখনও সমর্থন করেন নি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে এক ব্যাপক এবং আপসহীন চূড়ান্ত সংগ্রাম ছাড়া কিছুই আদায় করা যাবে না, আর এজন্য অতি দ্রুত জনগণকে সংগঠিত করা দরকার। সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ছাড়া আর কোন পথ নেই বলেই তাঁর ধারণা ছিল।"

প্রেমচন্দ ছিলেন গৌরবর্ণ আর সুশ্রী। মস্ত একজোড়া বাদামী গোঁফ তার মুখকে এমন গাম্ভীর্য দান করেছিল যে পাগড়ী মাথায় দিলে তাঁকে রাজপুত্রের মতো দেখাতো। তাই বলা চলে যে তাঁর মা-বাবার দেওয়া আদরের নাম 'নবাব' চেহারার দিক থেকে খুব মানানসই হয়েছিল। কিন্তু আচার-আচরণে তিনি ছিলেন সরল, নিরহংকার। তাঁর সঙ্গে যারা দেখা করতে আসতো, তারা প্রথম বিশ্বাস করতে পারতো না যে ইনিই সেই হিন্দী সাহিত্য-সম্রাট মুন্সী প্রেমচন্দ। তাঁর বাড়ি এসে অনেকে তাঁকেই জিজ্ঞাসা করেছে প্রেমচন্দ কোথায়। তারা এরকম সাদাসিধে মাটির মানুষকে প্রেমচন্দ বলে ভাবতেই পারতো না। তাই, প্রথম সাক্ষাতে অনেকেই খানিকটা হতাশ হত, কিন্তু পরিচয় যত গভীর হত তত তারা তাঁর সরলতা, ভালো-মানুষি, চারিত্রিক উৎকর্ষতা, জীবনসচেতনতা, হাস্যরসপ্রিয়তায় মুগ্ধ না হয়ে পারতো না। তাঁর চরিত্রে গুরুগম্ভীর ভাব নিতান্ত অনুপস্থিত ছিল, এক শিশুসুলভ সারল্য তাঁকে সব সময় প্রাণবন্ত করে রাখতো,—সরল, ভালোমানুষ এক গ্রাম্য কৃষকের মতো। দৈহিক আর মানসিক প্রকৃতিতে তিনি সত্যিই ছিলেন এক গেঁয়ো চাষী। তাই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলেই মানুষ তাঁকে ভালোবাসতো,—শুধু গোঁড়া নীতি-বাগীশেরা ছাড়া। তাঁর মানসিকতা বা দৃষ্টিভঙ্গীতে সাম্প্রদায়িকতার চিহ্নমাত্র ছিল না, চিন্তার ক্ষেত্রেতিনি ছিলেন পরিপূর্ণ প্রগতিশীল। তাঁর চরিত্রের গভীর প্রসন্নতার পরিচয় পাওয়া যেত যখন কোন রসিকতায় উল্লসিত হয়ে তিনি উদার অট্টহাস্যে দশদিক কাঁপিয়ে তুলতেন।

প্রেমচন্দের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের ছবিটি জৈনেন্দ্র সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর 'স্মৃতিকথা'য়। প্রেমচন্দ যখন লক্ষ্ণৌ-এ আমিনউদ্দৌলা পার্কের কাছে থাকতেন তখন জৈনেন্দ্র প্রথম তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন। এই প্রথম পরিচয়ের বিবরণ জৈনেন্দ্রের ভাষায় এইরকম: "সিঁড়ির ওপর থেকে যে মানুষটি আমার দিকে তাকিয়ে আছে তাকে দেখে আমি রীতিমত মর্মাহত হলাম। পুষ্ট একজোড়া গোঁফ তার মুখে, গায়ে একটা পাঁচ টাকা দামের পুরনো, ময়লা, তেলচিটে লালিমলির চাদর, হাঁটু-সমান ধুতি পরনে, বিশৃঙ্খল চুল কপালের ওপর এসে পড়েছে, মাথাটা একটু বেমানান রকমের ছোট, চোখ দুটো ঘুমের আবেশে ভারী। বুঝলাম, ইনিই প্রেমচন্দ; কিন্তু এই উপলব্ধিতে মন খুশি হল না। কত দূর

থেকে, কত কল্পনা নিয়ে এসেছি প্রেমচন্দকে দেখতে,—আর এই চেহারা তাঁর! একবার ভাবলাম, ফিরে যাই। আমার মনের মণিকোঠায় প্রেমচন্দের যে উজ্জ্বল মূর্তি আঁকা হয়ে আছে তার স্মৃতিই অক্ষয় হয়ে থাকুক। কী তুচ্ছ, কী গেঁয়ো চেহারা এই লোকটির যে প্রেমচন্দ নাম নিয়ে আমার দৃষ্টির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে...।

"তিনি আবার ডাকলেন, চলে এসো,—এসো ভাই।

"আমি যেই একহাতে আমার বাক্সটা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করেছি, অমনি তিনি নেমে এসে বাক্সটা আমার হাত থেকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করলেন। আমি কিছুতেই তাঁকে বাক্সটা ছেড়ে দিতে রাজি হলাম না, তখন তিনি আমাব হাত থেকে অন্যান্য জিনিসপত্রগুলো নিয়ে দোতলা পর্যন্ত বয়ে নিয়ে গেলেন।

"বাড়িটা বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মনে হল না, খোলা উঠোন জলে থৈ থৈ করছে, জিনিসপত্র সব অগোছালো,—এটা প্রথম দৃষ্টিপাতেই আমার চোখে পড়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণের ভেতর আমি ভুলে গেলাম যে আমি একটা নতুন, অপরিচিত জায়গায় এসেছি। আমার সমালোচক মন যে কখন ঘুমিয়ে পড়লো টেরই পেলাম না।

"সব কাজ ফেলে রেখে আমার সঙ্গে গল্প করতে বসলেন প্রেমচন্দ। ঘণ্টাখানেক কখন কেটে গেল, কিন্তু গল্পের স্রোত অনাবিল ধারায় বয়ে চললো। আমি ভুলে গেলাম যে আমি হিন্দী সাহিত্য-সম্রাট প্রেমচন্দের মুখোমুখি বসে, ভুলে গেলাম যে অল্প খানিক আগেও আমি তাঁর চেহাবা দেখে বিরক্ত হয়েছিলাম, তাঁর প্রতি এক অবহেলার ভাব জন্মেছিল আমার মনে,—শুধু এক গভীর অন্তরঙ্গতা, এক মধুব সাহচর্যের রঙীন আবেশে মন আমার ভরপুব হয়ে উঠলো।"

প্রেমচন্দের প্রথম ছোট গল্প 'দুনিয়া কা সব্‌সে অন্‌মোল রতন' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। আরব্য উপন্যাসের ভঙ্গীতে রচিত এই গল্পটি কিন্তু নীতিমূলক। গল্পটির ভেতর দিয়ে তিনি বলতে চেয়েছেন যে দুনিয়ায় সবচেয়ে অমূল্য বস্তু স্বদেশের স্বাধীনতা। সামাজিক পটভূমিতে রচিত হলেও প্রেমচন্দের প্রথম দিককার গল্পগুলো 'হিতোপদেশ' বা 'পঞ্চতন্ত্রে'র মতো নীতিমূলক। তাই এ রচনাগুলো ছোট গল্প হিসেবে খুব সার্থক হয়েছে, এ কথা বলা চলে না।

তাঁর প্রথম ছোট গল্প সংকলন 'সোজে বতন' ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই বইখানিতে পাঁচটি গল্প আছে,—সবগুলোই দেশাত্মবোধক। কানপুরে থাকবার সময় তিনি রাজনৈতিক বিষয়েও নানা রচনা লেখেন; এছাড়া, মাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডির

জীবনকথা আর স্বামী বিবেকানন্দের মহত্ব প্রসঙ্গে সশ্রদ্ধ প্রবন্ধটিও এ সময়ের রচনা। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সাব-ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার অব স্কুল্‌স্‌ হয়ে মাহোবায় বদলি হন ; মাইনে বেড়ে হয় পঞ্চাশ টাকা। এ সময় গভর্নমেণ্ট জানতে পারে যে দেশাত্ম-বোধক গল্পগ্রন্থ 'সোজে বতন'-এর লেখক নবাব রায় হল এক সরকারী কর্মচারী, ধনপত রায়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তাঁকে হাজির হতে হয়, নানা লাঞ্ছনা পেতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর 'সোজে বতন' গল্পগ্রন্থখানি সরকার বাজেয়াপ্ত করে, সরকারী অনুমোদন ছাড়া তিনি কখনও আর কিছু লিখতে পারবেন না, এই আদেশ তাঁর উপর জারী করা হয়। এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েই তিনি নূতন এক ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু দয়ানারায়ণ নিগম এই 'প্রেমচন্দ' ছদ্মনামটি প্রস্তাব করলে তিনি সাগ্রহে সম্মত হন। আজ ভারতীয় সাহিত্যক্ষেত্রে প্রেমচন্দ এক অতি পরিচিত নাম।

জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে তাঁর এই সাক্ষাৎকারের এক সুন্দর বিবরণ প্রেমচন্দ নিজে লিখে রেখে গিয়েছেন :

"একদিন রাত্তিরে আমি আমার তাঁবুতে বসে আছি, এমন সময় আমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের একটি চিঠি পেলাম। তিনি এক্ষুণি আমাকে তাঁর সামনে হাজির হতে বলেছেন। শীতকাল, তিনি তখন জেলায় ঘুরতে বেরিয়েছেন। আমি গরুর গাড়িতে চেপে রওনা হলাম তক্ষুণি, সেই রাত্তেই। তারপর সারারাত চলে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল পথ পেরিয়ে পরদিন তাঁর সামনে গিয়ে হাজির হলাম। সাহেবের টেবিলে একখানা 'সোজে বতন' রাখা ছিল। দেখতে পেয়ে আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। সে সময় আমি 'নবাব রায়' ছদ্মনামে লিখতাম। আমি খবর পেয়েছিলাম যে পুলিসের গুপ্তচর-বিভাগ বইখানার লেখককে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বুঝলাম যে ওরা আমার খোঁজ পেয়েছে, তাই কৈফিয়ৎ দেবার জন্য আমাকে তলব করা হয়েছে। সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বইটা তোমার লেখা ? আমি স্বীকার করলাম।

"তিনি আমাকে প্রতিটি গল্পের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বলতে বললেন। আমি একটা একটা করে সবগুলো গল্পের বিষয়বস্তু বলবার পর সাহেব রাগে ফেটে পড়লেন, তোমার গল্পগুলো সব রাজদ্রোহাত্মক। তোমার ভাগ্য ভালো যে তুমি বৃটিশ শাসনের অধীনে আছ, মুঘল আমল হলে তোমার হাত দুটো কেটে ফেলার হুকুম হত। তোমার গল্পগুলো নিতান্ত একপেশে, বৃটিশ কর্তৃপক্ষের প্রতি ঘৃণা আর বিদ্রোহের মনোভাবে ভরা।......।"

সরকারী চাকরির এই বন্ধন, অসম্মান আর অপমান প্রেমচন্দের পক্ষে তখনই দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল, বার বার তিনি সরকারী গোলামি পরিত্যাগ করবার কথা ভেবেছেন,

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর্থিক অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় পিছিয়ে গিয়েছেন। এ সময় এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারী চিন্তামণি ঘোষ একটি উর্দু সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেন এবং সরকারী চাকরি ছেড়ে তাব সম্পাদনার ভার গ্রহণের জন্য তাঁকে অনুরোধ জানান, কিন্তু প্রেমচন্দ শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যান। কানপুরের মাড়োয়ারী বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকতার পদ গ্রহণেব প্রস্তাবও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

'প্রেমচন্দ' ছদ্মনামে প্রথম প্রকাশিত হয় তাব বিখ্যাত ছোটগল্প 'বড়ে ঘর কী বেটি'। এর আগেকার গল্পগুলো ছিল অলৌকিকতা আর কাল্পনিক রোমান্টিকতায় ভরা। এই গল্পেই তিনি সর্বপ্রথম বাস্তব জীবন ও সামাজিক সমস্যার ছবি তুলে ধরেছেন। কাজেই, বলা যেতে পারে যে প্রত্যক্ষ বাস্তববাদী জীবনমুখী যে শিল্পরীতি প্রেমচন্দকে সাহিত্য-জগতে অমরত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এই গল্প থেকেই তার যাত্রা শুরু। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে 'নবাব রায়' ছদ্মনামে লেখা 'জালওয়াই ইসর' উপন্যাস প্রকাশিত হয় ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে। পরে এখানা হিন্দীতে ভাষান্তরিত হয়ে 'বরদান' নামে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে একদিকে প্রকাশ পেয়েছে পরিণত রচনাশৈলীর পরিচয়, আর অন্যদিকে ব্যাপক গণ-আন্দোলনের প্রতি গভীর অনুরাগের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। গ্রামজীবনের সার্থক-বর্ণনায়, অপরিসীম দারিদ্র্য, শোষণ আব নিপীড়নের বাস্তব চিত্রায়ণে আব চরিত্রচিত্রণের দক্ষতায় এ উপন্যাসখানি প্রেমচন্দের সাহিত্য-সাধনার নূতন দিগন্তের দিশারী।

মাহোবাতে থাকবার সময় প্রেমচন্দের পুরনো আমাশয় রোগ খুব বেড়ে যায়। বছর দেড়েক রোগভোগের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়লে তাঁকে বস্তি জেলায় বদলি করা হয়। এখানকার আবহাওয়াও তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই অনুকূল ছিল না, তাই তিনি চিকিৎসার জন্য কয়েক মাস আধা বেতনে ছুটি নিতে বাধ্য হন। বস্তিতে থাকবার সময়েই তাঁব বিখ্যাত গল্প-সংকলন 'প্রেম-পঁচিশী'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। 'বড়ে ঘর কী বেটি,' 'নমক্ কা দারোগা' 'রানী সারন্ধা' প্রভৃতি তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পের কয়েকটি এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। জেলার তহশিল-দার হিসেবে কর্মরত মান্নান দ্বিবেদী গজপুরীর সঙ্গে এখানেই তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটে এবং ক্রমে এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। প্রেমচন্দের সাহিত্য-জীবনে এই ঘটনাটির মুল্য অপরিসীম, কারণ শ্রীযুত দ্বিবেদীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলেই হিন্দী ভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগ বেড়ে যায়, আর এ সময় থেকেই তিনি হিন্দীতে সাহিত্য রচনা আরম্ভ করেন।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রেমচন্দ গোরক্ষপুর নর্মাল স্কুলের সহকারী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত

হন এবং ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষতার দায়িত্ব পান। এখানকার আবহাওয়া তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল হওয়ায় তিনি সাহিত্যকর্মে বেশী মনোযোগ দেবার সুযোগ পান। এখানে তাঁর সঙ্গে মহাবীরপ্রসাদ পোদ্দারের পরিচয় ও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং তিনি হিন্দীতে বই লিখতে আরও উৎসাহিত হন। ফলে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ছোটগল্পের প্রথম হিন্দী সংকলন 'সপ্ত সরোজ' প্রকাশিত হয়। 'বড়ে ঘর কী বেটি', 'সওত', 'সজ্জনতা কা দণ্ড', 'পঞ্চ পরমেশ্বর', 'নমক্ কা দারোগা', 'উপদেশ', 'পরীক্ষা' এই সাতটি বিখ্যাত গল্পের হিন্দী অনুবাদ নিয়ে সংকলনটি প্রকাশিত। এর অল্পকাল পরেই 'প্রেমপূর্ণিমা' নামে তাঁর আর একখানি হিন্দী গল্প-সংকলন প্রকাশিত হয়। ১৯১৬ থেকে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ প্রেমচন্দের প্রথম সার্থক উপন্যাস 'সেবাসদন'-এর (উর্দু নাম 'বাজার-এ হুস্‌ন্') রচনাকাল। বইখানা প্রথমে উর্দুতে লেখা হলেও এর হিন্দী ভাষায়ই প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দী পুস্তক এজেন্সী থেকে।

যতদূর মনে হয়, হিন্দী ও উর্দু ভাষায় 'সেবাসদন'ই প্রথম সার্থক সামাজিক উপন্যাস। এর আগে পর্যন্ত হিন্দী-উর্দু উপন্যাস ছিল মূলতঃ অ্যাডভেঞ্চার আর অলৌকিকতার অলীক কাহিনী। প্রেমচন্দের প্রথম দিককার উপন্যাসগুলোও এর ব্যতিক্রম নয়। 'সেবাসদন'-এই তিনি প্রথম জীবনের কঠোর বাস্তব রূপের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন পাঠককে। রূঢ় সামাজিক জীবনের প্রকৃত রূপকে কোথাও সরল করবার চেষ্টা করেন নি, নিন্দা করবারও প্রয়াস পান নি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যক্ত করেছেন মানুষের ওপর এক গভীর আস্থা। মানুষ মূলতঃ ভালো, মূলতঃ মহৎ, সে দৃঢ়পণ চেষ্টায় নিজেকে সকল সামাজিক পাপ-পঙ্কিলতার গ্লানি থেকে মুক্ত করে সার্থক হয়ে উঠতে পারে এই বিশ্বাসের আলোকে উপন্যাসখানি আলোকিত। এর চরিত্রগুলো স্বাভাবিক আর জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসখানা প্রকাশের ভেতর দিয়ে হিন্দী-উর্দু উপন্যাস-সাহিত্য যৌবনে পদার্পণ করেছে।

'সেবাসদন' প্রকাশিত হবার ঠিক পরেই প্রেমচন্দ তাঁর দ্বিতীয় মহৎ উপন্যাস 'গোশাএ আফিয়াত' রচনায় হাত দেন। এই উপন্যাসের হিন্দী সংস্করণের নাম 'প্রেমাশ্রম'। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি গ্রন্থটির রচনা সমাপ্ত হয়। উপন্যাসখানি ভারতের ক্রমবর্ধমান স্বাধীনতা-সংগ্রামের পটভূমিতে স্থাপিত এবং গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত। রাওলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি তাঁর মনে এ সময় গভীর রেখাপাত করেছে মনে হয়।

গোরক্ষপুরে থাকতেই প্রেমচন্দ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পাস করেন। এ সময়ে ভারতে জাতীয় আন্দোলনের জোয়ার এসেছিল। সেই প্রেরণায় তাঁর মন

সরকারী গোলামির ওপর আরও বিরক্ত হয়ে ওঠে। তাই নর্মাল স্কুলে সরকারী উদ্যোগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধান্তে যে বিজয়োৎসব পালিত হয়, প্রেমচন্দ তাতে উপস্থিত হন নি। সে জন্যে তাঁকে কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত কৈফিয়ৎ দিতে হয়। এই সময়েই জেলার কালেকটারের সঙ্গে তাঁর প্রবল বিরোধের সৃষ্টি হয়। প্রেমচন্দের গরু কালেকটারের বাংলোর এলাকায় ঢুকেছিল বলে কালেকটার গরুটাকে গুলি করে মারবার ভয় দেখালে এই বিরোধের সৃষ্টি হয়। প্রেমচন্দের এক প্রাক্তন ছাত্রের রচনায় আর একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। সেখানে বলা হয়েছে যে কালেকটার সাহেব রোজ বিকেলে প্রেমচন্দের বাড়ির সামনে দিয়ে যখন বেড়াতে যেতেন তখন প্রেমচন্দ তাঁর বারান্দায় বসে পড়াশোনা করতেন। একদিন কালেকটার সাহেব তাঁকে ডেকে ধমকাতে থাকেন, কারণ তিনি সাহেবকে সেলাম জানান নি। উত্তরে প্রেমচন্দ সোজা জবাব দেন যে রাস্তা দিয়ে চলতে-থাকা সাহেব অফিসারদের সেলাম জানানো তাঁর কর্তব্য বলে তিনি মনে করেন না।

ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত আদালত অবধি গড়ায়, কারণ প্রেমচন্দ পরদিন কালেকটারের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে মানহানির নালিশ করেন। শেষ পর্যন্ত আপসে এই ঝগড়ার নিষ্পত্তি হয়।

এই সব ঘটনার ফলে প্রেমচন্দ ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি পদত্যাগ করেন। তাঁর স্ত্রীও তাঁকে পদত্যাগের জন্য উৎসাহিত করেন। ১৮ই মার্চ তারিখে গোরক্ষপুর ত্যাগ করে তিনি তাঁর স্বগ্রাম লামাহিতে ফিরে আসেন। জুন মাসে তিনি কানপুরে গিয়ে সেখানকার মাড়োয়ারী স্কুলের হেডমাস্টারের পদে যোগ দেন, কিন্তু স্কুলের ম্যানেজারের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি সেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে বারাণসীতে ফিরে আসেন। বারাণসীতে ফিরে এসে তিনি জ্ঞানমণ্ডলের কাজে যোগ দেন এবং 'মর্যাদা' সাময়িক পত্রের প্রকাশনায় সহযোগিতা করেন। 'আজ' পত্রিকাতেও তখন তিনি নিয়মিত লিখতে থাকেন। পরে তিনি কাশী বিদ্যাপীঠের বিদ্যালয়-বিভাগের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি বারাণসীতে একটি ছাপাখানা খোলেন। মুন্সী দয়ানারায়ণ নিগমের প্রস্তাব অনুসারে এর নাম রাখেন সরস্বতী প্রেস। কিন্তু যে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় তিনি এই ছাপাখানা খুলেছিলেন, তা কোন দিনই কার্যকর হয় নি। এই ছাপাখানা বরাবর তাঁকে নানাভাবে বিব্রত করেছে। এর দায় মেটাতে গিয়েই তাঁর উপার্জনের সিংহভাগ ব্যয়িত হয়েছে। এই ছাপাখানা তাঁকে কি পরিমাণ বিব্রত করে তুলেছিল তা পরবর্তীকালে তাঁর একখানি চিঠি থেকে জানা যায়: "এই প্রেসটাই আমার সব কষ্টের কারণ। কী কুক্ষণে যে আমি এটায় হাত দিয়েছিলাম

ভগবান জানেন। দশ হাজার টাকা, এগারো বছরের পরিশ্রম, অপরিসীম উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা সব জলে গিয়েছে। এই প্রেসের জন্যই বহু বন্ধুর সঙ্গে আমার মনোমালিন্য হয়েছে, কতজনের কাছে কথার খেলাপ করতে বাধ্য হয়েছি। যে অমূল্য সময় আমি প্রুফ দেখার কাজে নষ্ট করেছি এই প্রেসের জন্য, তা লেখাপড়ার কাজে লাগালে অনেক উপকার হত। এই প্রেস করাটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল।"

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই প্রেমচন্দ সাহিত্য-সাধনায় বিশেষ মনোযোগী হন। দুটি নাটক 'সংগ্রাম' ও 'কর্বেলা' এবং অসংখ্য ছোট গল্প রচনা করা ছাড়াও পয়লা অক্টোবর থেকে তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'রঙ্গভূমি' লিখতে আরম্ভ করেন এবং এর উর্দু সংস্করণ ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের পয়লা এপ্রিল সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু 'সেবাসদন' আর 'প্রেমাশ্রম'-এর সঙ্গে 'রঙ্গভূমি'রও হিন্দী সংস্করণ আগে প্রকাশিত হয় লক্ষ্ণৌর 'গঙ্গা পুস্তকমালা' থেকে। তিনি এ সময় 'গঙ্গা পুস্তকমালার সাহিত্যিক উপদেষ্টার কাজও গ্রহণ করেন মাসিক একশো টাকার বিনিময়ে।

'রঙ্গভূমি'র নায়ক এক অন্ধ ভিক্ষুক সুরদাস। সে দুটো পয়সার জন্যে গাড়ির পেছনে পেছনে ছুটতো। কিন্তু এই অনাথ ভিক্ষুকের চরিত্রে তিনি অদ্ভুত আত্মমর্যাদাবোধ, উদারতা আর জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য নিরলস সংগ্রামের বলিষ্ঠ চেতনা সংযোগ করে ভারতীয় সাহিত্যক্ষেত্রে এক নূতন দিগন্ত উন্মোচন করেন। তাই উপন্যাসখানি সুসংবদ্ধ এবং সুরচিত না হলেও দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং হিন্দী-উর্দু পাঠকসমাজ তাঁকে 'সাহিত্য-সম্রাট' আখ্যায় ভূষিত করে। এই উপন্যাসে প্রেমচন্দ ভারতবর্ষের এক বাস্তব ও বলিষ্ঠ চিত্র তুলে ধরেছেন। সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার যে আবেগপূর্ণ আহ্বান এই উপন্যাসের ভেতর দিয়ে পাঠকসমাজের কাছে তুলে ধরা হয়েছে তার তুলনা নেই।

এই সময় লক্ষ্ণৌতে থেকে তিনি 'সওয়া সের গেহুঁ' 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী' প্রভৃতি বিখ্যাত ছোটগল্পগুলো রচনা করেন এবং 'কায়কল্প' উপন্যাসটি সম্পূর্ণ করেন। তিনি এই উপন্যাসটি প্রথম হিন্দীতে লেখেন। এর আগে আর কোন উপন্যাস তিনি প্রথম হিন্দীতে লেখেন নি। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তিনি এটির রচনা শুরু করেন এবং সাত মাসের মধ্যে প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ করেন। দ্বিতীয় খণ্ডের রচনা শুরু হয় ১২ই নভেম্বর এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রেমচন্দের নিজের ছাপাখানা সরস্বতী প্রেসে এটি মুদ্রিত হয়। এই উপন্যাসেরও মূল সুর মানবসমাজে ন্যায়বিচারের সমস্যা। এই সময় আলোয়ারের মহারাজা প্রেমচন্দকে চারশো টাকা মাস-মাইনেতে তাঁর অধীনে চাকরি করবার প্রস্তাব দেন। এ ছাড়া বলা হয়েছিল যে তাঁকে একখানা মোটর

গাড়ি এবং থাকবার জন্যে একটি বাংলো বাড়িও দেওয়া হবে।' কিন্তু প্রেমচন্দ সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ভেতর প্রেমচন্দের দুখানি উপন্যাস 'নির্মলা' এবং 'প্রতিজ্ঞা' চাঁদ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'প্রতিজ্ঞা' উপন্যাসটি মূলতঃ তাঁর পূর্বলিখিত 'প্রেমা' উপন্যাসের এক পরিবর্তিত সংস্করণ। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে 'মাধুরী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর হাসির গল্প 'মোটে রাম শাস্ত্রী'। লক্ষ্ণৌর এক বিখ্যাত বৈদ্য এই গল্পটির জন্য পত্রিকার সম্পাদক, মুদ্রক ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন। কিন্তু এই ব্যঙ্গ রচনাটিতে ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করা হয় নি এই সিদ্ধান্ত করে বিচারক মামলাটি খারিজ করে দেন।

প্রেমচন্দের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার ক্রমাগত বৃদ্ধিতে ঈর্ষাকাতর কিছু কিছু সাহিত্যিক প্রেমচন্দেব বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। এঁদের মধ্যে শ্রীঅবধ উপাধ্যায় অন্যতম,—যদিও এ কুৎসার স্রোত ছিল নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। ভারতের গ্রামজীবনে গরীবের ওপর বড়লোকের শোষণ-নির্যাতন, নিম্ন বর্ণের মানুষের ওপর উচ্চবর্ণের নিপীড়ন ও প্রবঞ্চনা তাঁর রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছে বলে কোন কোন তথাকথিত সমালোচক তাঁকে 'ঘৃণা ও হিংসার মতবাদ' প্রচারক বলেও আক্রমণ করেছেন। এ থেকেই বোঝা যায় যে সামাজিক অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার-কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মুন্সী প্রেমচন্দের হাতে কী ক্ষুরধার তরবারিতে পরিণত হয়েছিল নিরীহ লেখনী, বোঝা যায় ভালো করেই যে তাঁকে 'কলম কা সিপাহী' বলে আখ্যাত করার সার্থকতা কোথায়।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে সরস্বতী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর আর এক অমর উপন্যাস, 'গবন'। আমাদের দেশের বিবাহিত মেয়েদের অলংকারপ্রিয়তা সংসারে যে দুঃখ-বেদনা-দুর্দশার জন্ম দেয়, তার এক সার্থক রূপ ভাষা পেয়েছে এই উপন্যাসে। এর আগেও নানা উপন্যাস আর ছোট গল্পে এই সামাজিক কু-রীতির দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছেন প্রেমচন্দ। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দেই প্রেমচন্দ তাঁর আর একখানি মহৎ উপন্যাস 'কর্মভূমি'র রচনায় হাত দেন এবং ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে এই উপন্যাসখানি প্রকাশিত হয়। প্রেমচন্দের চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'গোদান'ও লিখতে আরম্ভ করেছিলেন ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দেই, কিন্তু 'হংস' এবং 'জাগরণ' পত্রিকা নিয়ে নানা গোলমাল দেখা দেওয়ায় এই গ্রন্থখানির প্রকাশে বিলম্ব হয় এবং মৃত্যুর অল্পকাল আগে, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে 'গোদান' প্রকাশিত হয়।

অসুস্থ অবস্থাতেই তিনি 'মঙ্গলসূত্র' নামে আরও একখানি উপন্যাস রচনায় হাত

দিয়েছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর করাল হস্ত তাঁকে জীবিতলোক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, তাই এ উপন্যাসখানা সমাপ্ত করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয়ে ওঠে নি। 'গবন' 'কর্মভূমি'ও 'গোদান' এই ত্রয়ী উপন্যাস রচনার ভেতর দিয়ে হিন্দী সাহিত্যে প্রেমচন্দ যে অবিস্মরণীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন, মহাকালের সাধ্য নেই সে পরিচয়কে বিলুপ্ত করে। যে কোন ঔপন্যাসিকেব পক্ষে এমন ত্রয়ী উপন্যাস রচনা করতে পারা এক পরম গৌববের বিষয়। এই গৌরবের অধিকারী হিসেবেই প্রেমচন্দ চিরদিন হিন্দী উপন্যাস জগতের সম্রাট হয়ে থাকবেন।

সত্যকে অকুণ্ঠভাবে প্রচার করবার জন্যে, মানব-কল্যাণের আদর্শে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে, শোষণ, অত্যাচার ও দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক পৌঁছে দেবার জন্যে প্রেমচন্দ 'জাগরণ' পত্রিকার স্বত্ব কিনেছিলেন। ২২শে আগস্ট, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রেমচন্দ পাক্ষিক 'জাগরণ' পত্রিকাটিকে সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশ করতে শুরু করেন। এই সংখ্যায় পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন, "আমরা এই শিশুটিকে নির্ভীক, সত্যবাদী, পরিশ্রমী ও স্বাস্থ্যবান এক শক্তি করে গড়ে তুলতে চাই যাতে এ নিজের মেরুদণ্ডের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে, কাউকে তার খোসামোদ করতে না হয়, অথচ সঙ্গত ভদ্রতাবোধ ও শালীনতার সীমা কখনও অতিক্রম না কবে। তিক্ত, কটু কথা একে অবশ্য মাঝে মাঝে বলতে হবে সেবাধর্মের আদর্শকে অম্লান বাখবার জন্য।"

'জাগরণ' আর 'হংস' পত্রিকা চালাতে গিয়ে তাঁকে যে প্রচণ্ড ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় তা পবিপূরণেব জন্য শেষ পর্যন্ত তিনি সিনেমা-জগতের দ্বারস্থ হবার সিদ্ধান্ত করেন এবং বার্ষিক আট হাজার টাকার বিনিময়ে সিনেমার সংলাপ রচনার জন্য বোম্বাইয়ের অজন্তা সিনেটোন কোম্পানির সঙ্গে এক বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসেব শেষদিকে তিনি বোম্বাই যাত্রা করেন এবং ৩১শে জুলাই থেকে প্রেমচন্দ 'মজদুর' নামে একটা হিন্দী ছবির সংলাপ রচনা করেন। এ ছবিতে তিনি একটি ক্ষুদ্র ভূমিকায় অভিনয়ও করেছিলেন। ছবিটি অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সেন্সা বোর্ডের অনুমতি লাভ করে এবং পাঞ্জাব, দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ আর মধ্য-প্রদেশে প্রদর্শিত হয়। ছবিটি শ্রমিকদের মধ্যে এমন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যে ভারত সরকার শেষ পর্যন্ত ছবিটির প্রদর্শনী বন্ধ করে দেন।

গণ-প্রচার মাধ্যম হিসেবে সিনেমার গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকলেও ফিল্ম-জগৎ সম্পর্কে প্রেমচন্দের অভিজ্ঞতা মোটেই সুখকর হয় নি। তিনি সিনেমাকে গণচেতনার বিকাশের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু মুনাফার কারবারী ফিল্ম-মালিকেরা যে সিনেমাকে কেবলমাত্র সস্তা বিনোদনমাধ্যম

হিসেবেই ব্যবহার করতে চায়, তা উপলব্ধি করতে তাঁর দেরি হয় নি। তাই তিনি বোম্বাই থেকে জৈনেন্দ্রকে লেখেন, "যে আশা নিয়ে আমি এখানে এসেছিলাম, তা পূর্ণ হবার কোন সম্ভাবনা নেই। এখানকার প্রযোজকেরা তাদেব এতকালের অভ্যস্ত গল্প-কাহিনীর জগৎ থেকে এক ইঞ্চিও সরতে রাজি নয়। স্থূলতাকেই এরা বিনোদন মনে করে, এরা শুধু পছন্দ করে অলৌকিক আর রাজারাণীর কাহিনী। মন্ত্রীর চক্রান্ত নকল লড়াই, চুম্বন—এসবই এদের প্রধান হাতিয়ার। আমি যে সব সামাজিক কাহিনী লিখেছি তা সুশিক্ষিত মানুষেরাও দেখে আনন্দ পাবে, কিন্তু এরা সেগুলোর চিত্ররূপ দিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। এদের ভয়, এসব গল্পের চিত্ররূপ জনপ্রিয় হবে না।"

এক প্রবন্ধে প্রেমচন্দ সে সময়কার চিত্রজগৎ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, "সাহিত্য জনগণের রুচিকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে অনুসরণ কবে না। সিনেমা কেবল প্রচলিত জনগণের রুচিকে অনুসরণ করে, স্থূল জনরুচির দাবিই কেবল মেটায়। মানুষের পশুবৃত্তিগুলোকে উত্তেজিত করাই সিনেমার কাজ, আর সাহিত্য আমাদের নন্দনবোধকে জাগিয়ে তুলে আমাদের আনন্দ দেয়। সিনেমা আব সাহিত্যের আঙ্গিক এক হবাব দিন এখনও বহু দূরে।"

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল, চুক্তি শেষ হবার মাস তিনেক আগেই প্রেমচন্দ সিনেমা জগতের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে ঘবে ফিরে আসেন।

প্রেমচন্দ ছিলেন নিতান্ত ঘরকুনো মানুষ। অভ্যস্ত গৃহনীড়েব নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে বাইরে বেরোনো তাঁর কাছে ছিল এক মহা সমস্যার ব্যাপার। কিন্তু এই মানুষই জীবনের শেষ কটা দিন ব্যাপকভাবে ভারত ঘুরে বেড়ান। যাবার দিনের হাতছানি দেখতে পেয়েই কি তিনি তাঁর প্রাণেব স্বদেশভূমির সঙ্গে নাড়ীর বাঁধনকে আরও শক্ত করে বাঁধতে চেয়েছিলেন? তিনি হিন্দুস্তানী আকাদেমির অধিবেশনে যোগ দেবার জন্যে এলাহাবাদ যান, দিল্লী আর লাহোরে জৈনেন্দ্রের সহযোগিতায় হিন্দী ও উর্দু লেখকদের একত্র সংগঠিত করবার লক্ষ্যে হিন্দুস্তানী সভাব শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি লক্ষ্ণৌ আসেন প্রগতিশীল লেখক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবার জন্য। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির অভিভাষণ প্রসঙ্গে প্রেমচন্দ বলেন, "আমার একথা ঘোষণা করতে কোন দ্বিধা নেই যে অন্যান্য জিনিসের মতো কলাকেও আমি কল্যাণের মূল্যে বিচার করে থাকি। আমাদের সৌন্দর্যবোধের ধারণাকে বদলে ফেলতে হবে…কলা বলতে বোঝাতো এবং এখনও সংকীর্ণ অর্থে বোঝায় শুধুমাত্র আঙ্গিকের পূজা……জীবন-সংগ্রামের ভেতরেই যে শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটছে তা দেখবার মতো ধারণা এখনও কলার গড়ে

ওঠে নি......।

"যারা অর্থলোভী, সাহিত্যের মন্দিরে তাদের স্থান নেই। এখানে শুধুমাত্র সেইসব ভক্তের ঠাঁই হবে যাঁরা জনসেবাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে বিশ্বাস করেন, যাঁরা হৃদয়ে গভীর বেদনা অনুভব করার ক্ষমতা রাখেন আর প্রকৃত ভালোবাসার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে উঠতে পারেন......।

"আমরাই অগ্রণী সৈনিক, আমরাই সমাজের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরি।"

লক্ষ্ণৌ থেকে প্রেমচন্দ লাহোর যান ও আর্য প্রতিনিধি সভার আয়োজিত এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। লাহোর থেকে তিনি ভারতীয় সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য নাগপুরে যান। এই অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী এবং জওহরলাল নেহরুও যোগ দিয়েছিলেন।

প্রেমচন্দের রোগজীর্ণ শরীরের এত পরিশ্রম সহ্য করবার শক্তি ছিল না। দীর্ঘকাল ধরেই তিনি পুরাতন আমাশয় রোগে কষ্ট পেয়ে আসছিলেন, এখন তা থেকে শোথ আব গ্যাসট্রিক আলসার দেখা দিল। ১৬ই জুন তাঁর রক্তবমি ও মলের সঙ্গে রক্তক্ষরণ শুরু হয়, তিনি পাকস্থলীতে ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকেন। এত অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি ১৯শে জুন 'আজ' পত্রিকা অফিসে অনুষ্ঠিত মাক্সিম গোর্কীব শোকসভায় যোগ দেন এবং এ উপলক্ষে একটি অভিভাষণও রচনা করেন। সভাতে তিনি এত দুর্বল হয়ে পড়েন যে অভিভাষণটি অন্যকে পাঠ করতে হয়।

২৫শে জুন রাত্রিতে তাঁর অবস্থার আরও অবনতি হয়, আবার তিনি রক্তবমি করেন। এই রোগেব মধ্যেও তিনি তাঁব শেষ উপন্যাস 'মঙ্গল সূত্র' লিখতে থাকেন। কিন্তু তিনি এটি শেষ করে যেতে পারেন নি।

২রা আগস্ট চিকিৎসার জন্য তিনি লক্ষ্ণৌ যান, কিন্তু চিকিৎসায় রোগেব কোন উপশম না হওয়ায় বারাণসীতে ফিরে আসেন। তাঁকে আর একটা নতুন, আলো-যুক্ত বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়। জীবনের এই শেষ দিনগুলোতে তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুরা সবসময় তাঁকে ঘিরে থেকেছেন, সেবা করেছেন—তাঁর প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা-প্রীতির অর্ঘ্য উজাড় করে দিয়েছেন। এ সব সাহিত্যিক বন্ধুদের ভেতর জৈনেন্দ্র, মুন্সী দয়ানারায়ণ নিগম, 'প্রসাদ', নন্দদুলারে বাজপেয়ী, পণ্ডিত রামনরেশ ত্রিপাঠী, 'নিরালা' প্রভৃতি প্রধান।

এ সময় 'হংস' পত্রিকার কাছ থেকে সরকার এক হাজার টাকা জামানত দাবি করে। ভারতীয় পরিষদ পত্রিকাটিব প্রকাশ বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত করে এবং প্রেমচন্দের নাম দিয়ে পত্রিকায় এ সিদ্ধান্ত বিজ্ঞাপিত করা হয়। কিন্তু প্রেমচন্দ গান্ধীজীর অনুমতি নিয়ে পত্রিকাটি চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত করেন এবং জামানতের

এক হাজার টাকা জমা দেন। স্ত্রী শিবরাণী দেবীকে তিনি বলেন, "রাণি, জামানতের টাকাটা জমা দিয়ে দাও। আমি বাঁচি, আর না বাঁচি 'হংস' বেঁচে থাকবে। আমি সেরে উঠলে সব গুছিয়ে নিতে পারবো, আর মরে গেলে 'হংস' আমার স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাকবে।"

'হংস' পত্রিকার সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রেমচন্দের শেষ রচনা "মহাজনী সভ্যতা" প্রকাশিত হয়। এই রচনাটিকে তাঁর শিল্প-ভাবনার শেষ কথা বলা যেতে পারে। এই প্রবন্ধে তিনি 'মুনাফালোভ'কেই আধুনিক সমাজজীবনের সমস্ত পাপের জন্য দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, "এই পুঁজিবাদী সংস্কৃতিতে টাকাকড়িই সকল কার্য-কলাপের একমাত্র লক্ষ্য। পুঁজিপতি আর মহাজনরা যাতে মুনাফার পাহাড় বানাতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই প্রতিটি দেশের শাসন পরিচালিত হয়। মানবসমাজ আজ দু ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। বৃহত্তর ভাগে রয়েছে তারা যারা শুধু মেহনত করে মরে আর এক অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশে আছে সেই সব মানুষেরা যারা তাদের ক্ষমতা আর প্রভাব খাটিয়ে এক বিরাট জনসমষ্টিকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে। এই বিরাট অংশের মানুষদের জন্যে তাদের কোন স্নেহ, প্রীতি বা সহানুভূতি নেই। এরা শুধু তাদের প্রভুদের জন্য মেহনত করতে আর রক্ত ঝরাতেই বেঁচে থাকে, তারপর একদিন নীরবে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়......।

"দূর প্রতীচ্যে নতুন সভ্যতার সূর্য উঠেছে। এই সভ্যতা মহাজনীরাজ বা পুঁজি-বাদের আমূল উচ্ছেদ করেছে। এই নূতন সভ্যতার মূল নীতি এই যে, যে সব নাগরিক তাদের কায়িক বা মানসিক শ্রমের দ্বারা কিছু সৃষ্টি করে, তারাই কেবল সমাজের সম্মানিত নাগরিক হতে পারবে। অন্যের শ্রমে শক্তিমান হয়ে অথবা পূর্বপুরুষের ধনসম্পদের জোরে যারা প্রভুত্ব করে, তারা ঘৃণ্য জীব। এ রকম লোকদের দেশের শাসন-ব্যাপারে মত প্রকাশ করবার কোন অধিকার নেই, নাগরিকত্ব লাভের অধিকার নেই। পুঁজিপতিরা এতে ক্ষেপে গিয়ে দুনিয়ার আর সব পুঁজিপতিদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ওদের গালাগাল করছে, অভিশাপ দিচ্ছে...।"

প্রেমচন্দের জীবনের শেষ রাত্রি ৭ই অক্টোবর, ১৯৩৬। এই রাত্রিতে জৈনেন্দ্র তাঁর শয্যাপার্শ্বে বসে ছিলেন। রাত তিনটে পর্যন্ত প্রেমচন্দ জৈনেন্দ্রের সঙ্গে দু-একটা কথাবার্তা বলেন। তারপর তিনি জৈনেন্দ্রকে ঘুমোতে যেতে বলেন। ভোরবেলায় প্রেমচন্দ সংজ্ঞাহীন হয়ে যান। এই অবস্থাতেই ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর সকাল সাতটায় প্রেমচন্দের মৃত্যু হয়।......

প্রেমচন্দের কনিষ্ঠপুত্র এবং তাঁর প্রখ্যাত জীবনীকার অমৃত রায় তাঁর "প্রেমচন্দ : কলম কা সিপাহী" গ্রন্থের সমাপ্তিতে এই মহান শিল্পীর প্রায় নিঃশব্দ অন্তিমযাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে :

"লামাহিতে খবর গেল। আত্মীয়স্বজনরা আসতে শুরু করল। এগারটা বাজতে বাজতে জনা বিশ-পঁচিশ লোক কোন এক অপরিচিত মানুষের শবদেহ নিয়ে মণিকর্ণিকার দিকে রওনা হল। রাস্তায় একে অপরকে জিজ্ঞাসা করল : কে গেল? জবাব এল : এক মাস্টার ছিল।

"এদিকে বোলপুরে রবীন্দ্রনাথ ধীরকণ্ঠে বললেন : এক রত্ন পেয়েছিলে তোমরা, তাকে তোমরা হারালে।"

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

(১) Premchand : A Biography—P. C. Gupta

(২) প্রেমচন্দ : কলম কা সিপাহী—অমৃত রায়

(৩) প্রেমচন্দ : ঘরমে—শিবরাণী দেবী

(৪) প্রেমচন্দ : কলম কা মজদুর—মদন গোপাল

কালোত্তীর্ণ খ্যাতির শিখরে

অমৃত রায

ইদানীং কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন যে প্রেমচন্দ পুরানো হয়ে গেছেন, তাঁর লেখা অগভীর, অতি সরল, একমাত্রিক ; তাতে না আছে অনুভূতির গভীরতা, না আছে আধুনিকতা ; মানুষের মনের অতলান্ত গভীরতা আর জটিলতা—যা আধুনিক সাহিত্যের মর্মবস্তু—প্রেমচন্দের রচনায় অনুপস্থিত ; বড় জোর তিনি একজন সমাজসংস্কারক বা নীতিপ্রচারক ; তাঁর ছোট গল্পের ধারণাটাই কি বিষয়গত, কি আঙ্গিকগত, সব দিক দিয়েই নিতান্ত সেকেলে। মূলতঃ তিনি একজন গল্প-বলিয়ে,—আর এই গল্প "বলার" যুগ আর এখন নেই, গল্প এখন "বলা" হয় না, "লেখা" হয়—এবং এদিক থেকেই আধুনিক লেখকরা প্রেমচন্দকে ছাড়িয়ে গেছেন,—এঁদের রচনার সূক্ষ্ম কারুকার্য, অনুভূতির গভীরতা এবং বাস্তবতা সম্বন্ধে অন্তর্গূঢ় দৃষ্টি—এর কোনটাই প্রেমচন্দে ছিল না ; ইত্যাদি, ইত্যাদি……। এমনি ভূরি ভূরি অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে।

এখন মজার কথা হল, এই সব অভিযোগ নূতন কিছু নয়। প্রেমচন্দেব জীবদ্দশাতেই এবং তাঁর মৃত্যুর পরও গত চার দশক ধরে লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের এক ছোট গোষ্ঠীকে এই ধরনেব কাদা ছিটানোয় লিপ্ত দেখা গেছে। প্রকৃতপক্ষে, প্রেমচন্দকে সারা জীবন ধরেই এই ধরনের আক্রমণের মোকাবিলা করতে হয়েছে। শিল্প মাত্রই প্রচার—এই ধরনের উক্তি প্রেমচন্দ তাঁর লেখায় যে বারংবার করেছেন,—এটাকে ধরে নেওয়া যেতে পারে তাঁরই সমালোচকদের বিরুদ্ধে এক চ্যালেঞ্জ রূপে। এবং এই প্রশ্নে প্রেমচন্দ কখনো আপোষ করতে রাজী ছিলেন না। (সাহিত্য বিষয়ে প্রেমচন্দের মতামতের জন্য বর্তমান সঙ্কলনে "সাহিত্যের উদ্দেশ্য" দ্রষ্টব্য—সম্পাদক)

এ সম্বন্ধে তাঁর মতামতকে বিশদ করতে গিয়ে প্রেমচন্দ এক জায়গায় বলছেন :

"যদি আমরা কৃষকদের মধ্যে বসবাস করি অথবা তাদের মধ্যে বাস করার যদি সুযোগ হয়, তবে স্বভাবতই তাদের সুখ দুঃখের আমরা অংশীদার হই।... ...এখন, কেউ যদি বলেন যে অমুকে কৃষকদের অথবা শ্রমিকদের অথবা কোন আন্দোলনের প্রচারক—তবে সেটা হয় খুবই অবিচার। এই প্রসঙ্গে তাই প্রচার এবং সাহিত্যের মধ্যে প্রভেদ কি, তা বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন।......প্রচার আমরা উপভোগ করতে পারি না, কারণ, তাতে অনুভূতির অভাব রয়েছে। কিন্তু, যদি কোন সুনিপুণ শিল্পী তার মধ্যে অনুভূতি এবং সৌন্দর্যের সংযোজন করতে পারেন, তবে তাই হয়ে দাঁড়ায় ভাল সাহিত্য। "আঙ্কল্ টম্'স কেবিন" দাসত্বের বিরুদ্ধে এক প্রচার,—কিন্তু, তা কি ধরনের প্রচার! তার প্রতিটি শব্দ গভীর অনুভূতিতে পূর্ণ। একে আপনি তাই প্রচাব বলে উড়িয়ে দিতে পারেন না। বার্নার্ড শ'র নাটক, এইচ. জি. ওয়েল্স্এর উপন্যাস, গল্স্ওয়ার্দির নাটক ও উপন্যাস, ডিকেন্স, মেরী করেলী, রোমাঁ রলাঁ, টলস্টয়, ডস্টয়েভ্স্কি, ম্যাক্সিম গর্কী, আপটন সিনক্লেয়ার,—এরকম অসংখ্য নাম বলা যেতে পারে—যাদের লেখায় সাহিত্য ও প্রচারের মিলন ঘটেছে। কোন বিষয়ের নীরস বর্ণনাই প্রচার, আর অনুভূতি ও সৌন্দর্যে সিক্ত যা কিছু, তাই প্রকৃত সাহিত্য। কোনও সাহিত্যিক কেন কোন বিশেষ বিষয়ের প্রতি অনুরক্ত—একথা প্রশ্ন করার এক্তিয়ার আমাদের নেই : সে জিনিস লেখকদের অবস্থা ও রুচি অনুযায়ী তাঁর নিজস্ব নির্বাচনের বিষয়। আমাদের কাছে কোন রচনা-বিচারের একটাই কষ্টিপাথর—তা হল এই যে তা আমাদের সত্য ও সুন্দরের কাছে পৌঁছে দেয় কিনা! যদি দেয়, তবে তা সাহিত্য, যদি না দেয়, তবে প্রচার বা তার চেয়েও নিকৃষ্ট কিছু।"

যে একনিষ্ঠার সঙ্গে এই লেখক সারা জীবন তাঁর এই ধারণার প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছেন,—মনে হয় তারই ফলে একদল সমালোচক, যাঁরা চিরাচরিত অভিজাত-সুলভ এক ধারণাবশত সাহিত্যকে উপরতলার বিষয় বলে মনে করে এসেছেন—ব্রাত্যজনের মধ্যে সাহিত্যকে নিয়ে আসায় প্রেমচন্দের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়েছেন। এ'দের মতে এই সব অসভ্য বর্বরেরা কিভাবে সাহিত্যের আঙিনায় আসবে? তাদের সূক্ষ্মবোধ কোথায়? সাহিত্যের কথা এদের কানে ঢোকাব কেমন করে? আর কেনই বা তা করব? প্রেমচন্দের এসব অহমিকা ছিল না। তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষেরই একজন, এবং তাদের জন্যই তিনি লিখেছেন। তাঁর মধ্যে এই উন্নাসিক ধারণা কখনোই ছিল না যে সাধারণ মানুষেরা এত মাথা-মোটা এবং অসংস্কৃত যে তারা তাঁর কথা ও তাঁর লেখার সূক্ষ্ম দিকগুলিকে বুঝতে পারবে না। মনে হয়, যে ঘটনা, এই সব সমালোচকদের আরও ক্রুদ্ধ করেছে, তা হল এই যে

সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রেমচন্দের এই আত্মীয়তা তাঁর লেখাকে দুর্বল, ছোট বা অশ্লীল তো করেই নি, বরং তা তাঁকে লেখক হিসেবে আরও গরীয়ান এবং মহীয়ান করে তুলেছে। পাঠক সমাজে তাঁর জনপ্রিয়তা এতে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাঠক বলতে আমরা বোঝাচ্ছি রীতিমত সৎ-সাহিত্যের পাঠক, সেইসব বাজারী এবং যৌন ও অপরাধমূলক তথাকথিত "জনপ্রিয়" সাহিত্যের পাঠক নয়।

লক্ষণীয় যে গত অর্ধ শতাব্দী ও তার অধিক কাল ধরে প্রেমচন্দের জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। এই সমগ্র সময়কালের মধ্যে তাঁকে দেখা যায় একচ্ছত্রপতির আসনে আসীন। কেউ যদি কোন সাধারণ পাঠাগারে হিন্দী সাহিত্যের বই দেওয়া-নেওয়ার কোন হিসেব নেন, তবে নিঃসন্দেহে তাতে শীর্ষভাগে দেখতে পাবেন প্রেমচন্দকে। এর কারণ কি? এর কারণ কি এই যে তিনি এখন "ক্লাসিকের" পর্যায়ে পড়েন? ক্লাসিক নানা ধরনের হয়,—মৃত ক্লাসিকও তো আছে। মানুষ তাকে শ্রদ্ধা করে, এমন কি পূজোও করে, কিন্তু সর্বদা পাঠ করে না। কেবলমাত্র জীবন্ত ক্লাসিকই পঠিত হতে থাকে। প্রেমচন্দ, সম্ভবতঃ, সেই জাতের ক্লাসিকের স্রষ্টা। আজও সেই পুরানো দিনের মতই তাঁর পাঠক অজস্র, তার কারণ, আজও তিনি সেদিনের মতই জীবন্ত। আজ এই যে সারা বিশ্ব প্রেমচন্দের শতবার্ষিকী পালনের জন্য সমবেত হচ্ছে (লেখক প্রেমচন্দ শতবর্ষ উপলক্ষে ১৯, ২০, ২১ মে, ১৯৮০তে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কথা বলছেন—সম্পাদক)—তার কারণ কি শুধু এই যে তিনি একজন মহৎ সাহিত্যিক ছিলেন? অথবা, তার কিছু অন্য কারণ আছে?

সম্ভবতঃ আছে,—এবং তা হল এই যে প্রেমচন্দ আজও পুরাতন হয়ে যাননি। খুব সহজেই বোঝা যায়, যে ভারতবর্ষকে প্রেমচন্দ চিত্রিত করে গেছেন, এখানে ওখানে কিছু মাজাঘষা ভিন্ন মূলতঃ আজও সে তেমনি আছে। তাঁর "কফন" বা "পুষ কি রাত" গল্পে অত্যন্ত শক্তিশালী কলমের আঁচড়ে আঁকা সেই নির্মম দারিদ্র্যের ছবি আজও আধুনিক, "গোদান" ও "প্রেমাশ্রম" উপন্যাস বা অজস্র গল্পে বর্ণিত জোতদার, জমিদার, মহাজন ও পাটোয়ারীগণ কর্তৃক রক্ত শোষণের নিষ্ঠুরতা ধারাবাহিকভাবে আজও ভারতবর্ষে চলেছে। একজন দরিদ্র চাষী ক্রমে ক্রমে ভূমিহীন হয়ে শহরে চলে এল,—যেখানে সে একজন মজুর বা ভৃত্য বা অন্য কিছু হয়ে তার শ্রমশক্তি বেচতে পারে,—কিন্তু সে তার হৃদয় ফেলে এল সেই তার এক টুকরো জমিতে যা একদা তার ছিল কিন্তু এখন আর নেই, এবং সেইখানেই সে প্রেতাত্মা হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল,—"বলিদান" নামক স্বল্প-পরিচিত সেই অসামান্য গল্পটির এই হল বিষয়বস্তু। "বরদান" নামক ছোট উপন্যাসের চরিত্র

বীরজন কুসংস্কার আর মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাসী।. "প্রতিজ্ঞা" উপন্যাসের যুবতী বিধবা লোকাচারের নিষ্ঠুর নিয়মে সারাজীবন বিধবাই থেকে যায়, আর "নির্মলা' উপন্যাসে অল্প-বয়স্কা নারীর বিবাহ হয় এক বৃদ্ধের সঙ্গে। এই সমস্ত ঘটনাই আজও ঘটে চলেছে। "সেবাসদনে"র নায়িকা সুমনের মত হাজার হাজার নারী আজও পতিতালয়ের দিকে পা বাড়াচ্ছে। "রঙ্গভূমি" উপন্যাসের ভূমিচ্যুত সুরদাসের মতই আজও হাজার হাজার মানুষ পুঁজিবাদী শিল্পায়নের সমস্যাবলীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে। ১৯২৬ সালে কাউন্সিলে প্রবেশ নিয়ে কংগ্রেস যখন বিতর্কে লিপ্ত, সো সময় রাজনৈতিক ক্ষমতার বিষয় নিয়ে প্রেমচন্দ "কায়াকল্প" রচনা করেন উপন্যাসটির রচনাশৈলীর জটিলতার কারণে অনেকে এটিকে জন্মান্তরের কাহিনী বলে ভুল করেন। আসলে এটি রাজনৈতিক ক্ষমতার ফলে মানুষের লোভী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং আত্মসর্বস্ব জীবে রূপান্তরের কাহিনী,—ভারতবর্ষে আধুনিক রাজনৈতিক রঙ্গ-মঞ্চের এই বীভৎসতা আমরা চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করছি। নিজের ধনসম্পদকে যা নয় তার বেশী করে জাহির করার অসুস্থ প্রবণতা—আমাদের মধ্যে আজও দেখতে পাই,—যা "গবন" উপন্যাসে রমানাথেব জীবনে দুর্দৈব ডেকে আনে। স্ত্রীলোকেব অলঙ্কারপ্রিয়তায় এর সূত্রপাত আর শেষ পর্যন্ত লোকের চোখে অবিশ্বাসের পাত্র হয়ে এবং তহবিল তছরূপের দায়ে নানা বিপদে জড়িয়ে পড়ার মধ্যে এর সমাপ্তি। ঘুষ জিনিসটা তো এখন আমাদের জীবনেরই অঙ্গ,—এবং এ নিয়ে এখন আর কেউ মাথা ঘামায় না। তবে প্রেমচন্দের যুগেও এসব ছিল, আর তাই নিয়ে তিনি লিখেছিলেন "নমক কা দারোগা"—যা বাস্তবতার গুণে আজও অমব হয়ে আছে। অথবা ধরুন, প্রেমচন্দের সেই প্রথম উর্দু উপন্যাস "অসরার-এ-মৃভগবিদ" (একটি মন্দিরের রহস্য)—যাতে এক মোহান্তের জীবনে সুরা ও নারীর যথেচ্ছ ভোগের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আজকের দিনে তো এইসব পরগাছাদের ঝোপঝাড় আরও ঘন হয়ে উঠেছে।

এমনি উদাহরণের কোন শেষ নেই, কারণ, প্রেমচন্দ সচেতন ও সক্রিয়ভাবে তাঁর কাল এবং সমাজকে অজস্রধারায় অঙ্কন করে গেছেন। যতদিন পর্যন্ত না এই সামাজিক প্রেক্ষাপটটি পরিবর্তিত হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত তাঁর প্রাসঙ্গিকতা কখনো ফুরিয়ে যাবে না। এবং এমনকি কখনো যদি এইসব সমস্যা মিটেও যায়, তাহলেও তিনি পুরানো হবেন না,—কারণ, তিনি জীবন্ত রক্তমাংসের মানুষের জীবনের গভীরে দৃষ্টিপাত করে তাদের মানবিক প্রবৃত্তি নিয়ে লিখেছেন এবং জীবন থেকেই তিনি তাঁর পাত্র-পাত্রীদের আহরণ করেছেন। যে লেখক এ কাজ করতে পারেন, তিনি সহজে পুরানো হবার নন।

তাঁর লেখার বিষয়বস্তু সম্পর্কে এটুকুই যথেষ্ট। আঙ্গিক সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রথমেই এই অভিযোগটি নিয়ে আলোচনা করা যাক যে তাঁর ছোটগল্পগুলি "গল্প বলা"র ধরনে লেখা। প্রকৃতপক্ষে প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরে লিখিত প্রেমচন্দের গল্পগুলি বহু বিচিত্র ধরনের। প্রশ্নোত্তরে নীতি-গল্পের ঢঙে লেখা তাঁর প্রথম গল্প "দুনিয়াকা সবসে আনমোল রতন", তা ছাড়া রয়েছে সাবেকী ধরনে রাজকুমার-রাজকুমারী-যোগীদের নিয়ে রহস্য-রোমাঞ্চের গল্প, অথবা মাঝে মধ্যে আলৌকিক কাহিনী ও যাতে হয়তো একটা বাঘই পরিণত হয়ে যায় মানুষে। এসব গল্প অবশ্য সংখ্যায় কম, এবং তাছাড়া এই পুরানো ঢঙ সত্ত্বেও "শিকারী রামকুমারের" মত গল্পগুলিতে এমন এক নূতন বক্তব্য, বিন্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে যে তা গল্পের সমগ্র চরিত্রকেই পালটে দেয়। স্বীকার করতেই হবে, এসব গল্পের অনেকগুলি কালে বিলীন হয়ে যাবে, কিছু কিছু ইতিমধ্যেই হতে শুরু করেছে। কিন্তু, তাঁর অধিকাংশ গল্পই দৈনন্দিন জীবনের সাদামাটা গল্প, সাদাসিধে ভাবে বলা। কিন্তু, তা সত্ত্বেও এগুলিতে বৈচিত্র্য রয়েছে যথেষ্ট। কিছু কিছু গল্পে সুগ্রথিত কাহিনী-বিন্যাস এবং ঘটনার ঘনঘটা রয়েছে, আবার কতকগুলি অত্যন্ত সাদামাটা। কিন্তু এই সব সাদামাটা গল্পেও গল্পের মৌল উপাদানগুলির অভাব নেই,—যখন প্লট নেই, তখন রয়েছে চরিত্র, আর যখন উভয়ই অনুপস্থিত, তখন রয়েছে জীবন-রঙ্গ নিয়ে লেখকের তীক্ষ্ণ আত্মকর্থন। "কাশ্মিরী শেও" জাতীয় গল্পে লেখকের এই ধরনের বক্তব্য খুব খোলাখুলি ভাবে প্রায় কোন কাহিনীসূত্র ছাড়াই বলা হয়েছে। তবে এ নিয়ে সম্ভবতঃ প্রেমচন্দের সঙ্গে ঝগড়া চলে না। কারণ, যে কোন সময় তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলতে পারেন—এই মশায় আমার গল্প,·· যাতে কোন কাহিনী নেই, তা নিয়ে কাহিনী বানাবার কি সার্থকতা···অতএব, কাহিনী না লিখে যা লেখার তাই লিখছি।

এই দিক থেকে দেখলে কিন্তু তাঁর অধিকাংশ ভাল গল্পের প্লটই খুব সাধারণ। যেমন, পুষ কি রাত, কফন, সদগতি, সওয়া সের গেহু, বড়ে ভাইসাহাব, মন্ত্র কা যশ, ইত্যাদি। কিন্তু, তা সত্ত্বেও, গল্পের মধ্যে তো চাই কোন না কোন আকর্ষণ, ঘটনার টানাপোড়েন, গল্পের বিন্যাসটিকে দৃঢ় করবার জন্য কিছু মনস্তাত্ত্বিক সত্য—পাঠককে যা শেষ অবধি টেনে নিয়ে যেতে পারে। প্রেমচন্দের মধ্যে এসবই রয়েছে অফুরন্ত, আর এই অসাধারণ ক্ষমতাই প্রেমচন্দের সাফল্যের চাবিকাঠি। সেইজন্যই পঞ্চাশ বছরেরও বেশী সময় ধরে পাঠকদের ভালবাসার চূড়ায় বসে তাঁর এই একচ্ছত্র আধিপত্য কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। প্রেমচন্দের খুঁত না ধরে উত্তরকালের শিল্পী সাহিত্যিকদের উচিত তাঁর এই ক্ষমতাকে অর্জন করবার চেষ্টা করা।

এক কথায়, প্রেমচন্দ যে আজও আমাদের মধ্যে বেঁচে আছেন, তার মূলে

আছে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা: আর, যেহেতু এই সম্পর্ক ছিল জীবন্ত, তাই তা গতিময়ও বটে। তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকেই বড় হয়েছেন, আরও ভালো, আরও সুন্দর, আরও মানবিক, আরও শান্তিময় পৃথিবীর জন্য তাদের সংগ্রামের তিনি সাথী হয়েছেন। চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর জঙ্গমতাই তাঁর মধ্যেকার সবচেয়ে বড় বিস্ময়। সাধারণত যা ঘটে, একজন লেখক একটা সময়ের পরে তাঁর চিন্তার গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। এখান থেকেই তার বোকা হবার সূত্রপাত। আমাদের এই মানুষটির ক্ষেত্রে কিন্তু এমন কিছু ঘটেনি।

আমরা যতদুব জানি, বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি আকর্ষণের মধ্য দিয়েই প্রেমচন্দের নূতন ভারত গড়ার স্বপ্নেব সূত্রপাত। ভারতবর্ষকে প্রথম স্বাধীন হতে হবে, সমাজ সংস্কার তার পরে। অতএব, যে কেউ ভাবতবর্ষের মুক্তির জন্য লড়াই করছিল, প্রেমচন্দ ছিলেন তারই দিকে। এই সহানুভূতি বশতই প্রেমচন্দ তৎকালে একজন সরকারী কর্মচারী হয়েও নিজের পড়ার ঘরে বৃটিশের ফাঁসীর মঞ্চে আত্মাহুতি দেওয়া শহীদ ক্ষুদিরামের ছবি টাঙিয়ে রাখার দুঃসাহস দেখাতে পারতেন। এইসব বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি এই সময়কাব তাঁর বিভিন্ন রচনায় এবং "সজ-এ-ওয়াতন" গল্পগ্রন্থে দেখা যায়। বলা বাহুল্য, গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল এবং পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল।

কিন্তু, যেহেতু এই আন্দোলন ছিল ব্যক্তিগত দুঃসাহস, আত্মত্যাগ ও শৌর্যের ওপর ভিত্তিশীল, প্রেমচন্দ খুঁজছিলেন এমন কিছু যা গণচেতনার এবং সর্বব্যাপক মুক্তি-আন্দোলনের জন্ম দেবে। কংগ্রেসের "গরম দল" বলে পরিচিত লাল-বাল-পাল ত্রয়ী অর্থাৎ লালা লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক এবং বিপিন চন্দ্র পালের নেতৃত্বের মধ্যে তিনি তা সম্ভবতঃ খুঁজে পেলেন। ১৯০৮ সালে তিলক বন্দী হয়ে মান্দালয়ে প্রেরিত হলেন, এবং এর পর এঁদের আন্দোলনে ভাঁটা পড়ল। এই সময়ই প্রেমচন্দ সমাজ সংস্কারের দিকে আকৃষ্ট হলেন। "আর্য সমাজে"র কার্যধাবা এবং একটু দূর থেকে রাণাডের "সোশ্যাল রিফর্ম লীগ" তাঁকে আকর্ষণ করল। সমাজ সংস্কারের এই ঝোঁক তাঁর সৃষ্টিশীল প্রতিভার পাশাপাশি প্রথমাবধিই সক্রিয় ছিল। ১৯০৪ সালে তিনি "হাম খুরমা-ও-হামসাওয়াব"-এর প্রায় একই সঙ্গে "আসরার-ই-মৃভগবিদ" লিখেছিলেন, —এবং এই শেষোক্ত গ্রন্থটি ১৯০৭ সালে "প্রেমা" নামে হিন্দীতে প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা জানি এই গ্রন্থে প্রেমচন্দ বিধবা বিবাহের সমস্যা নিয়ে লিখেছেন। আর্যসমাজও এই সময় বিধবা বিবাহ নিয়ে প্রচার চালাচ্ছিল। কিন্তু, প্রেমচন্দ যে এর দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়ে লিখেছিলেন তা বলা যায় না, কারণ, ঘটনার সাক্ষ্য প্রমাণ অনুসারে আর্যসমাজের সঙ্গে তাঁর

প্রথম যোগাযোগ ঘটে ১৯০৮ সালে তাঁর হামিরপুরে অবস্থান-কালে। অর্থাৎ, সমস্যাটি সমাজের অভিজ্ঞতা থেকেই প্রেমচন্দ্রের মনে আলোড়ন তুলেছিল। যাই হোক, একটা কথা খুব স্পষ্ট, তা হল এই যে সমাজসংস্কার সম্পর্কে আর্যসমাজের প্রতি তাঁর যতটা সমর্থনই থাক না কেন, মুসলমান-বিরোধিতার প্রশ্নে তিনি সর্বদাই এদের থেকে দূরে থেকেছেন। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ অহিন্দুদেব হিন্দু সমাজে নিয়ে আসার জন্য আর্যসমাজ প্রবর্তিত "শুদ্ধি আন্দোলনে"র বিরুদ্ধতা করে লেখা তাঁর "কাহাতুবিজ্জাল" অর্থাৎ "প্রকৃত ও সত্যাশ্রয়ী মানুষের দুর্ভিক্ষ" নামক প্রবন্ধ। মোটকথা, প্রেমচন্দ কারু কাছে তাঁর চিন্তাকে বন্ধক রাখতেন না, এবং প্রয়োজনে যে কারুর সঙ্গ ত্যাগ করে একলা চলতেও তিনি পিছপা ছিলেন না।

গান্ধীজী ও গান্ধীবাদ সম্বন্ধেও তাঁর ঠিক এই নীতি। তিনি গান্ধীজীকে গভীর আগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন, কারণ, গান্ধীজী কয়েকজন নেতার বৈঠকখানা থেকে জাতীয় আন্দোলনকে রাস্তায় নামিয়ে এনেছিলেন, ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন নিবেদনেব পবিবর্তে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য জনগণের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন,—এবং এটা ছিল নিঃসন্দেহে এক বিরাট পদক্ষেপ। তাছাড়া গান্ধীজী ছিলেন বাস্তববাদী এবং কাজের মানুষ। গান্ধীজীর মূল নীতি "হৃদয় পরিবর্তনের"ও তিনি সমর্থক ছিলেন। তবে, এ বিষয়ে তিনি বোধহয় গান্ধীজীর চেয়ে টলস্টয়ের দ্বারা অধিক প্রভাবিত হয়েছিলেন। কারণ দেখা যায় গান্ধীজী যখন গুজরাটীতে টলস্টযের গল্পগুলি অনুবাদ করেছিলেন, প্রেমচন্দ তখন হিন্দীতে এই অনুবাদ করে চলেছিলেন। যাই হোক, এটা আমাদের বোঝা ভাল যে, এমনকি যখন তিনি গান্ধীজীর সম্পূর্ণ অনুগত ছিলেন, সে সময়ও তিনি তাঁকে অন্ধভাবে গ্রহণ করেননি এবং তাঁব চিন্তা ভাবনাও গান্ধীজীর মতাদর্শের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকেনি। গান্ধীজী যে কোন কারণেই হোক স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যাখ্যায় দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, এবং অস্পষ্টভাবে তিনি একে "রামরাজ্য" আখ্যা দিতেন। জওহরলাল নেহেরু এবং অন্যান্য তরুণ নেতাগণের চেষ্টা সত্ত্বেও তাই সম্ভবতঃ ১৯২৯ সালের লাহোর কংগ্রেসের আগে পর্যন্ত "পূর্ণ স্বাধীনতা"র দাবী উত্থাপিত হতে পারেনি।

প্রেমচন্দ কিন্তু, এই রামরাজ্য নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি বুঝেছিলেন, জনসাধারণকে সংগ্রাম করবার জন্য জাগাতে হবে, এবং সেজন্য অপেক্ষা করার আর সময় নেই। ১৯২১ সালে, যখন স্বরাজ্য সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠেনি তখনই তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, "যখন দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব জনগণের হাতে আসবে তখন তাকে বলব স্বরাজ্য।" আর ১৯১৯ সালে

আমরা দেখতে পাই তিনি একজন বন্ধুকে লিখছেন : "আমি এখন বলশেভিক আদর্শে প্রায় বিশ্বাসী।"

আসলে প্রেমচন্দ সবসময়ই চাইতেন. যে অত্যাচারিত শ্রমিক সাধারণ মানুষের উপর সমস্ত অত্যাচার বন্ধ হোক, তাদের ওপর পুঁজিবাদীদের শোষণ বন্ধ করতে হবে, আর যেহেতু রাশিয়ার বিপ্লব সেই দিকেই পথনির্দেশ করছে, তাই প্রেমচন্দ তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন স্বতস্ফূর্তভাবেই।

মূল কথাটা হচ্ছে সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর স্থির বিশ্বাস। আর তাঁর সেই বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে ১৯৩১ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনের এক চরম মুহূর্তে লেখা তাঁর ছোট গল্প "আহুতি"তে এইভাবে :

"যদি দেশের স্বাধীনতার পরও এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অর্থের লোভ আর স্বার্থপরতা এখনকার মতই রয়ে যায়, তবে আমি বলতে বাধ্য যে দেশে যেন সেরকম স্বাধীনতা না আসে। ব্রিটিশ পুঁজিবাদী আর আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বার্থপরতাই আমাদের মারছে। আমরা আজ যে সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিদিন লড়াই করছি, সেদিনও সাধারণ মানুষ কি সে সব মেনে নেবে শুধু এই কারণে যে বিদেশীরা নয়, ভারতীয়রাই দেশের শাসক ? আমার কাছে অন্ততঃ স্বরাজ মানে "জন"-এর জায়গায় "গোবিন্দ" নয়।

এই লেখা আমাদের মনে করিয়ে দেয় ১২ বছর আগে ১৯১৯ সালে লেখা তাঁর 'পুরানো দিন, নতুন দিন" নামক প্রবন্ধের ক্রুদ্ধ উক্তিগুলিকে। সন তারিখের হিসেব এইভাবে মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, একটাই বোধ তিনি সারা জীবন বহন করেছেন, তা হল স্বদেশপ্রীতি। দেশের পক্ষে কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ—এই বিচারই তার সমস্ত চিন্তা ভাবনাকে সচল রেখেছে।

তাঁর শেষ বিশ্বাসের দুই দলিল, "মহাজনী সভ্যতা" নামক প্রবন্ধ এবং "মঙ্গলসূত্র" নামক অসমাপ্ত উপন্যাস। "মঙ্গলসূত্র" উপন্যাসে তিনি কিভাবে চূড়ান্তভাবে গান্ধীজীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করছেন, তার কিছু নমুনা দেওয়া যাক :

"হ্যাঁ, দেবদূতেরা চিরকাল আছেন, এবং থাকবেনও। তাঁদের চোখে পৃথিবীটা এখনও ধর্ম এবং নীতিশাস্ত্রের অনুশাসনে চলছে। যাঁরা তাঁদের জীবন বিসর্জন দিয়ে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করেন। কিন্তু কেন তাঁদের দেবদূত বলব ? তাঁদের বরং স্বার্থান্বেষী বলা উচিত। দেবদূত হলেন তাঁরা যারা ন্যায়ের জন্য লড়াই করেন এবং তার জন্য প্রাণ দেন। যা কিছু ঘটেছে সব জেনেও যিনি না বোঝার ছল করেন—সত্য ধর্ম থেকে তিনি চ্যুত এবং যদি তিনি এই সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে কোন ত্রুটি খুঁজে নাই পান, তবে তাঁকে বলব মূর্খ এবং অন্ধ দুইই—দেবদূত কখনোই নয়।

আর, এই পৃথিবীতে দেবদূতের প্রয়োজনই বা কি। এই সব দেবদূতেরাই ঈশ্বর এবং তার আরাধনা সম্পর্কে নানা কাহিনী প্রচার করে সমাজের মন্দ দিকগুলিকে চিরদিন বাঁচিয়ে রেখেছেন। এ'রা বাধা না হয়ে দাঁড়ালে, মানুষ এতদিনে এই সমাজের অবসান ঘটাত,—যা হত এই ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে ঢের ভালো। না, মানুষের মধ্যে একজনকে প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে হবে। শিকারী পশুদের মাঝখানে বাস করে বাঁচতে গেলে অস্ত্র হাতে নিতেই হবে। ওদের নখের আঁচড়ে মৃত্যুবরণ করাটা কোন দেবদূত-সুলভ আচরণ নয়, বরং তা বোকামি।"

চিন্তার এই গতিময়তা এবং মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এই অন্তর্দৃষ্টির ফলেই প্রেমচন্দ আমাদের কাছে এত মূল্যবান, এবং উত্তরপুরুষের কাছে বহুদিন পর্যন্ত তাঁর প্রয়োজন থেকে যাবে।

মূল ইংরেজী প্রবন্ধ "The Contemporary Relevance of Premchand" থেকে অনূদিত।

ইতিহাস বোধের বিবর্তন ঃ
প্রেমাশ্রম থেকে গোদান

ডঃ পি সি· যোশী

ইতিহাস এবং সাহিত্যের ক্লাসিকগুলোর মধ্যে যে অনেক বিষয়ে মিল রয়েছে— সাহিত্যিক ও পণ্ডিত মহলে এই ধারণা আজকাল বেশ ব্যাপকতা লাভ করেছে। কার্লাইল, মার্ক্স, টয়েনবি, ই. এইচ. কার বা এরিক হব্‌স্‌বাম-এর ঐতিহাসিক লেখায় যদি কোন উচ্চ সাহিত্যিক উৎকর্ষতা থাকে, তাহলে বালজাক, ডিকেন্স, জোলা, টলস্টয় বা ম্যাক্সিম গর্কীর উপন্যাসগুলিতে তাঁদের সময়কার ইতিহাস কখনো কখনো শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক রচনাগুলির তুলনায় বেশি প্রতিফলিত হয়েছে। প্রথানুসারী ঐতিহাসিক কেবল ঘটনাসমূহের বর্ণনা করেন এবং ইতিহাসের কঙ্কালটিকে শুধু দাঁড় করিয়ে দেন। অপরপক্ষে ঔপন্যাসিক রক্ত মাংসের ইতিহাসকে আমাদের কাছে নিয়ে আসেন। ঔপন্যাসিকই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি-চরিত্রগুলি সৃজন করেন এবং এইভাবে ইতিহাসের মধ্যে মানবিক উপাদান নিয়ে এসে তাকে জীবন্ত করে তোলেন। মুন্সী প্রেমচন্দ একবার এই কথাটাই বলতে গিয়ে বলেছিলেন : "ইতিহাসে নাম ও তারিখ ছাড়া আর কোন কিছুই সত্যি নয়, আর উপন্যাসে নাম ও তারিখ ছাড়া আর কোন কিছুই মিথ্যে নয়।"

ইতিহাসবোধের সঙ্গে সাহিত্যিক অনুভূতির মিশ্রণ যদি কোন একজন ভারতীয় সাহিত্যিকের মধ্যেও ঘটে থাকে, তবে তিনি হলেন প্রেমচন্দ। সামন্ততন্ত্রের ক্ষয় আর বাণিজ্যিক সভ্যতার উন্মেষের পটভূমিকায় মহান্ মানবজীবন-নাট্যের গভীরে দৃষ্টিপাত করে বালজাক, জোলা এবং ডিকেন্স বিশ্ব-সাহিত্যে অমরতালাভ করেছিলেন, প্রেমচন্দ ভারতের গ্রামের ওপর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার প্রভাবে সৃষ্ট মানুষের ট্রাজেডীর জীবন্ত চিত্র অঙ্কন করে ঔপন্যাসিক রূপে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন।

ভারতের উপর ঔপনিবেশিক প্রভাব সম্পর্কে এক অতি তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনায়

কার্ল মার্ক্স ভারতের ট্রাজেডীর উৎস রূপে যে ঘটনাকে চিহ্নিত করেছিলেন, তা হল এই যে "ইংলণ্ড ভারতীয় সমাজের সমগ্র কাঠামোটিকে ভেঙে ফেলেছিল ; কিন্তু, তার পুনর্গঠনের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না।" মার্ক্সের মতে "ভারতবর্ষের হিন্দুরা এই যে তার পুরানো পৃথিবীকে হারাল, অথচ, পরিবর্তে নূতন কিছু পেল না, তারই ফলে তাদের বর্তমান দুর্দশার সঙ্গে যুক্ত হল এক বিশেষ ধরনের বেদনাবোধ এবং ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষ এইভাবে ঐতিহ্য ও তার সমগ্র অতীত ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল।" (কার্ল মার্ক্স, "ঔপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে") প্রেমচন্দের রচনায় ইতিহাসের এক বিশেষ পর্বে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে নূতন কিছু না পেয়েও পুরাতন পৃথিবীকে হারাবার ফলে উদ্ভূত এই এক বিশেষ ধরনের বেদনাবোধের সর্বোত্তম চিত্রণ দেখতে পাওয়া যায়। যুগ-পুরাতন গ্রামীণ ব্যবস্থা থেকে ভারতীয় কৃষকের উৎখাত হওয়ার করুণ ট্রাজেডী প্রেমচন্দ তাঁর অনুভবের যে তীব্রতা, গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা দিয়ে ধরে রেখেছেন, কোন ঐতিহাসিক রচনায় তার জুড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না। একদিকে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের তৎকালীন সমাজ সম্পর্কে তাঁর গভীর ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি এবং অপরদিকে তাঁর অনন্য সাহিত্যিক কল্পনার ফলে প্রেমচন্দের রচনায় কুশীলব হিসেবে ভারতীয় কৃষকের প্রবেশ ঘটল। ইতিহাস-চেতনা এবং সাহিত্য-বোধ—এই দুই বৈশিষ্ট্যের ফলে প্রেমচন্দের "গোদান"-এ তাঁর অমর বিয়োগান্ত চরিত্র হরি ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের কৃষকদের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠল। এই অবিস্মরণীয় চরিত্রে ভারতের কৃষকদের বেঁচে থাকার অদম্য বাসনা এবং অপরদিকে ঔপনিবেশিক সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে তার চূড়ান্ত নৈরাশ্যের মিশ্রণ ঘটেছে।

ঔপনিবেশিক কৃষকের দৈন্যের গভীরতাকে উপলব্ধি করতে গিয়ে অনিবার্যভাবেই প্রেমচন্দকে আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভদ্র সম্প্রদায় এবং ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্তের শ্রেণী-চরিত্রকে অতিক্রম করতে হয়েছিল। এই সমস্যাকে বাইরে থেকে তার সমগ্র জটিলতাসহ বুঝতে গিয়ে ঔপনিবেশিকতা এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিকতার সমর্থনে এবং বিরোধিতায় গড়ে ওঠা নানা প্রকার মতবাদগুলিকেও কাটিয়ে ওঠার প্রয়োজন হয়েছিল। প্রথমেই যে দৃষ্টিভঙ্গীটিকে কাটাতে হয়েছিল তা হল সেই অনৈতিহাসিক "গ্রামে ফিরে চলো"র মতবাদ, যা ভারতবর্ষের যুগ-পুরাতন গ্রাম্যসমাজের জয়গানে মুখর ছিল। ব্রিটিশের "শয়তানী শাসনে"র বিপরীতে প্রাচীন যুগের "রামরাজ্যে"র কথা বলে এই মতবাদ চাইছিল সেই "রামরাজ্যে" প্রত্যাবর্তন। অর্থসর্বস্ব অর্থ-নীতির জঠরে যে কুটিল "নয়া জমিদার শ্রেণী" গড়ে উঠেছিল তার পরিবর্তে সেই পুরানো আমলের "ভাল জমিদারে"র গুণকীর্তন করা হচ্ছিল। বলা হচ্ছিল, জমিদারেরা

যখন "পিতা মাতার" ন্যায় ছিলেন সেই দিন ফিরিয়ে আনিতে হবে। অপরদিকে আর একটি মতবাদও ছিল যাকে বলা যায় "কৃষক তন্ত্র"। কৃষকেরা যে ক্রমেই দ্রুত সর্বহারায় পরিণত হচ্ছিল এই সত্যকে উপেক্ষা করেই এই মতবাদ পুনরায় পুরানো দিনের মত কৃষক কেন্দ্রিক সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন তৈরী করছিল। এক কথায়, গ্রাম্য সমাজকে "ভাল বনাম মন্দ জমিদার", "গ্রাম বনাম শহর", "কৃষক বনাম শ্রমিক"এর তথাকথিত দ্বন্দ্বে চিহ্নিত করার চিন্তা ঔপনিবেশিক কৃষকের ক্রমাগত অবক্ষয় ও সর্বহারায় পরিণত হবার বেদনাকে সম্পূর্ণরূপে বুঝে ওঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। এই ধরনের চিন্তায় কৃষকের মুক্তি ছিল না। কেননা, তার দুর্দশার কারণ যে সমগ্র ঔপনিবেশিক এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা,—শুধুমাত্র "খারাপ জমিদার" নয়, এই সত্যকে চিহ্নিত না করে. শুধু গ্রামের মহত্ত্ব বা প্রজাপালক জমিদারের স্বপ্ন বা কৃষক সমাজ গড়ার কল্পনা প্রচার কৃষককে সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক মুক্তির আন্দোলনে এগিয়ে নিয়ে যেতে অসমর্থ ছিল।

মানুষের অবস্থাকে এইভাবে বাইরে থেকে দেখার চেয়েও আরও কঠিন কাজ ছিল তাকে ভেতর থেকে লক্ষ্য করা। লেখক যে কৃষকের বেদনা চিত্রিত করবেন, তার সঙ্গে তাঁর নিজের শ্রেণী ও জাতিগত ব্যবধান ছিল। তাঁর উচ্চ শ্রেণী ও জাতের দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিক প্রস্তুতির কারণে লেখক সমাজস্তরের সবচেয়ে নীচের তলার পদদলিত, অবহেলিত কৃষক সম্প্রদায়ের আবেগ, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার জগতে এক বহিরাগত আগন্তুক ছিলেন। ঔপনিবেশিক কৃষকের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক এবং আত্মিক সহযোগ কি পরিমাণে ছিল তারই ওপর সমাজবাস্তবতা সম্পর্কে তাঁর অনুভূতির প্রগাঢ়তা নির্ভর করত। এর জন্য প্রয়োজন ছিল তাঁর নিজের শ্রেণীর সঙ্কীর্ণ-সংস্কার ও ভাবাবেগ থেকে মুক্ত হওয়া। অতএব, প্রেমচন্দের পক্ষে ঔপনিবেশিক শাসনে বদ্ধ কৃষকদের অন্তস্তলের স্পন্দন অনুভব করা খুব সহজসাধ্য ছিল না। এ ছিল তাঁর জীবনব্যাপী যন্ত্রণাদায়ক এক অগ্নিপরীক্ষা। —যার পরিণত ফলশ্রুতি আমরা খুঁজে পাই তাঁর শেষ সৃষ্টি "গোদানে"।

প্রেমচন্দের এই উদাহরণ থেকে আমরা বুঝতে পারি, কেন মহান্ শিল্পীগণের রচনা সমাজবাস্তবের সুনিপুণ বর্ণনা মাত্র না হয়ে বাস্তবের সমালোচনা হয়ে ওঠে। এটা সুস্পষ্ট যে বাস্তবকে সমালোচকের দৃষ্টিতে না দেখলে প্রেমচন্দ ঔপনিবেশিক কৃষকের দুর্দশাকে চিত্রিত করতে অসমর্থ হতেন। উপনিবেশ এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় বিশেষ অধিকারভোগী উঁচু জাতের এবং শ্রেণীর মিথ্যে আত্মসম্মানকে প্রেমচন্দ যখন থেকে সমালোচনা শুরু করলেন, তখনই তাঁর সাহিত্য সমাজচেতনার উচ্চস্তরে পৌঁছাল।

প্রেমচন্দের ছোটগল্প এবং উপন্যাসগুলির কালজয়ী তাৎপর্যের কারণ শুধু এই নয় যে এগুলি ঔপনিবেশিক এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভারতবর্ষের সমাজ-দর্পণ। সাহিত্য রসের সঙ্গে বাস্তবের সমালোচনার দৃষ্টি মিশে প্রেমচন্দের পরিণত উপন্যাস-গুলিতে এক যুগান্তকারী বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে, যার গুণে তিনি ভারতীয় উপন্যাসে সমাজ-সমালোচকের এক পথপ্রদর্শকের মর্যাদা পেয়েছেন। উপন্যাসকে মাধ্যম করে ঔপনিবেশিকতা ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার এই সমালোচনার ফলে প্রেমচন্দ শুধু ভারতীয় সাহিত্যে নয়, ভারতের ইতিহাসেও যুগ-পুরুষরূপে চিহ্নিত হয়েছেন। অতএব, এতে আর আশ্চর্যের কি আছে যে তাঁর কালের সংগ্রামী দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবী যোদ্ধারা তাঁর উপন্যাস ও ছোট গল্পগুলিতে সমাজ-বাস্তবতাকে সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখার প্রেরণালাভ করতেন। এইভাবেই কথাশিল্প পরিণত হয়েছিল এমন এক শিল্প-মাধ্যমে যা শুধু সমাজ-বাস্তবকে আলোকিত বা হৃদয়ানুভূতিকে জাগ্রত করেনি, সমাজকে পরিবর্তিত করার চেতনাকেও উদ্বুদ্ধ করেছিল।

উপন্যাসের এই বিবর্তন লেখকের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সাহিত্য-অনুভূতির মধ্যে এক সৃষ্টিশীল দ্বন্দ্ব গড়ে তোলে। প্রেমচন্দের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই তাঁর প্রথম দিককার রচনা "কর্মভূমি" বা "প্রেমাশ্রমে" যে গান্ধীবাদী জীবনদর্শনের সাক্ষাৎ মেলে, তার থেকে পরিপূর্ণ মানসিক বিচ্ছেদেই তাঁর সমাজদৃষ্টির শক্তি পূর্ণতা লাভ করে। প্রথম দিককার উপন্যাসগুলিতে একদিকে তাঁর সাহিত্যবোধ এবং অন্যদিকে গান্ধীবাদের দাবীর মধ্যে একটা আপোষ রয়েছে। এই সব উপন্যাসের মূল চরিত্র কৃষক নয়, হৃদয়বান জমিদার, যিনি কৃষকের "অছি" হিসেবে, সহানুভূতিশীল সমাজের কর্তা হিসেবে বিরাজ করেন। কিন্তু "গোদানে" প্রেমচন্দ গান্ধীবাদী দর্শনের এই সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত। "গোদানে"র নায়ক একজন নিঃস্ব হয়ে যাওয়া কৃষক হরি, যার বিয়োগান্ত পরিণতি সমাজকে সংস্কার করার সমস্ত স্বপ্ন ও আশাকে ধূলিসাৎ করে দেয়। হরির চূড়ান্ত নৈরাশ্য সমাজের সীমাবদ্ধতা এবং তাকে সংস্কার করার সর্বপ্রকার পরিকল্পনার ব্যর্থতাকেই প্রকট করে তোলে।

দুই

একদিকে গ্রামীণ জীবন সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষজ্ঞান ও শক্তিশালী বাস্তববোধ এবং অন্যদিকে তাঁর তীক্ষ্ণ সাহিত্য-অনুভূতি নিয়ে প্রেমচন্দ তাঁর "গোদানে" গান্ধীজীর আদর্শবাদী চিন্তা ও সমাধান-সূত্রের সঙ্গে ভারতবর্ষের গ্রাম্য সমাজের নিষ্ঠুর এবং ভয়ংকর বাস্তবতার মধ্যেকার বিপুল ব্যবধানটিকে তুলে ধরেছেন।

"গোদানে" গান্ধী-যুগের প্রধান মূল্যবোধগুলির দিকে প্রেমচন্দের এই পিছন

ফেরার কথা বলতে গেলে তার আগে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের বিবর্তনের ওপর গান্ধীজীর ইতিবাচক প্রভাবের কথাও বলা আবশ্যক।

স্মরণ রাখা দরকার যে গান্ধীজী ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে যে যুগান্তর সৃষ্টি করেছিলেন, ছোট গল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রেমচন্দের ঐতিহাসিক অবদানও ঠিক তাই-ই। গান্ধীজী যদি ভারতীয় জনসাধারণের সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির নূতন উৎস হিসেবে গ্রামকে আবিষ্কার করে থাকেন, তাহলে প্রেমচন্দও সাহিত্যের ভাবনা, কল্পনা ও চরিত্রের নূতন উৎস হিসেবে গ্রামকে আবিষ্কার করে ভারতীয় সাহিত্যে রেনেসাঁর প্রবর্তন করেছিলেন। অতএব, এটা বিস্ময়কর নয় যে ঔপনিবেশিক গ্রাম ও তার কৃষক সম্বন্ধে গান্ধীজী ও প্রেমচন্দ একই প্রশ্ন, একই ভাবনা তুলে ধরেছেন, একজন রাজনীতির ক্ষেত্রে, আর একজন সাহিত্যে। গান্ধীজী তাঁর রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের কেন্দ্রে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী এবং ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের স্বার্থের দ্বন্দ্বের পরিবর্তে গ্রাম-শহরের দ্বন্দ্বকে স্থাপন করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে শহর ছিল উপনিবেশিক পরগাছাবৃত্তির ভিত্তি, এবং গ্রামই ছিল ভারতীয় জাতীয় বলিষ্ঠ অর্থনীতির ভিত্তি এবং উপনিবেশিকতা-বিরোধী সংগ্রামেরও কেন্দ্রস্থল। গান্ধীজীর এই দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মেও প্রভাব বিস্তার করেছিল।

প্রেমচন্দের বহু উৎকৃষ্ট উপন্যাস, যেমন রঙ্গভূমি, কর্মভূমি, প্রেমাশ্রম ও গোদান এবং তাঁর বহু ছোটগল্প গ্রাম-শহরের এই ব্যবধান এবং গ্রামের উৎপাদনকারী কৃষক ও শহরের পরগাছাদের মধ্যে বিরোধকে কেন্দ্র করে রচিত। তাঁর বহু সৃষ্টিশীল রচনায় তাঁর উৎকর্ষতা দেখা যায় মানুষের দারিদ্র্যের পাশাপাশি শহরভিত্তিক সেই সব উচ্চ শ্রেণীর মানুষদের ধনবৈভবের বর্ণনায়, যারা ফাটকাবাজী ব্যবসা, তেজারতির কারবার এবং জমিদারীর মাধ্যমে গ্রামকে শোষণ করে। গ্রামবাসীদের অজ্ঞতা ও পশ্চাৎপদতার সুযোগের ফলে ফেঁপে ওঠা সরকারী চাকুরে, জমিদারের কর্মচারী, ডাক্তার, উকীল, রাজনীতিক প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষিত মানুষের পরগাছাবৃত্তিরও বর্ণনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। গ্রামের মানুষের প্রতি শহরের ভদ্রলোকের নিষ্করুণ মনোভাব এবং লেখাপড়া জানা বাবুশ্রেণীর সঙ্গে খেটে খাওয়া মানুষের দুরন্ত ব্যবধানের মধ্যে তিনি গ্রাম শহরের বিভেদকে খুঁজে পেয়েছিলেন। গান্ধীজীর দৃষ্টি-ভঙ্গীর সঙ্গে এইখানে প্রেমচন্দের দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষ মিল দেখতে পাওয়া যায়।

কর্মভূমি এবং প্রেমাশ্রম উপন্যাসে প্রেমচন্দ এইভাবে জমিদারের শোষণকে ব্রিটিশ প্রবর্তিত অর্থ-সর্বস্ব অর্থনীতির ফলে উদ্ভূত গ্রাম-শহরের দ্বন্দ্বরূপে চিত্রিত করেন। কৃষকদের মধ্যেও যে একদিকে উদ্বৃত্তভোগী ধনী কৃষক এবং অন্যদিকে কোনক্রমে বেঁচে থাকা গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুরের শ্রেণী-ভেদ আছে, তা এইখানে

তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। তাছাড়া, গ্রাম্য ভূস্বামীদের চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে তিনি তাঁদের গান্ধীজীর মতই জনগণের দুরন্ত শোষক হিসেবে নয় বরং উপ-নিবেশিকদের শিকার হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। দেশীয় রাজন্য ও অভিজাতবর্গের অধঃপতন এবং ভূম্যধিকারী অভিজাতকুলের সঙ্গে কৃষিজীবী জনসাধারণের ব্যবধান গড়ে উঠবার জন্য ব্রিটিশরাজই দায়ী—গান্ধীজী এবং প্রেমচন্দ উভয়েই তা দেখাতে চেয়েছেন।

লক্ষণীয় যে এইসব উপন্যাসে প্রেমচন্দ প্রভাশঙ্করের মত পুরানো ধরনের উদার জমিদার এবং জ্ঞানশঙ্করের মত নূতন ধরনের লোভী ও ক্রুর জমিদারের মধ্যে প্রভেদ টেনেছেন। প্রথম জন যেখানে গ্রামীণ রীতি ও লোকনীতির পোষক, দ্বিতীয় জন সেখানে এইসব নীতিকে অর্থনৈতিক বাস্তববোধ ও স্বার্থবোধের বিরোধী বলে মনে করেন। উভয় উপন্যাসেই বণিক ইংরেজের স্বার্থরক্ষাকারী এই নূতন শ্রেণীর সঙ্গে জনগণের সামাজিক অধিকারের বিরোধ চিত্রিত হয়েছে। রঙ্গভূমিতে এই বিরোধ রূপ পায় গ্রামের গোচারণ ভূমিরূপে ব্যবহৃত সুরদাসের জমি খ্রীষ্টান ব্যবসায়ী জনের সিগারেট তৈরীর কারখানা স্থাপনের জন্য দখলের মধ্য দিয়ে। প্রেমাশ্রমেও গ্রামীণ গোচারণ ভূমি ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের ফলে বিরোধ ঘনীভূত হয় এবং একজন কৃষক কর্তৃক একজন সরকারী কর্মচারী খুনের মধ্যে তা তুঙ্গে ওঠে। কিন্তু, এইসব উপন্যাসে প্রেমচন্দ প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে এই সকল বিরোধের সমাধানের অযোগ্য বলে চিত্রিত করেননি। প্রেমাশ্রমে সমাধানের উপায় হিসেবে তিনি সৃষ্টি করেন প্রেমশঙ্কর নামক একজন সমাজ সংস্কারক এবং মায়াশঙ্কর নামক একজন আদর্শবাদী এবং প্রজাপালক জমিদারকে। ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের ব্যর্থতাও তিনি তুলে ধরেন ঘাউস খাঁ নামক একজন অত্যাচারী জমিদারের হত্যাকারী মনোহরের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটিয়ে। জমিদার এবং প্রজাপুঞ্জের মধ্যে সম্পর্ক হবে সহযোগিতার, সংগ্রামের নয়—গান্ধীজীর এই দৃষ্টিভঙ্গীই এইসব উপন্যাসে প্রেমচন্দ সমর্থন করেছেন।

তিন

এই বার আমরা 'গোদান' প্রসঙ্গে আসি—যেখানে তিনি এই সমাজব্যবস্থার মধ্যে ধনশালীর "হৃদয় পরিবর্তনের" দ্বারা কৃষক সমস্যার সমাধানের সমস্ত সম্ভাবনা বাতিল করে দেন। এখানে "আলোকপ্রাপ্ত" জমিদারের পরিবর্তে অঙ্কিত হয়েছে নব-চেতনার আলোকপ্রাপ্ত কৃষক। গোদান উপন্যাসের মূল চরিত্র হরি—যে পাঁচ বিঘা জমি চাষের মালিক, এবং যে অনবরতই খাজনা, সুদ, ট্যাক্স এবং বেগার খাটার চাপে কখনো কিষান আর কখনো মজুর। হরির একমাত্র স্বপ্ন এক টুকরো ছোট জমি এবং একটি গাভী। কৃষকের এই চিরন্তন স্বপ্নকে রূপায়িত করার জন্য হরি

সব রকমের আপোষ করে। কিন্তু তার কল্পলোক অনাগতই রয়ে যায়,—শুধু তাই নয়, শ্রেণী বিভক্ত সমাজের পাশব শক্তির আঘাতে তা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

প্রেমচন্দ আর গ্রামের "বাইরেকার শত্রু"—সরকারী চাকুরে, শহরবাসী জমিদার, ব্যবসায়ী -প্রভৃতিদের চিহ্নিত করেই সন্তুষ্ট নন। এই উপন্যাসে তিনি সমগ্র দুঃখ-দুর্দশার কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন গ্রাম্য পঞ্চায়েত, পুরোহিত, গ্রাম্য কুসীদজীবী, ধনী কৃষক, জমিদার ও সরকারের কর্মচারী প্রভৃতি "ঘরের শত্রুদের"। কৃষকের নিজের অদৃষ্টবাদ, আপোষী মনোভাব, ক্লীবতা এবং সংগ্রামে অনীহাকেও তিনি দায়ী করেছেন। আপোষ ও আত্মসমর্পণের ফলে হরির জীবনের ট্রাজেডী তার এই সর্বশেষ আর্তিতে ধ্বনিত হচ্ছে :

"হরি একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারছিল না। তার মনে হচ্ছিল সে যেন অসহ্য অপমানের অতল গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে। জীবনে ত্রিশ বৎসর কঠোর সংগ্রামের পর সে নিজেকে সম্পূর্ণ পরাজিত এবং নিষ্পেষিত বলে বোধ করল। তার মনে হচ্ছিল শহরের সিংহ দরজায় তাকে যেন দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে, এবং পথ দিয়ে যে যাচ্ছে সেই তার মুখে থুথু ছিটিয়ে যাচ্ছে। তার মনে হচ্ছিল, সে চীৎকার করে বলে, 'ভাইগণ, আমাকে দয়া কর। আমি জ্যৈষ্ঠের খরতাপকে গ্রাহ্য করি নাই, মাঘের বৃষ্টিকেও না। আমার এই শরীরকে যদি চিরে দেখ, দেখতে পাবে তা ক্ষতবিক্ষত ছিন্ন ভিন্ন। এর কি একদিনও বিশ্রাম মিলেছে? তার ওপরে এই অপমান। হায়, তুমি এখনও বেঁচে আছ। কাপুরুষ, হতভাগা!' হরির মনের গভীর বিশ্বাস যা তাকে এতদিন অন্ধ এবং তার বোধশক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে —তা আজ চিরকালের জন্য ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে গিয়েছিল।"

হরির মৃত্যু কৃষকের কল্পনালোকের এবং আত্মসমর্পণ ও আপোষ নীতির চূড়ান্ত পরাজয়ের প্রতীক। কৃষকের জীবন থেকে হরির পরিবারের উৎখাত এবং হরির পুত্র গোবরের জীবিকার জন্য শহর যাত্রা—এসবও কৃষক ও গ্রাম সম্পর্কে রঙীন মতবাদ সমূহের ব্যর্থতাই সূচনা করে—শেষপর্যন্ত পুরাতন সমাজের উপরে নগদ-নারায়ণই জয়লাভ করে। পুরাতন সমাজকে যে আর ভিতর থেকে সংস্কার করা যাবে না—পুরাতন পন্থী কৃষক হরির মৃত্যু তারই প্রতীক। প্রাচীন সমাজ মরবেই—এবং তাঁর চিতাভস্মের উপর গড়বে নূতন সমাজ—প্রেমচন্দের গোদানের এই হল বাণী।

চার

দরিদ্র কৃষকের ভাগ্যের ওপর ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে এরিক হব্সবম তার "The Age of the Revolution" গ্রন্থে লিখেছেন :

"পুরাতন সমাজে আর আশ্রয় খুঁজে না পেয়ে যে সব গরীব মানুষেরা বুর্জোয়া সমাজের পথে এসে দাঁড়িয়েছিল, তাদেব কাছে তিনটে সম্ভাবনাই খোলা ছিল। তারা বুর্জোয়া হবার চেষ্টা করতে পারত, তারা নিজেদের পিষে মেরে ফেলতে দিতে পারত, অথবা তার বিদ্রোহ্ করতে পারত।" (পৃ ২৪৫)

ঔপনিবেশিক কৃষকের কাছে অবশ্য শেষের ছুটি পথই খোলা ছিল, প্রথমটি নয়। গোদানেব হরি দ্বিতীয় সম্ভাবনারই করুণ পবিণতি। বাস্তববাদী প্রেমচন্দ— ঔপনিবেশিক কৃষকের ধূমায়িত "আদিম বিদ্রোহপ্রবণতাকে" চিত্রিত করতে ভোলেননি, কিন্তু তখনও তা বিদ্রোহে ফেটে পড়েনি। সাহিত্যিক বাস্তবতার বশবর্তী হয়েই প্রেমচন্দকে আশা এবং জয়োল্লাসের পবিবর্তে নৈরাশ্য ও পবাজয়ে তাঁর গোদান সমাপ্ত করতে হয়েছে।

মূল ইংরেজী প্রবন্ধ "Munshi Premchand and the Indian village" থেকে অনূদিত।

ধনিয়া-বুধিয়া-সুমনেরা

ডঃ বিশ্বনাথ ত্রিপাঠী

প্রেমচন্দের জগৎটা বিশাল। এর মধ্যে ছোট-বড় নানা সামগ্রী ও মানুষের বসবাস। আমরা এদের বিচ্ছিন্নভাবে দেখলেও আসলে এরা পরস্পরের মধ্যে একটা সম্পর্ক বজায় রেখেছে। এক কথায়, প্রেমচন্দের এই জগৎ এক বিশ্বাসযোগ্য দৃঢ় সূত্রে গাঁথা! ভারতীয় সমাজেই এর ভিত্তি। প্রেমচন্দ ছাড়া বোধহয় আর কোন হিন্দী বা উর্দু লেখক এত জীবন্ত, বাস্তব ও স্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি করেন নি। তাঁর লেখা পড়তে গিয়ে আমরা অবাক হয়ে ভাবি, তিনি সমসাময়িক জীবনকে কত কাছ থেকে দেখেছেন, চিনেছেন এবং গভীরভাবে একাত্ম হয়েছেন। তাঁর সৃষ্ট জগতের বস্তুনিচয় ও চরিত্ররা, মনে হয়, যেন খুব স্বাভাবিকভাবে আপন আপন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তার চারপাশের বাস্তব জগৎকেই চিত্রিত করেছে।

প্রেমচন্দের নারী চরিত্রগুলিও এই জগতেরই বাসিন্দে। তারা তাদের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব নিয়ে জীবনের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। প্রেমচন্দের নারী চরিত্রগুলিকে সম্পূর্ণভাবে চিনতে হলে তৎকালীন ভারতীয় সমাজে তাদের স্থান অনুধাবন করতে হবে। প্রেমচন্দের সময় ভারতীয় সমাজ মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো থেকে ধনতন্ত্রের দিকে আগুয়ান। জাতীয় জীবনে ধনতন্ত্রের আবির্ভাব যদিও কিছু আগে থেকেই ঘটেছিল, তথাপি সাম্রাজ্যবাদ বারে বারেই তার বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল এবং ফলে জাতীয় পুঁজিবাদ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পক্ষাবলম্বন করছিল। নানা সামাজিক স্তরভেদ শুধু ভারতেই কোন নতুন ঘটনা নয়, কিন্তু ভারতবর্ষে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার দ্বারা পরিপুষ্ট জাতিভেদ প্রথা নামক সামাজিক বৈষম্যের উত্তরাধিকার নববলে বলীয়ান হয়ে দ্রুত ও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের জন্য স্থায়ী হয়েছিল। আর তাই বোধহয় ভারতবর্ষের মত আর কোথাও এর নিষ্ঠুরতা এত প্রকট হয়নি। এই

জাতিভেদপ্রথা ও স্ত্রীজাতির পরাধীনতা—উভয়ের মধ্যে এক নিবিড় যোগসূত্র বর্তমান। ডঃ রামবিলাস শর্মা 'নিরালা'র কতকগুলি কবিতা প্রসঙ্গে আলোচনা করার সময় এই প্রশ্নটিকে বিশ্লেষণ করেছিলেন এইভাবে :

"আমাদের সমাজে 'দ্বিজ' ও 'শূদ্রের' মধ্যে যেমন পার্থক্য দেখা যায়, তেমনি নারী এবং পুরুষের মধ্যে উঁচু-নিচুর পার্থক্য প্রকাশ পায়। একদিকে যেমন পুরোনো উপজাতীয় সম্পর্ক ভেঙে নতুন শ্রম-সম্পর্ক জাতিভেদ প্রথার জন্ম দিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি এই শ্রম সম্পর্ক নারী-পুরুষের 'উঁচু নিচু'র ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছে। মেয়েরা ঘরের মধ্যে আর পুরুষেরা ঘরের বাইরে কাজ করে। পুরুষেরা সম্পত্তির রক্ষক, তারা যুদ্ধে যায়, 'শাস্ত্র' রচনা করে, ব্যবসা করে আর সেই তুলনায় মেয়েরা শুধু গৃহস্থালির মত অতি সাধারণ কাজ করে। কিন্তু 'শূদ্র' নারীরা তাদের পুরুষদের পাশাপাশি সমান সক্রিয় এবং ব্রাহ্মণীদের তুলনায় এইসব নারীদের অনেক বেশী শক্তি সামর্থ্য। সমাজে জাতিভেদপ্রথা যত বেশি বিস্তৃত হচ্ছে নারীদের দাসত্বও তত বেশি প্রকট হচ্ছে। যেখানে সামন্ততান্ত্রিক প্রথা যত বেশি প্রাচীন ও রক্ষণশীল সেখানে জাতিভেদপ্রথার মত এই নারী পুরুষের পার্থক্যও তত বেশি প্রকট।"
(নিরালা কি সাহিত্য সাধনা : খণ্ড-২, পৃ: ৩৫)

মধ্যযুগের সাহিত্যে নারীদের স্থান দেওয়া হয়েছে সবচেয়ে নিচে। সভাকবিদের বর্ণনায় নারীরা শুধুমাত্র "লোভনীয় মাংসপিণ্ড" এবং "ছলনাময়ী"। সাধক কবিরা অবশ্য নারীদের আর একটু সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁরা পতিভক্ত স্ত্রীদের তাঁদের সাধনার আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতেন। আর "ছলনাময়ীরা" তাঁদের কাছে 'মায়া'র প্রতিভূ হিসাবে গৃহীত হতো। যাঁরা কবীর বা তুলসীদাসকে নারীনিন্দুক বলে জানেন তাঁরা বোধহয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটটা বিচার করেন না। আসলে এইসব সাধক কবিরা নারীদের 'শয়তানী' বা 'মোহিনী' বিশেষণের বিরোধিতাই করেছেন। (যা, প্রকৃতপক্ষে একটি সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী।) অপরের আশ্রিতা নারীর যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করে তুলসীদাস আর্তকণ্ঠে বলেছেন :

"ঈশ্বর কেন নারীকে সৃষ্টি করলেন ?
অধীন ব্যক্তির জীবনে এমন কি স্বপ্নেও কোন আনন্দ নেই।"

কিন্তু এইসব কবিরা শুধুমাত্র সহজাত আবেগে নারীদের এই পরাধীনতার বেদনাকে উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁরা এইসব অন্যায়ের পশ্চাৎপটে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলো খোঁজেন নি। একজন মানুষ যখন সচেতন হয় তখন তার উপলব্ধির সীমানা যেমন বেড়ে যায়, তার সহানুভূতিও স্পষ্ট হয়। সাধক কবিদের মত প্রেমচন্দও নারীদের প্রতি এই অন্যায়কে উপলব্ধি করেছিলেন, কিন্তু তাঁর উপলব্ধি

ছিল গভীরতর। তিনি এর পেছনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলো খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি নারীদের পরাধীনতার সঙ্গে সামাজিক অর্থনৈতিক স্তরের সম্পর্ককে যুক্ত করেছিলেন।

সুফি কবি মালিক মহম্মদ জ্যায়সি তাঁর 'পদ্মাবৎ' কবিতায় কনের শ্বশুরবাড়ি যাত্রার দৃশ্যে কনের সখীদের নিরানন্দ অবস্থা বর্ণনা করেছেন। সেখানে আমরা জানলাম যে রাজা এই সখীদের গমের বীজের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। তাই তারা রাজার দাসী। সাধক কবিদের বর্ণনাতেও আমরা বহুবার দারিদ্র্যের চাপে বাবা তার ছেলে বা মেয়েকে বিক্রি করে দেয়—এ দৃশ্য পেয়েছি। এই সব পিতাদের নির্দয়, হৃদয়হীন, হিংস্র, বদাকার ইত্যাদি বিশেষণও জুটেছে। আধুনিক সাহিত্যে, একমাত্র প্রেমচন্দের 'গোদান'এ আমরা ঠিক এরকম একটা ঘটনা পেয়েছি, যেখানে টাকার বিনিময়ে শিশুকে বেচে দেওয়া হচ্ছে। হরি তার দ্বিতীয় কন্যাকে দান করছে এক প্রৌঢ়ের হাতে। প্রেমচন্দের কলমে হরির এই দুঃখ মর্মান্তিক। হরি ও তার কন্যার দুঃখের, মূল হিসেবে দেখান হয়েছে দারিদ্র্যকে :

"টাকা নিতে গিয়ে হরির হাত কাঁপছে। সে মাথা তুলতে পারছে না। তার ঠোঁটের কোন শব্দ নেই। মনে হল সে যেন কোন অতলস্পর্শী গহ্বরে পড়ে গেছে। লজ্জা ও ঘৃণার সেই গহ্বরে পড়ে সে নেমে যাচ্ছে নিচে আরও নিচে। দীর্ঘ ত্রিশ বছর জীবন কাটিয়ে এসে আজ প্রথম সে হেরে গেল। তার এই হেরে যাওয়াটা কি মর্মান্তিক! যেন তাকে শহরের সদর দরজায় বেঁধে রাখা হয়েছে, আর আসা যাওয়ার পথে যে যার ইচ্ছেমত কিল চড় মেরে তার মুখে থুতু ছিটিয়ে যাচ্ছে। এখন সে শুধু চিৎকার করে বলতে পারে, 'ভাই, আমি তোদের করুণার পাত্র রে—'।"

প্রেমচন্দ হরির মেয়ে রূপার আর্তনাদ দীর্ঘ করেননি। তিনি শুধু লিখেছেন—"রূপা কেঁদে কেটে চলে গেলো।" কিন্তু তার দুঃখ পাঠকের হৃদয়ে করাঘাত করে। সে তো শুধু তার দুঃখ বর্ণনার জন্যে লেখা কটা শব্দের জন্য নয়। একটা উপন্যাসে আবেগের পরিমাণ নির্ভর করে তার প্রাসঙ্গিকতার ওপর। এই সেই রূপা যে উপন্যাসের শুরুতে তার বোন সোনার সঙ্গে তুচ্ছ কারণে ঝগড়া করছে। তার সরল খেলা-ঘরের পাশে এই অনুচ্চারিত দুঃখ যেন আরও মর্মভেদী হয়ে ওঠে।

ঠিক একইভাবে প্রেমচন্দের ছোটগল্প 'কফন'এ একটি স্ত্রীলোকের প্রসববেদনা বর্ণিত হয়েছে। যখন সে প্রসব বেদনায় কাতরাচ্ছে, ঘিসু আর মাধব নিরর্থক বকবক করে কে কাকে ঠকিয়ে বেশি আলুপোড়ার ভাগ হাতাবে, তার ধান্ধা করছে। বাপ ঐ ধান্ধায় তার বেটাকে স্ত্রীর কাছে পাঠাবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। আমরা ঘিসু আর মাধবের এই অমানুষিক ব্যবহারে কি ক্ষুব্ধ হবো?

তারা কি এই গল্পের খলচরিত্র ? না। এটা তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনিবার্য পরিণতি—অমানুষিক পরিবেশের সামনে মাধব আর ঘিসুকে প্রায় নিষ্পাপ দেখায়। তাদের অসহায় অবস্থার সঙ্গে মাধবের বৌয়ের প্রসব বেদনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বুধিয়া (মাধবের স্ত্রী) কাতরাতে কাতরাতে ঠাণ্ডা মেরে গেলো। তার মৃত্যু বাপ-বেটার পেট পুরে খাওয়ার স্বপ্ন নেশা করে মৌতাত করার সাধ—পূর্ণ করলো, কিন্তু তবু বুধিয়ার কাতরানি সারা গল্পে শোনা যায়। অনুভূতিপ্রবণ পাঠক শুনতে পায়—এটা প্রসব বেদনার সঙ্গে দারিদ্র্য যন্ত্রণার সম্মিলিত আর্তনাদ। আর তাই-ই ক্রমশঃ প্রগাঢ় আর পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে সারা গল্পে।

প্রেমচন্দ নারী জীবনের প্রায় সমস্ত দিকই অঙ্কন করেছেন। "সারঙ্গ সদাবৃক্ষব" কথা তিনি নিটোল একটি ভালবাসার গল্পচ্ছলে বলেছেন। "বড়ে ঘর কী বেটি" গল্পে জনপ্রিয়তার সঙ্গে উচ্চ আদর্শের সংঘাত ফুটিয়ে তুলেছেন। জীবনে চলার পথে আপনার দেখা সব ধরনের নারী চরিত্র আপনি প্রেমচন্দ-রচনায় খুঁজে পাবেন। তারা উচ্চ, মধ্য বা নিম্নশ্রেণীর ; কিশোরী, যুবতী, পৌঢ়া, বৃদ্ধা, হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান, উপজাতীয় ; সধবা, বিধবা, দুশ্চরিত্রা, সতীসাধ্বী, দেশপ্রেমিকা, চঞ্চলা প্রেমিকা, কোমল, কঠোর—সব ধরনের। সেখানে শিক্ষিত মহিলার পাশাপাশি আছে আর এক ধরনের নারী যারা বাইরে প্রজাপতি কিন্তু অন্তরে মৌমাছি। সেখানে সেই মেয়েটিকেও খুঁজে পাবেন যে গান্ধী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তার স্বামীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উৎসাহ দিচ্ছে। এই সব নারীরা সবাই-ই কিন্তু 'প্রাণবন্ত'। দ্বন্দ্বের সংঘাতে তাদের চরিত্রের বিকাশ। প্রেমচন্দের সৃষ্ট চরিত্রগুলি প্রাতিনিধিত্বমূলক, কারণ তারা আকাশ থেকে আসেনি। অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক চিত্রিত হয়েছে। এই সম্পর্ক পরিবেশের চাপে পরিবর্তিত হয়, চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তার বিবর্তন প্রেমচন্দ বর্ণনা করেন। ক্রমে চরিত্রগুলি সুস্পষ্ট রূপ পায় এবং প্রতিনিধিত্বমূলক হয়ে ওঠে।

প্রেমচন্দকে সমাজ সংস্কারক বলা হয়। সন্দেহাতীতভাবে তিনি তা ছিলেন। তর্কের খাতিরে তিনি একবার বলেছিলেন, 'যে রচনা কোন ভাবনাকে প্রচারিত করে না, তাকে আমি সাহিত্য বলে মনে করি না।' কিন্তু তার মানে এই নয় যে সমাজ সংস্কারক হওয়ার জন্য তিনি শিল্পকে বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁর শিল্প ভাবনা আমাদের উন্নততর সমাজ গঠনে প্রেরণা দেয়। তাঁর লেখনী সমাজের মন্দ দিকগুলো তুলে ধরে। আর এই অর্থেই প্রেমচন্দ 'সমাজ-সংস্কারক।' তাঁর সাহিত্য অনবদ্য, অক্ষরের মাধ্যমে তিনি এক আবেগ সমৃদ্ধ জীবনের চলমান ছবি আমাদের উপহার দিয়েছেন। এ হলো সেই সমাজের ছবি যাকে রচনাকার

তাঁর অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, বোধশক্তি এবং দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে নূতন করে সৃজন করেন। বিধবা ও বারবণিতাদের দুঃখময় জীবন তাঁর অন্তরে আঘাত হেনেছে এবং তিনি সেই জীবনের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। এই আবেগাশ্রিত প্রাণবন্ত বর্ণনায় পাঠকের অন্তর তাদের জন্য সহৃদয় হয়ে ওঠে, আর তা যদি খুব সীমাযিতভাবেও পাঠককে সক্রিয় করে তোলে তাহলে তাকে আমরা নিশ্চয়ই 'সংস্কার' শিরোপা দেবো। কিন্তু এই সংস্কার শিল্পের দুর্বলতা জনিত নয়, বরং তার শ ক্তরই পরিচায়ক। একমাত্র সফল সৃষ্টিধর্মী শিল্পাই, একজন শিল্পী থেকেও, একজন 'সংস্কারক' হতে পারেন।

প্রেমচন্দের নারী জীবনগুলির বর্ণনায় 'সেবা সদন' একটি বিশিষ্ট স্থান পায়। এটি তাঁর প্রথম দিককার একটি রচনা। যদিও 'গোদান' তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস তবু 'সেবাসদন'-এর নায়িকা সুমন-এর মত এত উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত নারী চরিত্র সেখানেও নেই। সমগ্র হিন্দী সাহিত্যে—সে আদর্শবাদী বা বাস্তববাদী যে রচনাই হোক না কেন,—ভারতীয় সমাজের শ্রেষ্ঠ নারী প্রতিনিধি কিন্তু সুমন। অন্যান্য ভারতীয় ভাষার উপন্যাস ও গল্প সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। তবু সুমনই হিন্দী উপন্যাসে প্রথম নারী চরিত্র যে তার সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে এবং তার শৃঙ্খলিত জীবন থেকে মুক্তি চেয়েছে। হিন্দী উপন্যাসের সমগ্র জগতে এর চেয়ে আত্মসম্মানবোধ-সম্পন্ন কোন নারী খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, অসম্ভবও বলা যায়। এই ধরনের কেবল আর একটি নারী চরিত্র আমার মনে আছে—সে "স্বপ্ন"-এর অমর সৃষ্টি 'পদ্ম অরিদ' এর নায়িকা সাংগ। সে তার অগ্নি পরীক্ষার সময় রামকে বলছে—'এইসব ধার্মিক পুরুষগুলো কী নিষ্ঠুর, এরা মৃত্যুশয্যায় শায়িত স্ত্রীকেও বিশ্বাস করে না!'

বেশ্যাবৃত্তি নয়, সেবা সদনের মূল সমস্যা নারীজাতির অধীনতা। এই উপন্যাস আমাদের দেখিয়ে দেয় কেমন করে সচ্ছল উচুঁঘরের মেয়ে ধীরে ধীরে গণিকা হয়ে যায়। গণিকাবৃত্তি নারীর অন্যান্য নানা সমস্যার মধ্যে একটি। সুমন চরিত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নারীর বিভিন্ন সমস্যার প্রকাশ পায়, সেইসঙ্গে নানা সামাজিক সমস্যাও। প্রেমচন্দের সৃষ্টিকামী মন বুঝেছিল, ভারতীয় সমাজের মূল ভিত্তি তার পরিবারে আর সেই পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে—নারী। সুতরাং নারীকে কেন্দ্রে রেখে যে কোন সামাজিক সমস্যা চিত্রিত করতে গেলে তা সমাজের অন্যান্য অংশকে অনিবার্যভাবে স্পর্শ করবেই।

সুমন শিক্ষিতা এবং আকর্ষণীয়া। তার ঠিক মত বিয়ে হয়নি, কারণ তার জন্য বরপণ জোটেনি। দারোগা কৃপাচন্দ্র একজন আদর্শবাদী। পুলিশ বিভাগে কাজ

করলেও সে ঘুষ নেয় না। কিন্তু যখন সে যৌতুক প্রথা নামক বাস্তবের মুখোমুখি হয়, তখন তার সমস্ত আদর্শবাদ টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

'সেবাসদন' প্রমাণ করে দেয় কেমন করে ভালো ভালো কথার আড়ালে লোকেরা শুধুমাত্র 'ভালো যৌতুক বা পণ না পাবার জন্য বিয়ে করতে অস্বীকার করতে পারে। এইসব বৈপরীত্যকে প্রকাশ করাই প্রেমচন্দের প্রধান কৃতিত্ব। মানুষ আদর্শবাদের মুখোস পরে বড় বড় আদর্শের বুলি আওড়ায়, কিন্তু কথায় আদর্শের স্থান যত উচুঁতে, কাজের বেলায় তত নিচুতে। এতে এমন নাটক সৃষ্টি হয় যা রূপ পায় তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে। প্রেমচন্দের মুন্সীয়ানার আরও পরিচয় মেলে অন্যদিকে। তিনি কোন ভাল বা মন্দ চরিত্রের পক্ষ নেন না। যার ফলে, কোন চরিত্রটি প্রেমচন্দের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করছে তা নির্ধারণে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। প্রেমচন্দ প্রগতিপন্থী, কিন্তু তিনি তাঁর প্রগতিপন্থা আরোপ করেননি। তিনি সহজ ভাষায়, অল্প কথায় সবকিছু বলেছেন কিন্তু এই স্বল্পকথার প্রকাশ ক্ষমতা অনেক বেশি। সেইজন্যই গল্পের কাঠামো বিন্যাসে ও চরিত্র বিকাশের পথে তারা কখনও অবাস্তব হয়ে ওঠেনি। একজন সাব-ইনস্পেক্টরের কন্যা বার-বণিতা হবে—আপাতদৃষ্টিতে এটা অভাবনীয়। কিন্তু যদি পুলিশ ইনস্পেক্টরটি চালাক না হন, যদি তিনি ঘুষ নিতে অভ্যস্ত না হন, পরে তা নিতে গিয়ে ধরা পড়ে জেলে চালান যান, তার মেয়ের সঙ্গে যদি এমন একটি আধ বুড়োর বিয়ে হয় যার মন সব সময় সন্দিগ্ধ এবং মেয়েটি নিজের সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল, তাহলে তার বারবণিতা হওয়া বোধহয় অসম্ভব ঠেকে না। প্রেমচন্দের কৃতিত্ব এখানেই তিনি পারিপার্শ্বিক চাপের মধ্যে চরিত্রের বিকাশ ঘটান, অন্তর ও বহির্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত তাঁর চরিত্রেরা নিজেদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপে আপন পরিচয় গড়ে তোলে।

বিয়ের পর সুমন নিজেকে ভাগ্যের হাতে সঁপে দিল। কিন্তু একদিন সে দেখল একজন গণিকা কেমন করে বেঁচে থাকে এবং তার মনে প্রশ্ন জাগে—'যারা নিজের স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকায় না তারা কেন একটা গণিকার জন্য পাগল হয়?'

সাধারণ মানুষ বলবে যে একজন গণিকার আকর্ষণ অনেক বেশী। কিন্তু সুমন তো একজন গণিকার চেয়ে কম আকর্ষণীয় নয়। তাহলে? যে গোপন রহস্যের উত্তর অনেক সমাজবিজ্ঞানী ও মনস্তাত্ত্বিকের জানা নেই, সুমন তা খুঁজে পেলো: 'অবশেষে সে সিদ্ধান্তে এলো যে গণিকারা স্বাধীন, আর ওর পায়ে আছে শৃঙ্খল।'

সুমন তার অধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। সংগ্রামের পথে অনেক বাধা।

তবু সে পিছু হটে না। একমাত্র তুলসীদাসই নারীজাতির দাসত্বের যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন আর একমাত্র প্রেমচন্দের নায়িকাই তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। এর কারণ, সামাজিক, ঐতিহাসিক নানা কারণের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। বহু নারী যা করতে ভয় পায়, সুমন তাই-ই করে:

"সেরকম নারী কজন আছে, যারা তাদের স্বামীর হাতে অকারণে প্রহৃত হয়নি? কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে, সমাজে ধীর লয়ে একটা পরিবর্তন আসছে। সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্রের জোয়ালের নিচে সাধারণ মানুষ অধীর হয়ে উঠেছে এবং সমাজের অবহেলিত নারীর মুক্তির জন্যে আগ্রহী হচ্ছে। প্রেমচন্দই প্রথম এই পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন এবং তাকে স্বাগত জানিয়ে উৎসাহিত করলেন।" ("প্রেমচন্দ আউর উনকা যুগ"—ডঃ রাম বিলাস শর্মা)

প্রেমচন্দ দেখিয়েছেন যে বেশ্যাবৃত্তি হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেই প্রচলিত। সুমন ও জোহরা দুজনেই গণিকা।

সুমন নিজেকে মুক্ত করার প্রতিজ্ঞা করে এবং এই পরিবেশে একমাত্র গণিকা হলেই তা সম্ভব। লক্ষ্য করার বিষয়, সুমন টাকা রোজগারের জন্য গণিকা হয়নি, সে শুধু মুক্তি চেয়েছিল। গণিকা হওয়ার পর তাই সে আপন বৃত্তির থেকে সমাজ সেবিকা হবার জন্য বেশি উদগ্রীব, যা রাজদ্রোহিতার থেকেও বেশি কিছু। যদিও সে গণিকা তবু সে পাপিষ্ঠা নয়। তার মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা ও নিজের সম্পর্কে শ্রদ্ধা অক্ষত। সাধারণতঃ একটা পাপবোধ নিয়েই মানুষ সমাজ সেবা করতে আসে, কিন্তু সুমন তা নয়। উপন্যাসের কোথাও আমরা সুমনের মধ্যে কোন লজ্জার চিহ্ন খুঁজে পাইনি। সে তার যন্ত্রণাকে নিজের মনে লুকিয়ে রেখেছে, আর যেহেতু তার ব্যথাটা খাঁটি এবং নিজে তার জন্য দায়ী নয়—দায়ী নির্দয় সমাজব্যবস্থা—পাপ বা অন্যায় বোধের বদলে তার মধ্যে সব সময় তাই তীব্র একটা ক্ষোভের প্রকাশ। সে যা করেছে তার জন্য অনুতপ্ত নয়। যখন পদম সিং দুঃখ করে বলছে যে সে না তাড়িয়ে দিলে সুমন গণিকা হোতো না—সুমন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, 'কেন এর জন্য তুমি লজ্জা পাচ্ছো? তুমি আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আমার উপকারই করেছো, তুমি আমার জীবনের সংস্কার করেছো।'

সুমনের গলায় ক্ষোভ আর বিদ্রোহের কথা শুনতে শুনতে আমাদের কবীরের কথা মনে পড়ে যায়। সুমন গণিকা বলে তার বোনের কাপুরুষ প্রেমিক তাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। সুমন বলছে, 'অন্ধকারে তুমি নোংরা-পচা খাবার খেতে পারো আর দিনের আলোয় যথারীতি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারো না—' ঠিক এমনিভাবে হিন্দু মুসলমান সমাজকে ভর্ৎসনা করেছেন কবীর:

"এইসব বকধার্মিকগুলো বাইরে জাতিভেদ মানে, নীচু জাতের কাউকে ছোঁয় না। কিন্তু এরাই আবার অন্ধকারের আড়ালে একটা বেশ্যাব পায়ে গড়াগড়ি খায়।"

এই স্বল্প পরিসরে প্রেমচন্দের সব নারী-চরিত্রের আলোচনা করা অসম্ভব। তাঁর প্রত্যেকটি নারী চরিত্রেরা পৃথক সত্তা। আমাদের সমাজে তাদের এক একজনের আলাদা আলাদা পরিচয়। আপনি 'বড়ে ঘর কী বেটী' কে ভুলতে পারবেন? কর্মভূমির মুন্নী, মালতী—এমন কি সেই অরণ্যচারী মেয়েটিকে যাকে গোদানে খুব অল্পক্ষণের জন্য মেহতার পাশে দেখা গিয়েছিল? প্রত্যেকটি চরিত্র সূক্ষ্ম কলমের আঁচড়ে জীবন্ত।

প্রেমচন্দের নারীরা সেই নিঃসঙ্গ নায়িকা নয়, যারা হতাশাতেই ফুরিয়ে যায়। এরা দুঃখ আর আনন্দ নিয়ে বেঁচে থাকে আর তার প্রত্যক্ষ ফল ভোগ করে। এরা জীবনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। তাই এরা সত্যবাদী ও স্পষ্ট বক্তা। এদের কথার সঙ্গে মুনি ঋষিদের কথারও তুলনা হয় না। ব্রাহ্মণ দাতাদীন ধনিয়ার দারিদ্র্য নিয়ে কটাক্ষ করলে ধনিয়া বলে—'তুমি ভিক্ষে করতে পারো। কারণ তোমার জাতের লোকেরা অপরের ওপর নির্ভর করেই বেঁচে থাকে, কিন্তু আমরা মজুর। খাটলেই পেটের ভাত জুটবে।'

এটা কবীরের ভাষা নয়?

শুধু এক ভূমিহীন চাষীর বৌয়ের পক্ষেই বোধহয় কবীরের ভাষায় কথা বলা সম্ভব।

মূল ইংরেজী প্রবন্ধ 'Women Characters of Pren chand' থেকে অনুবাদ : রোমন দত্ত।

যে উত্তরাধিকার পথ দেখায়

ডঃ কামার রাইস

প্রেমচন্দ শুধু একজন বহুমুখী লেখক মাত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন সমাজতান্ত্রিক, আজন্ম বিদ্রোহী, দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং ভারতীয় সাহিত্যে প্রগতি-আন্দোলনের অগ্রদূত। এই শতকের দ্বিতীয় দশকে হিন্দী এবং উর্দু সাহিত্যে তিনি বাস্তবতার এক নতুন ঢেউ এনেছিলেন এবং এই সব বাস্তববাদী রচনায় এক নব দিগন্তের সূচনা করেছিলেন।

গোড়া থেকেই তাঁর রচনায় দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতাপ্রেম এত অফুরন্ত ছিল যে তাঁর প্রথম ছোটগল্প সংকলন 'সোজ-এ-ওয়াতন' তাঁর উপস্থিতিতেই ১৯০৮ সালে একজন ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে নিষিদ্ধ এবং অগ্নিদগ্ধ হয়েছিলেন। শুধু তাই নয় তাঁর উপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সরকারের অনুমতি ছাড়া ভবিষ্যতে তিনি এক লাইনও প্রকাশ করতে পারবেন না।

এই ঘটনার পর ভারতবর্ষে ব্রিটিশ উপনিবেশিক সরকারের দ্বারা নির্দেশিত না হয়ে স্বাধীনভাবে লেখার জন্য তিনি 'প্রেমচন্দ' ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন। পরবর্তীকালে এই ঘটনার উল্লেখ করে, তিনি লিখেছেন যে তিনি সন্দেহাতীতভাবে বুঝেছিলেন— শুধু রাজনৈতিক নেতারাই দেশের মানুষের ভাগ্য ফেরাতে পারেন না, লেখক এবং শিল্পীদেরও এর পাশাপাশি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে ; যদি তা না হতো তাহলে ব্রিটিশ সরকারের আমলারা তাঁর রচনাকে কখনই নিষিদ্ধ এবং অগ্নিদগ্ধ করতো না। আসলে প্রেমচন্দের এই অটল বিশ্বাসই তাঁর সাহিত্যিক উত্তরাধিকারের মূল কথা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে জনগণের আবেগ, মূল্যবোধ এবং জীবনযাপনের পদ্ধতি পরিবর্তনে এবং নব রূপায়ণে লেখকদের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে যা পালন করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে প্রেমচন্দ এই বিশ্বাসকে একজন লেখকের চরম আদর্শ বলে মনে করতেন। তিনি কখনো মনোরঞ্জনের জন্য লেখেননি। যখন

তাঁর কিছু বলার থাকত বা কোন কিছু শোনবার প্রয়োজন হতো অথবা যখন তিনি তাঁর অভিজ্ঞতাকে পাঠকদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া উচিত বলে মনে করতেন কেবল তখনই তিনি লিখতেন। সারা জীবন প্রেমচন্দ এই উচ্চাদর্শকে অনুসরণ করেছেন।

সময়ক্রম অনুসারে পড়লে দেখা যাবে প্রেমচন্দের রচনাবলী ১৯০৫ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বেদনাদায়ক সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনার এক পরিষ্কার ছবি তুলে ধরে এবং তার থেকেই তাঁর মনের উপর এইসব ঘটনার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।

প্রেমচন্দ এইসব ঘটনার নীরব দর্শক ছিলেন না, বরং এইসব ঘটনায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি সরকারী চাকুরী (স্কুল পরিদর্শক) ত্যাগ করে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁর স্ত্রী শিবরাণী কারারুদ্ধা হন। এভাবে দেখতে গেলে এসময়ের রাজনৈতিক ও অন্যান্য আন্দোলন নিয়ে প্রেমচন্দের সমস্ত রচনা আত্মজীবনীমূলক। এইসব রচনা দেশের নানা মর্মান্তিক ঘটনায় তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধ এবং বিদেশী শোষণের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার জন্য তাঁর দেশের সংগ্রামী মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করে। অনুভূতির এই গভীরতা ও আবেগের তীব্রতার কারণেই তাঁর রচনা শুধু তাঁর সমসাময়িকদের কাছে নয়, পরবর্তী পুরুষের কাছেও সবলতা ও উৎসাহের উৎস হয়ে রয়েছে। এমনকি, এখনও তাঁর রচনায় লক্ষ লক্ষ হৃদয়ের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। মানুষের সঙ্গে এই একাত্মতাই প্রেমচন্দের সাহিত্যের সবচেয়ে পবিত্র উত্তরাধিকার।

আমার মনে হয়, শ্রমজীবী মানুষকে চেনার অসাধারণ ক্ষমতাই প্রেমচন্দের রচনাকে পাঠকের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস করে তুলেছে। এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে এই ঘটনা থেকেই যে আজকের দিনের লেখকরা এই একাত্মতার অভাবেই পাঠককে প্রেমচন্দের মত উৎসাহিত করতে সমর্থ হয় না।

প্রেমচন্দের আবির্ভাবের দিনগুলিতে হিন্দী এবং উর্দু উপন্যাস শহুরে আভিজাত ও মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র অঙ্কন করত। সেইজন্য ঐ সব উপন্যাসে আমাদের গ্রাম্য জীবনের বিপুল বিস্তারী দৃশ্য এবং আমাদের কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য অনুপস্থিত ছিল। প্রেমচন্দের ছোটগল্প এবং উপন্যাসগুলিই প্রথম কৃষক ও শ্রমিকের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরল। এই ভাবে উর্দু ও হিন্দী উপন্যাস ভারতীয় জনজীবনের এক বিশ্বস্ত দর্পণ হয়ে উঠল। এটা নিঃসন্দেহে একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

ভারতীয় কৃষকদের আনন্দ এবং দুঃখ, তাদের আশঙ্কা এবং হতাশার প্রতিচিত্র অঙ্কনে প্রেমচন্দ সফল হয়ে ছিলেন, যা তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গীকেও প্রসারিত করেছিল। ভারতীয় শ্রমিক-কৃষকদের শোচনীয় অবস্থা বর্ণনার মধ্য দিয়ে তিনি পৃথিবীর বিশেষত উপনিবেশিক দেশগুলির লক্ষ লক্ষ শ্রমিকদের দুর্ভাগ্য অনুভব করেছিলেন। এইভাবে তাঁর আন্তর্জাতিক বহিদৃষ্টির জন্ম। পরবর্তীকালের বহু রচনায় তাঁর এই অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রেমচন্দ যখন লেখা শুরু করেন সেই সময় দেশে সংস্কার আন্দোলন তীব্র বেগে এগিয়ে চলেছে। এইসব আন্দোলন তাঁকে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু তিনি তার সঙ্গে ভেসে যেতে অস্বীকার করেছেন। তিনি সব সময় এই সব আন্দোলনের ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদকে এড়িয়ে গিয়ে তার দেশপ্রেম ও মুক্তির আদর্শের দিকটা তুলে ধরতেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল কেবলমাত্র দেশের স্বাধীনতা এবং দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের শোষণ মুক্তি।

১৯১৯ সালে যখন তিনি তার বিখ্যাত উপন্যাস 'প্রেম আশ্রম' লিখলেন, রাশিয়ায় ততদিনে অক্টোবর বিপ্লব হয়ে গেছে। তাঁর এই উপন্যাসে তিনি জমিদার এবং ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচারে নিপীড়িত উত্তর ভারতের চাষীদের সংগ্রামকে বিষয়বস্তু করেছেন। এই উপন্যাসের এক তরুণ চরিত্র বলরাজ—যে বাধ্যতামূলক শ্রমের বিরোধিতা করেছিল, এক সময় তার বাবাকে বলছে—"তোমার চালচলন দেখে মনে হচ্ছে চাষীরা যেন কেউ নয়। তারা শুধু জমিদারের বেগার খাটার জন্য জন্মেছে। কিন্তু আমি খবরের কাগজে পড়েছি রাশিয়ায় এই চাষীরাই দেশের শাসক। তারা তাদের ইচ্ছেমত চলে।"*

বলরাজ জমিদারের এই স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানিয়ে ধরা পড়ল এবং আদালতে তার বিচার হল।

অক্টোবর বিপ্লবের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমচন্দ ভারতবাসীর কাছে ঐ বিপ্লবের তাৎপর্য পৌছে দিতে শুরু করেন। আমরা তাঁর উপন্যাস, ছোটগল্প এবং নাটকগুলিতে এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিষয়ে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা দেখতে পাই। এইভাবে স্বাধীনতা এবং সমাজের ন্যায়-বিচারের সংগ্রামে যে যে শ্রেণী আমাদের সমর্থন পাবার যোগ্য তা তিনি স্পষ্টভাবে সনাক্ত করলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে অন্যান্য

* প্রেমচন্দের পুত্র অমৃত রায় দেখিয়েছেন যে উপন্যাসের এই অংশটি তিনি ১৯১৮ সালের জুলাই নাগাদ অর্থাৎ বিপ্লবের মাত্র ৯।১০ মাসের মধ্যে লিখেছেন। ব্রিটিশ অপপ্রচারের দৌলতে "অক্টোবর বিপ্লব একটা বর্বরদের ক্রিয়াকলাপ"—এ ভিন্ন আর কোন ধারণাই মানুষের মধ্যে যখন জন্মাতে পারেনি, তখন প্রেমচন্দ কিভাবে তার প্রতি আকৃষ্ট হলেন, তা বিস্ময়কর।—সম্পাদক

শ্রেণীও সমর্থনের ভান করতো, কিন্তু, আসলে তাদের কিছু কায়েমী স্বার্থ ছিল। প্রেমচন্দের সময়কার বহু সমস্যার এখনও সমাধান হয়নি। কিছু কিছু সমস্যা বরং আরও প্রকট এবং জটিল হয়ে উঠেছে।

প্রেমচন্দ বুঝেছিলেন যে জাতিভেদ এবং সাম্প্রদায়িকতা মুছে না গেলে কিছুতেই ভারতবর্ষে মুক্ত সমাজ গড়া সম্ভব নয়। তাঁর একাধিক ছোটগল্প এবং প্রবন্ধে তিনি এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং নিম্ন জাতির নিগ্রহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন।

এই শতাব্দীর তৃতীয় এবং চতুর্থ দশকে সাম্প্রদায়িকতার বিষ তীব্রভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। সাম্প্রদায়িক সংস্থাগুলি হিন্দু এবং মুসলিম সংস্কৃতির আওয়াজ তুলেছিল। প্রেমচন্দ বুঝেছিলেন ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য নিয়ে দেশের পুঁজিবাদী সম্প্রদায় তাদের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার জন্য এই খেলায় যোগ দিয়েছিল। কারণ তারা কখনই চায়নি যে দেশের শ্রমিক শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করবে। প্রেমচন্দ এ জায়গায় লিখছেন —"সংস্কৃতির ছদ্মবেশেই সাম্প্রদায়িকতা দেখা দেয়, কখনও সে আসল মুখটি দেখায় না। এটা যেন সেই গাধার মত যে সিংহের চামড়া গায়ে চাপিয়ে পশুদের রাজা হতে চেয়েছিলেন। হিন্দুরা মহাপ্রলয়ের দিন পর্যন্ত তাঁদের সংস্কৃতি বজায় রাখতে চায়। মুসলিমরাও তাই চায়। কিন্তু তারা ভুলে গেছে যে হিন্দু সংস্কৃতি মুসলিম সংস্কৃতি বলে কিছু নেই। পৃথিবীটা একটাই সংস্কৃতির অধীন, তার নাম অর্থনৈতিক সংস্কৃতি। ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতির কোন সম্পর্ক নেই। সেখানে আর্য-সংস্কৃতি, ইরানী-সংস্কৃতি, আরব-সংস্কৃতি থাকতে পারে। কিন্তু খ্রিস্টান, হিন্দু বা মুসলীম সংস্কৃতি বলে কিছু নেই।"

এর থেকেই বোঝা যায়, প্রেমচন্দের সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে সোজাসুজি এবং স্পষ্ট ধারণা ছিল। তিনি জানতেন যে জনগনের উৎপাদন শক্তিই তার সংস্কৃতির উৎস। প্রেমচন্দের উপন্যাসে ভারতবর্ষের যে সামগ্রিক সংস্কৃতির দৃশ্য প্রতিফলিত, সেটা ভারতীয় জনগণের ঐক্য সম্পর্কে তাঁর চিন্তার অভিব্যক্তি।

প্রেমচন্দ ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমানদের একই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের অধীন করে চরিত্রায়ন করেছেন। তিনি সারা জীবন সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তাঁর বহু চিঠিতে তিনি প্রগতিশীল লেখক এবং মনীষীদের কাছে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নীতিগত ও কর্মসূচীগত স্তরে এক সর্বব্যাপী সংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে প্রেমচন্দ গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তাঁর দ্বারা

প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে মহাত্মা গান্ধীই সারা দেশকে জাগিয়েছিলেন এবং তাঁর স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ দূর গ্রামে গিয়েও পৌঁছেছিল। এই কারণে তিনি গান্ধীকে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝেছিলেন লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর সত্যিকারের দাসত্ব মোচন তখনই সম্ভব যখন তাঁদের ওপর অর্থনৈতিক শোষণের সমাপ্তি হবে।

তিনি সব সময় নির্মমভাবে পুরোহিত শ্রেণীকে আক্রমণ করেছেন এবং তাঁদের ভণ্ডামি ফাঁস করে দিয়েছেন। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে সরল সাধারণ মানুষদের ঠকাবার এবং শোষণের জন্য যে অমিতাচার চলছিল তার মুখোস তিনি খুলে দেন। তিনি বিশ্বাস করতেন—এই পুরোহিত শ্রেণী সামন্ত প্রভু, মহাজন এবং শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি।

তিনি ক্রমে এটাও বিশ্বাস করেছিলেন যে শ্রেণীদ্বন্দ্ব এবং তজ্জনিত অন্যায় ও কুফলগুলি সমাজের এক মৌলিক বাস্তব সত্য। তাঁর 'প্রেম আশ্রম' উপন্যাসের নায়ক প্রেমশঙ্কর একজন জমিদার। কিন্তু সে তার সমস্ত জমি স্বেচ্ছায় কৃষকদের বিলিয়ে দিয়েছে, অনেকটা টলস্টয়ের নায়ক প্রিন্স নেখলিউডভ এর মত। কিন্তু প্রেমচন্দ যখন ভারতীয় জীবনে শ্রেণীদ্বন্দ্বের ভয়ানক বাস্তবতা আরো তীব্রভাবে অনুভব করলেন, তখন এই আদর্শবাদ একটা বাস্তব রূপ গ্রহণ করেছিল। তাঁর "গোদান" উপন্যাসে বা "কফন" গল্পে এই বাস্তবতার নগ্নরূপ দেখতে পাওয়া যায়। ত্রিশের দশকে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে গান্ধীজীর অছিতত্ত্ব (ধনীরা গরীবদের অছি) এবং অহিংস নীতিরও তিনি বিরোধিতা করেছেন।

প্রেমচন্দের একজন জীবনীকার মদনগোপাল উল্লেখ করেছেন "..এখন তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাকে শেষ করে দিতে চাইলেন। তার মধ্যে হয় গান্ধীজী ঘুমিয়ে পড়লেন, না হয় মহাত্মার প্রতিমূর্তি তাঁর হৃদয় মন্দির থেকে স্থানচ্যুত হল।"

এই সময় অক্টোবর বিপ্লবের ফলশ্রুতি হিসাবে যে নতুন সমাজ, নতুন সভ্যতার সূচনা হল, প্রেমচন্দ তাকে সহৃদয় অভ্যর্থনা জানালেন।

তিনি তাঁর ঐতিহাসিক প্রবন্ধ 'মহাজনী সভ্যতা'য় বলছেন, "এই নতুন সভ্যতার মৌলিক নীতি হল, মানসিক অথবা শারীরিক শক্তি দিয়ে যাঁরা সম্পদ সৃষ্টি করে সমাজ এবং রাষ্ট্র তাঁরা শ্রদ্ধেয়। পক্ষান্তরে যারা পুরুষানুক্রমিক আয়ে অথবা অন্যের শ্রমে বসে খাচ্ছে, যারা নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম বাড়িয়ে অতিরিক্ত মুনাফা কুড়োতে চাইছে অথবা দুর্বলতর দেশকে ধ্বংস করার জন্য মারনাস্ত্র বানাচ্ছে, তাদের মৃত্যু বিষের মত ঘৃণা করা উচিত।"

তিনি নবাগত সোভিয়েট সভ্যতাকে সমস্ত তথাকথিত সভ্যতার চেয়ে উর্দ্ধে স্থান দিলেন। কারণ, এই শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ যে নতুন সংস্কৃতির জন্ম দিল তা সমস্তরকম শোষণ থেকে মুক্ত, ন্যায়ের পক্ষাবলম্বী, এবং মানবিকতা ও শান্তির পূজারী। অমৃত রায় তাই সঠিক ভাবেই বলেন, "প্রেমচন্দ একজন সত্যিকাবের সত্যের পূজারী ছিলেন বলেই তাঁর সময়ের সবচেয়ে বড় সত্যের কাছে তিনি প্রণত হয়েছিলেন।"

১৯৩৬ সালে ভারতীয় প্রগতিশীল লেখক সংস্থার প্রথম অধিবেশনে, সভাপতির ভাষণে, প্রেমচন্দ লেখকদের আগুয়ান হয়ে জনগণকে জাগাতে এবং একটি ন্যায় ও মানবিক সমাজের জন্য সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

সৃষ্টিশীল লেখার পাশাপাশি তিনি 'হংস' নামে একটি মাসিক সাহিত্যপত্র এবং 'জাগরণ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রচলন করে তাঁর প্রিয় আদর্শ এবং মূল্যবোধ প্রচার করতে লাগলেন। এই দুটি পত্রিকার বহু রচনা ও ছোটগল্প ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ করেছিলেন। পত্রিকাগুলির ঘোষণাপত্র বাতিল হয়েছিল এবং প্রেমচন্দের কাছে নতুন করে জামিন দাবী করা হয়েছিল। এই পত্রিকাগুলি চালাতে গিয়ে বহু আর্থনৈতিক ক্ষতিও তিনি স্বীকার করেছিলেন। তাঁর কয়েকটি রচনায় নির্মমভাবে ধর্মোন্মত্ত সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিকে আক্রমণ করার ফলে তাঁকে শাসানো হয়েছিল এবং সেইসঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর স্থানীয় প্রতিবেশীদের হিংস্রতা দানা বেঁধে উঠেছিল। তাঁর সহধর্মিণী শিবরাণী তাঁর "প্রেমচন্দঃ ঘরমেঁ" বইতে লিখেছেন যে তিনি তাঁকে মানুষের ক্রোধ উৎপন্ন করে এরকম ধরণের রচনা লিখতে বারণ করলেন। কিন্তু প্রেমচন্দ বললেন, "জনসাধারণ এবং সরকার উভয়েই চায় যে লেখকরা তাদের ক্রীতদাস হোক। যদি লেখকরা অন্যে যা চায় তাই-ই লেখে তাহলে সে লেখক হতে পারে না এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব হারায়। তাঁর কর্তব্য বড় কঠিন। যদি তিনি সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বলেন, তাহলে তাঁকে জেলে যেতে হয়, আর যদি তিনি জনসাধারণকে অখুশী করেন, তাহলে তাঁকে হিংস্র আক্রমণের মুখোমুখি হতে হয়। তাহলে কি লেখক লেখা ছেড়ে দেবে? না, সে তা করবে না। তাঁর অন্তস্তলের তীব্র যন্ত্রনা থেকে তাঁর লেখার জন্ম। দুঃখের বিষয় হলো এই সকল মানুষের মন সঙ্কীর্ণ এবং তাঁরা সব জায়গায় প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু আমি তাদের আক্রমণে ভয় পাই না। যদি তা পেতাম, তাহলে আমি আর লিখতাম না। যদি কোন লেখক এই ধরনের আক্রমণে ভয় পায় তাহলে কি করে সে জনগণের নেতৃত্ব দেবে?"

প্রেমচন্দ শুধু জাতীয় জীবনের জটিল সমস্যা সম্পর্কেই সচেতন ছিলেন না, তাঁর

সময়কার আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলি সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। পিছিয়ে পড়া আফ্রো-এশিয়ান দেশগুলির সম্পদ শোষণের জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। জার্মানী এবং ইতালিতে গজিয়ে ওঠা ফ্যাসিবাদের বিপজ্জনক দিকটাও তিনি জানতেন। ১৯৩৩ থেকে '৩৬ সাল অবধি লেখা "অন্ধ পুঁজিবাদী" "রাষ্ট্রীয়তা আউর অন্তররাষ্ট্রীয়তা" প্রভৃতি তাঁর বিভিন্ন রচনায় তিনি [illegible]

সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলির চক্রান্তকে চিহ্নিত করেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন কিভাবে এশিয়া ও আফ্রিকায় শ্রমজীবি জনগণকে বিভক্ত করে তাদের দাসত্বমোচনের সংগ্রামকে দুর্বল করার জন্য বর্ণ, ধর্ম, সংস্কৃত ও জাতীয়তার বিভেদগুলিকে তুলে ধরতে সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী শক্তিগুলি সক্রিয়।

প্রেমচন্দ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমালোচনা করে সমাজতন্ত্রের পক্ষাবলম্বন করেছেন। তার মতে সমাজতন্ত্রেই একমাত্র দুনিয়ার অবহেলিতদের স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের সুযোগ আছে। তাঁর গভীর মানবিকতা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষকে দাসত্ব, দারিদ্র এবং শোষণ শৃঙ্খল থেকে মুক্ত দেখতে চেয়েছিল। ১৯৩৩ সালের অক্টোবরে তিনি লিখেছেন, "ভারতবর্ষের মত দেশে, যেখানে অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র এবং যেখানে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয়েরই শোষণের জোয়ালের নীচে শ্রম করতে হয়, সেখানে সমাজতন্ত্রের কোন বিকল্প নেই।"

প্রেমচন্দের দৃষ্টিতে একজন সত্যিকারের লেখক রাজনৈতিক নেতাদের অনুসরণ করে না বরং সে নিজেই নেতৃত্ব দেয় এবং নতুন পথ দেখায়।

আজ যখন প্রতিক্রিয়া, শোষণ, ফ্যাসিবাদ এবং অপ-সংস্কৃতির শক্তিসমূহ নতুন করে দেখা দিচ্ছে, তখন প্রেমচন্দের রচনাবলী এবং চিন্তাধারার গুরুত্বও অনেক বেড়েছে।

মূল প্রবন্ধ "Relevance of Premchand's Heritage" থেকে অনুবাদ : সৌমেন দত্ত

উপন্যাস ও বাস্তবতা : কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কথা

অধ্যাপক নামওয়ার সিং

প্রেমচন্দের বয়ঃকনিষ্ঠ ও সমসাময়িক খ্যাতনামা হিন্দী ঔপন্যাসিক জৈনেন্দ্র কুমারকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়: প্রেমচন্দ-এর 'গোদান' উপন্যাসটি আপনি লিখলে কি ভাবে লিখতেন, তখন তিনি তাঁর বক্তব্য এইভাবে সন্নিবদ্ধ করেন:

"হরিকে আমি অপরিবর্তিত রাখতাম। এই হরিকে দেখান হয়েছে একা নিয়তির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত এবং তা সত্ত্বেও অসহায়। আমি এতে হাত দিতাম না। তবে তার চারপাশের পরিস্থিতি বা ব্যক্তিদের আমি নিয়তি হিসাবে পেশ করতাম না। এ যেন হরি হচ্ছে শিকার এবং বাকী সকলে হরির শিকারী। আমি দেখাতে চেষ্টা করতাম যে আসলে সকলেই শিকার হয় এবং বৃথাই লোকে একে অন্যকে শিকার করার চেষ্টা করে। বস্তুতঃ ভাগ্যশক্তি হল নৈর্ব্যক্তিক এবং সত্যের পক্ষাবলম্বন করবার জন্য ও অসত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য কারুর সমবেদনাকে পক্ষপাতদুষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই। এটা যদি করতে পারতাম তাহলে আমি আমার 'গোদান'কে সফল বলে বিবেচনা করতাম।"

কাজেই আমরা বুঝতে পারছি যে হরিকে অন্যরা শিকার করার চেষ্টা করছে, এই দৃশ্য দেখে জৈনেন্দ্র কুমার অস্বস্তি বোধ করছেন। জৈনেন্দ্র কুমার চান শিকার ও শিকারীর অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করতে। শুধু তাই নয়, তিনি আমাদের এই কথাও বিশ্বাস করাতে চান যে, কেউই হত্যা করে না এবং কেউই নিহতও হয় না। আসলে সকলেই নাকি তাদের নিজস্ব অজ্ঞতার, তাদের সমষ্টিগত ভাগ্যের বলি। মানবজীবনের দুঃখদুর্দশার ও শোষণের সামাজিক তথা বস্তুভিত্তিক শিকড়গুলিকে অস্বীকার করার এই মনোবিকারগ্রস্ত আকাঙ্ক্ষা এতই সুস্পষ্ট যে এ-সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এবং অতঃপর এই বাস্তব-অস্বীকারকারী স্বতঃসিদ্ধ থেকে যে যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়, তা হল, হাল ফ্যাশানের সেই ধারণার মধ্যে

পলায়ন ; যে ধারণা অনুযায়ী মানুষ মাত্রেই নিঃসঙ্গ, মানুষ মাত্রেই নিঃসঙ্গতার কারণে যন্ত্রণাদগ্ধ আর তার নিঃসঙ্গতা হল স্বাভাবিক এক প্রাকৃতিক অবস্থা এবং যন্ত্রণাদগ্ধ অভিশপ্ত মানুষের ভবিতব্য নির্ধারিত হচ্ছে আধুনিক-অস্তিত্ববাদী ধাঁচের এক অজানা, অপ্রাতরোধ্য, অকারণ, ভিত্তিহীন ভাগ্যশক্তি দ্বারা। ফলে, এই ধারণার জগতে কেউ যেমন শিকার করে না তেমনি কাউকে শিকারও হতে হয় না। ফলে এখানে কেউ কাউকে যেমন যন্ত্রণা দেয়না তেমনি কেউই কারুর জন্যে বলি হয় না।

জৈনেন্দ্রকুমারই একমাত্র লেখক নন যিনি প্রেমচন্দের বাস্তববাদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর পরেই আছেন অজ্ঞেয়, যাঁকে হিন্দী আধুনিকতাবাদের জনক বলে বিবেচনা করা হয়। তিনিও উপন্যাসকে বাস্তববাদের 'মরণকামড়' থেকে রক্ষা করার জন্যে নিরন্তর সংগ্রামরত। তাঁর বোধশক্তি অনুসারে, তিনি উপন্যাসকে যে বাস্তববাদ থেকে 'মুক্ত' করতে চেয়েছিলেন তার একমাত্র উদ্দেশ্য হল, "আরো গভীরে গিয়ে" বাস্তবতাকে করায়ত্ত করা। ১৯৭৫-এর মে মাসের 'নয়া প্রতীক' কাগজে প্রকাশিত "বাস্তবতা : বোধ এবং মরণ-ফাঁদ" নামে একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন :

"বাস্তবতাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলার জন্যই আমাদের যুগের গুরুত্বপূর্ণ ঔপন্যাসিকরা বাস্তববাদকে পরিত্যাগ করেছে। বাস্তবতাকে করায়ত্ত করার জন্য 'বাস্তববাদী' দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করা ও 'বাস্তিক' দৃষ্টিভঙ্গি পুনগ্রহণ করা—এইটাই, বলা যেতে পারে, আধুনিক সাহিত্য ও আধুনিক শিল্পের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাঁক : তীক্ষ্ণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করলে একটি মাধ্যমিক স্তরের কথাও উল্লেখ করতে হয়,—"বাস্তববাদী" দৃষ্টিভঙ্গির পর এসেছিল 'আধুনিকতাবাদী' দৃষ্টিভঙ্গি। তারপর এই শেষোক্ত কুসংস্কারের হাত থেকেও অব্যাহতি মিলেছিল এবং আবার নজর পড়েছিল 'বাস্তিক' দৃষ্টিভঙ্গির সম্ভাবনার দিকে।"

কিন্তু যে-বাস্তবতাকে তিনি উপন্যাসের মধ্যে ধরতে চাইছেন, শেষ পর্যন্ত তা স্থান এবং কালের গণ্ডি পেরিয়ে এমন এক বিমূর্ত রূপ ধারণ করছে যে, আমরা বাস্তবতাকে যেভাবে জানি ও উপলব্ধি করি তা তাঁর কাছে খুবই অকিঞ্চিৎকর হয়ে উঠেছে এবং তিনি এই বাস্তবতাকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেছেন।

নির্মল বর্মাও ভিন্ন পথে বাস্তববাদকে আক্রমণ করেছেন। বাহ্যতঃ তার আপত্তি ঠিক বাস্তববাদের প্রতি নয়, উনবিংশ শতাব্দীর বাস্তববাদের প্রতি। জয়েস ও প্রুস্ত-এর বিংশ শতাব্দীর বাস্তববাদকে তিনি তুলনামূলক বিচারে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন। কাজেই উপন্যাসের গুণাবলী বিবেচনার ক্ষেত্রে বাস্তবতার আদর্শকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তিনি বলেছেন :

"উপন্যাসের গুণাবলী বিবেচনা করতে গিয়ে প্রশ্ন করা উচিত নয়, উপন্যাসটি জীবনের কতটা কাছে পৌঁছেছে (কার জীবন, কি ধরনের জীবন?)। প্রশ্ন করা উচিত নয় উপন্যাসের ঘটনাবলী কতটা সম্ভাব্য (সে সম্ভাব্যতা কোনদিনই সাহিত্যের কষ্টিপাথর ছিল না, তা হলে সেক্সপীয়ার হতেন সবচেয়ে অসফল লেখক)। প্রশ্ন করা উচিত নয়, উপন্যাসের চরিত্রগুলি কতটা বাস্তবানুগ ('বাস্তবতা' কোন প্রদীপ নয় যে তার নিকটবর্তী হলেই সাহিত্যকর্ম উজ্জ্বল হয়ে উঠবে আর দূরবর্তী হলেই ম্লান হয়ে আসবে)। উপন্যাসের অর্থবহ হওয়া না-হওয়া তার বাস্তবতার ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে উপন্যাসের গঠন-প্রক্রিয়ার ওপর, উপন্যাসের কাঠামো নির্মাণের মধ্যে নিহিত চালিকা শক্তির ওপর।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাস্তববাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে বাস্তববাদকেই অস্বীকার করার মধ্যে কোন দৈব-যোগাযোগের ব্যাপার নেই। এবং এই প্রবণতা শুধু হিন্দী সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ফ্রান্সের নব-ধারার ঔপন্যাসিকরাও এই কীর্তি করেছেন। বালজাকের বাস্তববাদের সমালোচনা করার সময় অ্যালেন্ রব-গ্রিলেও যেন মনে হয়, শেষ পর্যন্ত বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অ্যালেন-রব-গ্রিলে হচ্ছেন সেই সমস্ত ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অন্যতম, নির্মল বর্মা যাদের প্রশংসা করেন এবং এই ফরাসী নবধারার ঔপন্যাসিকের সঙ্গে তিনি তাঁর সাক্ষাৎকারের একটি বিবরণও প্রকাশিত করেছেন।

আসলে বাস্তববাদের বিরোধিতা করাই হল পশ্চিমী আধুনিকতার ও "আভাঁ-গার্দে"র মূল কথা। বাস্তবিক পক্ষে, এটা হল এক ধরনের নান্দনিক মতবাদ যা সাংস্কৃতিক প্রগতিবাদের মুখোশ পরে আবির্ভূত হচ্ছে। ষাটের দশকের নব প্রগতিবাদের দেবদূত হারবার্ট মারকিউজ এই নান্দনিক মতবাদের হয়ে ওকালতি করেছেন, আর একে বুর্জোয়া সমাজ, বুর্জোয়া সংস্কৃতি ও বাস্তবতা-বিষয়ক বুর্জোয়া ধারণার বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ হিসাবে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করেছিলেন।

এই বাস্তববাদ বিরোধিতার পিছনে যে নির্দিষ্ট রাজনীতি আছে সেদিকে পশ্চিমী দুনিয়ার অনেক মনীষীই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই "মুক্তি প্রবক্তা" রাজনীতি, বাহ্যতঃ বুর্জোয়া শক্তির বিরোধিতা করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা বুর্জোয়া শক্তির মধ্যেই বিলীন হয়ে যাবে এবং বুর্জোয়া শক্তিরই অংশ হয়ে দাঁড়াবে। সেই কথাই বলেছেন ক্রিস্টোফার ল্যাশ:

"এক সময়ে শিল্পের স্বাধিকার রক্ষা করাটাই ছিল একটা প্রয়োজনীয় সৃজনমূলক, এমন কি একটি বৈপ্লবিক রাজনৈতিক কর্ম। কিন্তু এখন আর শিল্পের স্বাধিকার রক্ষা করাটা কোন গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবে না। বার্থ-এর

ভাষায়, যে শিল্প 'সত্য ও মিথ্যার মধ্যকার বিরোধ ধ্বংস করে' সে শিল্প শুধু বিজ্ঞাপন ও প্রচার সংস্কার আরব্ধ কর্মকেই সম্পূর্ণ করে। ঠিক যেমন করে সেই শিল্প যা শব্দকে মুক্ত করে আনে তাৎপর্যর শৃঙ্খল থেকে এবং ধারণাকে সরিয়ে চিত্র-কল্পকে স্থাপিত করে। না, 'নান্দনিক মাত্রা' নয়, উদ্ধার করা প্রয়োজন বাস্তবতার বোধ। বাস্তববাদের যাঁরা বিরোধিতা করেন তাঁদের মনে রাখা দরকার যে হিন্দীতে উপন্যাস ও বাস্তববাদের আগমনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যাপক জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ। তাছাড়া এই স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় কৃষকরা যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তা সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যময়।"

পাশ্চাত্যে উপন্যাস হয়তো বুর্জোয়া শিল্প-মাধ্যম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, কিন্তু ভারতে— বিশেষ করে হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে উপন্যাসের জন্ম হয়েছে কৃষক জীবনের মহাকাব্য হিসাবে। এবং প্রেমচন্দের 'প্রেমাশ্রম' 'রঙ্গভূমি' 'কর্মভূমি' ও 'গোদান' থেকেই তা প্রমাণিত হয়। হিন্দী উপন্যাসের ক্ষেত্রে এটি একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। হিন্দীতে প্রেমচন্দের হাতে উপন্যাস সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সামন্ততন্ত্র বিরোধী সংগ্রামের একটি অমিত শক্তির অস্ত্র হয়ে ওঠে এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই উপন্যাস বাস্তববাদকে নন্দন তাত্ত্বিক মতাদর্শ রূপে বিকশিত করে। বাস্তববাদের এই বিকাশ স্পষ্ট ধরা পড়ে স্বয়ং প্রেমচন্দের রচনাতেই। প্রেমচন্দের রচনায় বিষয় ক্রমেই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং রচনা শৈলীর সূক্ষ্মতা বৃদ্ধিও লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর শেষ উপন্যাস 'গোদান' এবং তাঁর শেষ ছোটগল্প 'কফন'-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী সংগ্রাম এখনো পুরোপুরি সমাপ্ত হয়নি তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী তা এখন নতুন এক পর্ব অতিক্রম করেছে। কাজেই এই সংগ্রামে এখনো আমাদের বাস্তববাদের প্রয়োজন আছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে নতুন যুগের বাস্তববাদের বিকাশ সাধন করা আবশ্যক, তবে তার মানে এই নয় যে উপযোগী বাস্তববাদকে বর্জন করতে হবে বা নতুন যুগের বাস্তবতার পিছু ধাওয়া করতে হবে। এই বাস্তবতাকে যথার্থ ভাবে অনুধাবন করার জন্য বাস্তববাদ প্রয়োজন, যাতে অনুধাবন সম্পূর্ণ হবার পর বাস্তবতাকে পরিবর্তিত করা যায়।

কাজেই বাস্তববাদ সেকেলে হয়ে যায়নি। বাস্তববাদ একটি নান্দনিক বিষয় হিসেবে যে-কোন একটি বিশেষ ধারার বাস্তববাদের সীমান্ত অতিক্রম করে, ফলে বাস্তববাদের কোন সীমারেখা নেই, কারণ "মানবিক বাস্তবতার বিকাশেরও কোন সীমা নেই"।

....

মূল ইংরেজী প্রবন্ধ "Novel and Realism—A note" থেকে অনুবাদ : সিদ্ধার্থ ঘোষ



নির্বাচিত রচনা

মূলগল্প "বড়ে ঘর কী বেটী"। প্রেমচন্দ ছদ্মনামে লিখিত প্রথম ছোটগল্প। প্রথম প্রকাশ: 'জমানা' পত্রিকায়, ডিসেম্বর ১৯১০

বড় ঘরের মেয়ে

বেণীমাধব সিংহ গৌরীপুর গ্রামের জমিদার। তাঁর পিতামহ কোনও এককালে ধনসম্পদে বেশ বিত্তশালী ব্যক্তি ছিলেন। গ্রামের ঘাটবাঁধানো সব দীঘি আর মন্দির, যেগুলো এখন মেরামত করাও দুঃসাধ্য, সেসব তাঁরই কীর্তি। লোকে বলে তাঁর দরজায় একসময় নাকি হাতী বাঁধা ছিল, আজ সে জায়গায় একটা বুড়ো মোষ বাঁধা, শরীরে যার হাড়-পাঁজর কখানা ছাড়া কিছুই বাকী নেই। তবে দুধটা বোধহয় খুব দেয়, কারণ কেউ না কেউ একটা পাত্র নিয়ে চোপর দিন ওর সাথে সাথে থাকে। বেণীমাধব সিংহ তাঁর অর্ধেকের উপর জমিজমা উকিলদের চরণে উৎসর্গ করে বসে আছেন। বর্তমানে তাঁর বার্ষিক আয় এক হাজারের বেশী নয়। জমিদার মশায়ের দুই ছেলে। বড় ছেলের নাম শ্রীকণ্ঠ সিংহ। অনেক পরিশ্রম ও উদ্যোগ করে সে বি. এ. ডিগ্রী লাভ করেছে। একটি অফিসে এখন চাকরী করে। ছোট ছেলে লালবিহারী সিংহ—দোহারা চেহারার শৌখীন যুবক। ভরাট মুখ, চওড়া বুক। মোষের টাটকা দুধ দুসেরটাক সে রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে খেয়ে থাকে! শ্রীকণ্ঠসিংহের ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। এসব নেত্রপ্রিয় গুণাবলীকে সে বি. এ.—এ দুটি অক্ষরের পায়ে উৎসর্গ করে দিয়েছে। অক্ষর দুটি তার দেহটিকে দুর্বল, মুখমণ্ডলকে কান্তিহীন করে দিয়েছে। বৈদ্যক গ্রন্থে তাই তার বিশেষ রুচি। আয়ুর্বেদিক ঔষধে তার বেশী আস্থা। সকাল সন্ধ্যায় তার ঘর থেকে খলের নুড়ির শ্রুতিমধুর শব্দ প্রায়ই শোনা যায়। লাহোর ও কলকাতার বৈদ্যদের সাথে তার খুব পত্রালাপ চলে।

ইংরেজী ডিগ্রীটির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজদের সামাজিক প্রথাগুলোর প্রতি শ্রীকণ্ঠসিংহ মোটেই অনুরক্ত নয়। বরং প্রায়ই সে খুব জোরগলায় সেসবের নিন্দা ও অবজ্ঞা করে থাকে। এজন্যেই গাঁয়ে তার বেশ সম্মান। দশহরার সময় সে সোৎসাহে রামলীলায় অংশগ্রহণ করে, নিজে কোনও না কোন পাত্রের ভূমিকায়

অভিনয় করে। গৌরীপুর গ্রামে রামলীলার জন্মদাতা সে। প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার গুণগান করা তার ধর্মনিষ্ঠার প্রধান অঙ্গ। একান্নবর্তী পরিবারের সে তো একনিষ্ঠ উপাসক। আজকাল যৌথ পরিবারে মিলেমিশে থাকতে মেয়েদের যে অনীহা তাকে সে জাতি এবং দেশ উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর বলে মনে করে। এজন্যই গ্রাম্যললনারা ওকে নিন্দে করে। কেউ কেউ তো ওকে তাদের শত্রু বলে ভাবতেও সংকোচবোধ করে না। তারই পত্নী এ ব্যাপারে তার বিরোধী। তার কারণ এ নয় যে, সে তার শ্বশুর শাশুড়ী, দেওর কিংবা জাকে ঘৃণা করে, বরং তার বক্তব্য হল অনেক সহ্য করে প্রশ্রয় দেওয়া সত্ত্বেও যদি সংসারে আর সবার সাথে বনিবনা না হয়, তাহলে আগামী দিনের খিটমিটিতে জীবনটাকে নষ্ট করার চাইতে নিজের হাঁড়ি আলাদা করে নেওয়াই ভালো।

আনন্দী একটি বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। তার বাবা ছোটখাট একটি রাজ্যের তালুকদার। বিরাট অট্টালিকা, একটি হাতী, তিনটে কুকুর, বাজপাখী, শিকারী পাখী, ঝাড়-লণ্ঠন, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটী আর ধারদেনা ইত্যাদি যা কিছু একজন প্রতিষ্ঠাবান তালুকদারের ভোগ্য তা সবই তাঁর ছিল। নাম ভূপসিংহ। বড় উদারমনা ও প্রভাবশালী পুরুষ। তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ ছেলে নেই একটিও। সাত সাতটি মেয়ে, তাও ভগবানের দয়ায় সব কটি জীবিত। প্রথমে উৎসাহের বশে তো তিনি প্রাণ খুলে তিনটির বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু যখন পনের বিশ হাজার টাকার দেনা ঘাড়ে চাপল, তখন হুঁশ হল। হাত গুটিয়ে নিলেন। আনন্দী তাঁর চতুর্থী কন্যা। বোনেদের সবার চাইতে সে বেশী রূপবতী ও গুণবতী। তাই তালুকদার ভূপসিংহ তাকে খুব ভালবাসতেন, সুন্দর সন্তানকে বোধ হয় তাঁর বাবাও বেশী ভালবাসে। তালুকদার মশাই খুবই দুশ্চিন্তায় ছিলেন যে আনন্দীর বিয়ে কোথায় দেবেন! ঋণের বোঝা আরও বাড়ুক এ যেমন চাইতেন না আবার এও চাইতেন না যে মেয়েটা নিজেকে অভাগী ভাবুক। একদিন কোনও একটা কিছু ব্যাপারে চাঁদার টাকা চাইতে শ্রীকণ্ঠ ওঁর কাছে গিয়েছিল। বোধ হয় নাগরী প্রচারের চাঁদাটাদা হবে। ভূপসিংহ শ্রীকণ্ঠের আচার ব্যবহারে এতই মুগ্ধ হয়ে পড়েন যে ধুমধাম করে তারই সাথে আনন্দীর বিয়ে দিয়ে দেন।

আনন্দী তার নতুন সংসারে এসে এখানকার হালচাল সম্পূর্ণ অন্য রকম দেখে। যে ছিমছাম জীবনযাত্রায় সে ছেলেবেলা থেকে অভ্যস্ত, তার লেশমাত্রও এখানে নেই। হাতী-ঘোড়া দূরে থাক, একটা সাজানো গোছানো সুন্দর গরুর গাড়ি পর্যন্ত নেই। রেশমী স্লিপার এনেছিল সাথে করে, কিন্তু এখানে বাগান কই! ঘরে জানালা নেই, মেঝেতে ফরাশ নেই, দেওয়ালে ছবি নেই। এ একেবারে সাদাসিধে গ্রা

গৃহস্থের বাড়ি। আনন্দী কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই নতুন অবস্থার সাথে নিজেকে এতটা খাপ খাইয়ে নিল যেন সে বিলাসসামগ্রী কখনও চোখেই দেখে নি।

দুই

একদিন দুপুরবেলা লালবিহারীসিংহ দুটো পাখি মেরে নিয়ে এসে বৌদিকে বলে—চটপট রেঁধে দাও তো, আমার বড্ড খিদে পেয়েছে। আনন্দী রান্নাবান্না সেরে পথ চেয়ে বসে ছিল। আবার নতুন পদ বাঁধতে বসল। পাত্রে দেখে ঘি পোয়াটাকের বেশি নেই। বড়লোকের ঝি, হিসেব করে খরচটরচ করা স্বভাবে নেই। সে সব ঘিটুকুই মাংসে দিয়ে দিল। লালবিহারী খেতে বসে দেখে ডালে ঘি পড়ে নি। জিজ্ঞেস করে—ডালে ঘি দাওনি যে ?

আনন্দী বলে—ঘি সবটা মাংসে দিয়ে ফেলেছি। লালবিহারী চড়া গলায় বলে ওঠে—এই তো পরশু মাত্র ঘি এল, এরই মধ্যে সব ফুরিয়ে গেছে !

আনন্দী উত্তর দেয়—আজকে তো শুধু পোয়াটাক ঘি বাকী ছিল। ওর সবটাই আমি মাংসে দিয়ে দিয়েছি।

শুকনো কাঠে আগুন যেমন খুব তাড়াতাড়ি জ্বলে ওঠে ঠিক তেমনি ক্ষুধায় কাতর মানুষও তুচ্ছ কথায় দপ করে জ্বলে ওঠে। বৌদির এই অহংকার লালবিহারীর খুবই খারাপ লাগে। খেঁকিয়ে বলে ওঠে ইস্, বাপের বাড়িতে যেন ঘি'র নদী বয়ে যাচ্ছে ! মেয়েরা গালাগালি সহ্য করে, মারধোরও সহ্য করে, কিন্তু বাপের বাড়ির নিন্দে তারা কিছুতেই সইতে পারে না। আনন্দী মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলে—হাতী মরলেও ন' লাখ টাকা। ও বাড়িতে এইটুকুন ঘি নাপিত-কাহারেরা রোজ খেয়ে থাকে।

লালবিহারী রেগে আগুন হয়ে ওঠে। থালাখানাকে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে। বলে—ইচ্ছে করছে জিভটা টেনে ছিঁড়ে নিই।

আনন্দীরও রাগ হয়, মুখ আরক্ত হয়ে ওঠে, বলে—উনি থাকলে আজ মজাটা টের পাইয়ে দিতেন।

অশিক্ষিত, উদ্ধত জমিদার নন্দন আর থাকতে পারে না। তার নিজের বৌটি সাধারণ এক জমিদার ঘরের মেয়ে। যখনই মন চাইত ওকে দু'চার ঘা মেরে বসত। খড়ম তুলে সে আনন্দীর দিকে জোরে ছুঁড়ে মারে, বলে—যার দেমাকে ভুলে আছ, ওকেও দেখে নেব, তোমাকেও দেখব।

আনন্দী হাত দিয়ে খড়ম ঠেকায়, মাথাটা বেঁচে যায়, কিন্তু আঙুলে বড় চোট লাগে। রাগে পাতার মত কাঁপতে কাঁপতে সে তার ঘরে গিয়ে ঢোকে। মেয়েদের যা কিছু শক্তি আর সাহস, মান ও মর্যাদা সবই স্বামীকে ঘিরে। স্বামীর শক্তি ও পৌরুষেরই অহংকার তাদের। আনন্দী প্রচণ্ড রাগকে কোনমতে সামলে নেয়।

শ্রীকণ্ঠসিংহ প্রতি শনিবারে বাড়ি আসত। বৃহস্পতিবার দিন এ ঘটনা ঘটে দুদিন ধরে আনন্দী রাগ করে রইল, কিছু খায় নি, ছোঁয় নি, স্বামীর আসার প চেয়ে থাকে। শেষে শনিবার দিন যথারীতি সন্ধ্যের সময় শ্রীকণ্ঠ বাড়ি এল। বাই বসে কিছু একথা সেকথা, দেশ ও কাল সম্পর্কে কিছু খবরাখবর এবং কিছু মাম মোকদ্দমা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। এসব কথাবার্তা রাত দশ অবধি চলে। গাঁয়ের ভদ্রলোকেরা এসব আলোচনায় এতই মজা পান যে তাঁ খাওয়াদাওয়াই ভুলে যান। ওদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া শ্রীকণ্ঠের পক্ষে মুশকি হয়। এ দু'তিন ঘণ্টা আনন্দী খুব ছটফট করে কাটায়। কোনমতে খাবারের সম হয়। আড্ডা ভাঙে। শ্রীকণ্ঠকে একা পেয়ে লালবিহারী বলে—দাদা আপনি বৌদি একটু বুঝিয়ে, সুঝিয়ে—দেবেন যেন মুখ সামলে কথাটথা বলে। নইলে একদিন ব অনর্থ ঘটে যাবে।

বেণীমাধবসিংহ ছেলের পক্ষ নিয়ে সাক্ষ্য দেন—হ্যাঁ, ব্যাটাছেলেদের মুখে মুখে ক বলার স্বভাব বৌ-ঝিদের মোটেই ভালো নয়।

লালবিহারী—সে বড়লোকের মেয়ে হতে পারে, তা বলে আমরাও কিছু এব চাষাভুষো নই।

শ্রীকণ্ঠ উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞেস করে—তা হয়েছে কি ?

লালবিহারী বলে—কিছু না, এমনি শুধু শুধু গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধিয়েছে। বাপে বাড়ির গুমরে তো আমাদের মনিষ্যি বলেই গেরাহ্যি করে না।

শ্রীকণ্ঠ খাওয়া-দাওয়া সেরে আনন্দীর কাছে আসে। আনন্দী গুম হয়ে বসেছিল এ ভদ্রলোকটিও একটু কড়া মেজাজী। আনন্দী জিজ্ঞেস করে—মনটন ভালো তো শ্রীকণ্ঠ উত্তর দেয়—হ্যাঁ, খুব ভালো, কিন্তু আজকাল সংসারে এসব কি উৎপা বাধিয়ে বসে আছ ?

আনন্দীর ভুরু কুঁচকে ওঠে, রাগে সর্বশরীর অগ্নিশিখার মত জ্বলে ওঠে। বলে- তোমার কাছে এ আগুন যে লাগিয়েছে তাকে পেলে মুখে নুড়ো জ্বেলে দিতাম

শ্রীকণ্ঠ—মেজাজ এত গরম করছ কেন ? কি হয়েছে সেটা বলো না।

আনন্দী—কি আর বলব। এ আমার কপালের ফের। তা নইলে একটা গেঁ ছোঁড়া যার কিনা চাপরাসিগিরি করারও এলেম নেই, সে কিনা আমাকে খড়ম দি মেরে এভাবে বুক ফুলিয়ে চলে।

শ্রীকণ্ঠ—সব কিছু খুলে বল, তবে তো বুঝি। আমি তো এসব কিছুই জানি না।

আনন্দী—পরশু তোমার আদুরে ভাইটি আমাকে মাংস রাঁধতে বলেছিল। ঘি

তাগে ঘি পোয়াখানেকের বেশি ছিল না। যেটুকু ছিল আমি সবটা মাংসে দিয়ে ফেলেছিলাম। খেতে বসে আমাকে বলে—ডালে ঘি দাওনি কেন? ব্যস এ নিয়ে আমার বাপের বাড়ি তুলে যা তা বলতে লাগল। আমি থাকতে পারিনি। আমি শুধু বলেছিলাম ও বাড়িতে এটুকুন ঘি তো নাপিত বেহারারা খেয়ে থাকে, কেউ টেরটি পায় না। ব্যস, একথাটা শোনামাত্র বদমাশটা আমাকে খড়ম ছুঁড়ে মেরেছে। হাত দিয়ে যদি না ঠেকাতাম, তাহলে মাথাটাই ফেটে যেত। ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখো, আমি যা বললাম তা সত্যি কি মিথ্যে।

শ্রীকণ্ঠের চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে। বলে—এতদূর গড়িয়েছে! ছোঁড়ার এত সাহস! আনন্দী মেয়েদের স্বভাবমত কাঁদতে শুরু করে, কারণ চোখের জল তো তাদের চোখের পাতায়। শ্রীকণ্ঠ খুবই ধৈর্যশীল, শান্ত পুরুষ। সহজে সে রাগে না। তবে মেয়েদের চোখের জল পুরুষের ক্রোধাগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করতে তেলের মত কাজ করে। সারাটা রাত সে এপাশ ওপাশ করে কাটায়। দুশ্চিন্তায় দুচোখের পাতা এক করেনি। সকালে উঠেই বাবার কাছে গিয়ে বলে—বাবা, এ বাড়িতে তো আর থাকা চলবে না।

এ ধরনের বিদ্রোহসূচক কথা বলার জন্য শ্রীকণ্ঠ বহুবার বন্ধুদের এক হাত নিয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা যে আজ স্বয়ং তাকেই এ কথাগুলো নিজের মুখে বলতে হল! সত্যি অপরকে উপদেশ দেওয়া কত সহজ!

বেণীমাধব সিংহ হকচকিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন—কেন?

শ্রীকণ্ঠ—কারণ আমার নিজের মান মর্যাদারও কিছু চিন্তাভাবনা আছে। আপনার সংসারে এখন অন্যায় অবিচার আর জেদাজেদির প্রাবল্য চলছে। যাদের উচিত গুরুজনদের সম্মান করা, তারা তাদের মাথায় চড়ছে। আমি অন্যের চাকর, বাড়িতে থাকি না। আর এখানে আমার অবর্তমানে বাড়ির মেয়েদের উপর খড়ম আর জুতো বৃষ্টি হয়। কড়া কথা কাটাকাটি পর্যন্ত সহ্য করা যায়, চাই কি কেউ এক কথার জায়গায় দু'কথা বলুক তাও আমি সহ্য করতে পারি, কিন্তু তা বলে এটা কিছুতেই চলতে পারে না যে আমার উপর লাথি ঘুঁষি চলবে আর আমি রা'টি করব না।

বেণীমাধব সিংহ কোন উত্তর দিতে পারেন না। শ্রীকণ্ঠ সব সময়ই তাঁকে মান্য করে। ওর এই মূর্তি দেখে বৃদ্ধ জমিদার মশাই অবাক হয়ে যান। উনি শুধু বলেন—বাবা, তুমি বুদ্ধিমান হয়ে এসব কথা বলছ? বৌরা এভাবে সংসারকে তছনছ করে ফেলে, ওদের খুব বেশী লাই দেওয়া ঠিক নয়।

শ্রীকণ্ঠ—সেটুকু আমি জানি, আপনাদের আশীর্বাদে অতটা মূর্খ আমি নই। আপনি নিজেই তো জানেন আমারই বোঝানো শোনানোতে এ গাঁয়ের কয়েকটি সংসার

বেঁচে গেছে। কিন্তু যে মহিলার মানসম্ভ্রমের জন্য আমি ঈশ্বরের দরবারে দায়ী, তার প্রতি এমন ঘোর অবিচার ও পশুর মত ব্যবহার আমার কাছে অসহ্য। আপনি বিশ্বাস করুন আমি যে লালবিহারীকে এর জন্য কোন শাস্তি দিচ্ছি না সেটাই আমার পক্ষে কম কথা নয়।

এবার বেণীমাধব সিংহও গরম হয়ে ওঠেন। এ ধরণের কথা আর বরদাস্ত করতে পারেন না। বলেন—লালবিহারী তোমার ভাই। ওর যখনই কোন ভুলচুক হবে, ওর কান মলে দেবে। তা বলে .....

শ্রীকণ্ঠ –লালবিহারীকে আমি আর ভাই মনে করি না।

বেণীমাধব সিংহ—বৌয়ের জন্য ?

শ্রীকণ্ঠ—আজ্ঞে না, ওর ক্রূরতা আর অবিবেচনার জন্য।

দুজনেই খানিকক্ষণ চুপ। জমিদারমশাই ছেলের ক্রোধ শান্ত করতে চাইছিলেন বটে, কিন্তু এটা মানতে চাইছিলেন না যে লালবিহারীর কোন অন্যায় হয়েছে। ইতিমধ্যে পাড়ার আরও ক'জন ভদ্রলোক হুঁকো-কল্কে টানার ছুতোয় এসে হাজির। বৌয়ের কথায় শ্রীকণ্ঠ বাবার সঙ্গে ঝগড়া করতে চলেছে শুনে কয়েকজন মহিলার তো খুবই আনন্দ হল। উভয় পক্ষের মধুর বাণী শুনতে ওদের মন ছটফট করতে লাগল। গাঁয়ে কিছু কিছু কুচক্রী মানুষও ছিল যারা এই পরিবারের সদাচারী চালচলন দেখে মনে মনে জ্বলে পুড়ে মরত। তারা বলাবলি করত – শ্রীকণ্ঠ বাবাকে ভয় করে চলে, কারণ সে একটা ভীরু। শ্রীকণ্ঠের লেখাপড়া হয়েছে কারণ সে বইয়ের পোকা। বেণীমাধব সিংহ শ্রীকণ্ঠের পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করেন না, সেটা তার বোকামি। এইসব মহানুভবদের শুভকামনা আজ পূর্ণ হবার সম্ভবনা দেখা দিয়েছে। কেউ হুঁকো খাবার অছিলায়, কেউ খাজনার রসিদ দেখানোর অজুহাতে এসে বসল। বেণীমাধব-সিংহ প্রবীণ ব্যক্তি। এসব মনোভাব টের পেয়ে গেলেন। উনি ঠিক করলেন যেভাবেই হোক না কেন এসব কুচক্রীদের হাততালি দেবার সুযোগ দেবেন না। তাড়াতাড়ি মোলায়েম স্বরে বলেন—বাবা, আমি তো তোমাদের থেকে আলাদা নই। তোমার যা মন চায় করো, ছেলেটা সত্যিই এবার অপরাধ করে ফেলেছে।

এলাহাবাদের ক্রুদ্ধ গ্রাজুয়েট কিন্তু ব্যাপারটা ধরতে পারে না। ডিবেটিং ক্লাবে আপন যুক্তিতে অটল অনড় হয়ে থাকা তার স্বভাব। এসব ভেতরের ঘোরপ্যাঁচ সে কি করে বুঝবে ? বাবা কি উদ্দেশ্যে কথার মোড় ঘোরালেন সেটা সে ধরতে পারল না। বলল—আমি লালবিহারীর সাথে এ বাড়িতে আর থাকত পারব না।

বেণীমাধব—বুদ্ধিমান লোকেরা মুর্খের কথায় কান দেয় না। লালবিহারী অবুঝ ছেলে। ও যদি কিছু ভুলচুক করে ফেলে, তুমি বড়, তুমি ওকে মাফটাফ করে দাও।

শ্রীকণ্ঠ—ওর এতটা ধাষ্টামো আমি কোনমতেই সহ্য করতে পারি না। হয় সে এই বাড়িতে থাকবে, না হয় আমি। ও যদি আপনার বেশী প্রিয়পাত্র হয়, তাহলে আমাকে বিদেয় দিন, আমি নিজের ভার নিজে সামলাব। যদি আমাকে রাখতে চান তাহলে ওকে বলুন যেখানে খুশি চলে যাক। ব্যাস, এই আমার শেষ কথা।

লালবিহারীসিংহ চুপচাপ দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে দাদার কথাগুলি শুনছিল। দাদাকে সে খুবই ভক্তিশ্রদ্ধা করত। কখনো তার এতটা সাহস হয়নি যে শ্রীকণ্ঠের সামনে খাটিয়ায় বসে, হুঁকো টানে কিংবা পান খায়। বাপকেও সে এতটা সম্মান দেখাত না। শ্রীকণ্ঠও তাকে খুব ভালবাসত। জ্ঞানতঃ কোনদিন সে লালবিহারীকে একটা ধমকধামক পর্যন্ত দেয়নি। এলাহাবাবাদ থেকে যখনি সে আসত, ওর জন্য কোনও না কোন জিনিস আনত। সেবার একজোড়া মুগুর বানিয়ে দিয়েছিল তাকে। গত বছর নাগপঞ্চমীর দিনে সে যখন তার থেকে দেড়া তাগড়া জোয়ানকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়, তখন আখড়াব মধ্যিখানেই ছুটে গিয়ে সে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। পাঁচ টাকার খুচরো পয়সার হরিলুট দিয়েছিল। অমন দাদার মুখ থেকে আজ এমন মর্মান্তিক কথাগুলো শুনে লালবিহারীর বড় আত্মগ্লানি হল। সে জোরে জোরে কাঁদতে শুরু করে। কৃতকর্মের জন্য মনে মনে নিঃসন্দেহে সে অনুতাপ করছিল। দাদা আসার একদিন আগে থেকে ওর বুক ধড়ফড় করছিল এই ভেবে যে না জানি দাদা কি বলেন। ভাবছিল আমি ওঁর সামনে যাব কি করে, ওঁর সঙ্গে কথা বলব কি করে, ওঁর দিকে চোখ তুলে তাকাব কি করে। সে ভেবেছিল দাদা তাকে ডেকে বুঝিয়ে টুঝিয়ে দেবেন। কিন্তু আজ তার আশার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা ঘটল। দাদা আজ যেন নির্দয়তার প্রতিমূর্তি। সে মূর্খ, কিন্তু তার মন বলছিল, দাদা আমার সঙ্গে অবিচাব করছেন। যদি শ্রীকণ্ঠ তাকে ডেকে দুচারটে কড়া কথা বলত, শুধু তাই নয় দুচারটে চড়-চাপড়ও যদি মারত, তাহলেও বোধ হয় ওর এতটা দুঃখ হত না। দাদা যে বলল আর আমি ওর মুখ দেখতে চাই না, সেটা লালবিহারী সহ্য করতে পারে না। কাঁদতে কাঁদতে সে বাড়ির ভেতরে এসে নিজের ঘরে গিয়ে কাপড় বদলায়। চোখ মুছে ফেলে যাতে কেউ টের না পায় যে সে কেঁদেছে। তারপর আনন্দীর দরজার সামনে এসে বলে—বৌদি, দাদা প্রতিজ্ঞা করেছেন উনি আর আমার সঙ্গে এ বাড়িতে থাকবেন না। উনি আর আমার মুখ দেখতে চান না, বৌদি, আমি চললাম। দাদাকে আর এ মুখ দেখাব না; আমি যা কিছু অপরাধ করেছি সেসব তুমি মাফ করে দিও, বৌদি।

বলতে বলতে লালবিহারীর গলা ধরে এল।

লালবিহারী যখন মাথা হেঁট করে আনন্দীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তক্ষুণি শ্রীকণ্ঠ সিংহও চোখমুখ লাল করে বাইরে থেকে আসে। ভাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঘেন্নায় মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। যেন সে তার ছায়া থেকেও দূরে পালাতে চায়।

লালবিহারীর বিরুদ্ধে ঝোঁকের মাথায় নালিশ করে বসে আনন্দী তখন মনে মনে আপসোস করছিল। স্বভাবে সে দয়াবতী। সে মোটেই ভাবতে পারেনি যে ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে। মনে মনে স্বামীর উপর তার রাগ হচ্ছিল এই ভেবে যে ও কেন এতটা গরম হয়ে উঠল। তার উপর এ ভয়ও তাকে পেয়ে বসেছিল যে তাকে যদি এলাহাবাদে গিয়ে থাকতে বলে তাহলে কি করে সে কি করবে। এরই মধ্যে যখন সে লালবিহারীকে দরজায় দাঁড়িয়ে বলতে শোনে যে, আমি চলে যাচ্ছি, আমার যা কিছু অপরাধ ক্ষমা করে দিও, তখন তার রাগ যেটুকু বা বাকী ছিল তাও জল হয়ে গেল। সে কাঁদতে শুরু করল। (মনের ময়লা ধুয়ে ফেলতে চোখের জলেব মত আর কোনও কিছু নেই।)

শ্রীকণ্ঠকে দেখে আনন্দী বলে—লালা বাইরে দাড়িয়ে দাড়িয়ে খুব কাঁদছে।

শ্রীকণ্ঠ—তা আমি কি কবব ?

আনন্দী—যাও, ওকে ভেতরে ডেকে আন। আমার জিভ খসে পড়ুক। আমি কোত্থেকে এই ঝামেলা বাঁধিয়ে বসলাম।

শ্রীকণ্ঠ—আমি ডাকতে টাকতে পাবব না।

আনন্দী—তাহলে পরে আপসোস করবে। ওর মনে খব কষ্ট হয়েছে, আবার কোথাও চলে টলে না যায়।

শ্রীকণ্ঠ ওঠে না। ইতিমধ্যে লালবিহারী আবার বলে—বৌদি, দাদাকে আমার প্রণাম জানাও। উনি আমাব মুখ দেখতে চান না, তাই আমিও আমার মুখ ওঁকে দেখাব না।

বলেই লালবিহারী ফিরে চলে। দ্রুতপায়ে বাইবের দরজাব দিকে এগিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আনন্দী ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে ওব হাত ধরে। লালবিহারী ফিরে তাকায়, চোখে জল নিয়ে বলে—যেতে দাও আমাকে।

আনন্দী—যাচ্ছ কোথায় ?

লালবিহারী—যেখানে কেউ আমার মুখ দেখতে পাবে না।

আনন্দী—আমি তোমাকে যেতে দেব না।

লালবিহারী—আমি তোমাদের সঙ্গে থাকবার যোগ্য নই।

আনন্দী—আমার মাথার দিব্যি, আর এক পাও এগোবে না।

লালবিহারী—আমি যতক্ষণ না জানতে পারছি আমার দিক থেকে দাদার মন পরিষ্কার হয়ে গেছে, ততক্ষণ আমি এ বাড়িতে কিছুতেই থাকব না।

আনন্দী—ঈশ্বর সাক্ষী, তোমার উপর আমার মনে একটুও রাগ নেই।

এবার শ্রীকণ্ঠরও হৃদয় গলে। সে বাইরে এসে লালবিহারীকে বুকে টেনে নেয়। দু'ভাই খুব কাঁদে। ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে লালবিহারী বলে—দাদা, আর কখনো যেন বলবেন না যে আমি তোর মুখ দেখব না। এছাড়া আর যে সাজা আপনি দেবেন তাই আমি মাথা পেতে নেব।

কাঁপা গলায় শ্রীকণ্ঠ বলে—লল্লু, ওসব কথা একেবারে ভুলে যা। ভগবানের ইচ্ছায় এমন দিন আর আসবে না।

বেণীমাধবসিংহ বাইরে থেকে আসছিলেন। দু'ভাইকে আলিঙ্গনাবদ্ধ দেখে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। বলে ওঠেন—বড় ঘরের বেটিরা এমনিই হয়ে থাকে, বিগড়ে যাওয়া ব্যাপারকে ঠিক করে নেয়।

গাঁয়ে যেই একথা শোনে সেই আনন্দীর বড় মনের প্রশংসা করে বলে—'বড় ঘরের মেয়েরা এমনিই হয়ে থাকে।'

এই গল্পটি এবং অন্য [illegible] গল্পগুলি নয়। হিন্দী থেকে অনুবাদ করেছেন ননী শূর
প্রথম প্রকাশ '[illegible]' পত্রিকায়, ভ্রমবশতঃ '[illegible]' ছাপা হয়েছে।

প্রথম প্রকাশ: 'চাঁদ' পত্রিকায়। ১৯২৩ সালের জানুয়ারী সংখ্যায়।

পরীক্ষা

এক

দেওগড় রাজ্যের দেওয়ান সর্দার সুজানসিংহ বুড়ো হলে ভগবানের কথা মনে পড়ে। মহারাজের কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানান—দীনবন্ধু! এই সেবক চল্লিশ বছর ধরে শ্রীমানের সেবা করেছে, এখন বয়স হয়েছে, রাজকার্য সামলাবার সামর্থ্য আর নেই। ভাবছি কোথাও ভুলচুক হয়ে গেলে বুড়ো বয়সে না বদনাম হয়। সারা জীবনের সব সুনাম না ধুলোয় মিশে যায়।

রাজামশাই তাঁর এই অভিজ্ঞ, নীতিকুশল দেওয়ান মশাইকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। অনেক বোঝানো সত্বেও কিছুতেই যখন দেওয়ান মশাই রাজী হলেন না, তখন হার মেনে দেওয়ানমশাইয়ের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন, তবে এই শর্তে যে রাজ্যের জন্য নতুন দেওয়ান তাঁকেই খুঁজে দিতে হবে।

পরদিন দেশের নামকরা সব সংবাদপত্রে এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হল—দেওগড় রাজ্যের জন্য একজন সুযোগ্য দেওয়ান আবশ্যক। যিনি নিজেকে এই পদের উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন তিনি বর্তমান দেওয়ান সর্দার সুজানসিংহের সমীপে উপস্থিত হইবেন। গ্রাজুয়েট হওয়া আবশ্যিক নহে, তবে স্বাস্থ্যবান হওয়া আবশ্যক। অগ্নি-মান্দ্যের রোগীকে কষ্ট করিয়া এখানে আসিতে হইবে না। এক মাস যাবৎ প্রার্থীদের জীবন যাপন ও আচার আচরণ পর্যবেক্ষণ করা হইবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা অপেক্ষা কর্তব্যনিষ্ঠাই অধিক বিবেচিত হইবে। যিনি এই পরীক্ষায় সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হইবেন তিনিই এই উচ্চপদে সুশোভিত হইবেন।

দুই

এই বিজ্ঞাপন দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে তোলে। এমন একটি উচ্চপদ, অথচ কোনও রকমে বাধাবন্ধন নেই, শুধুমাত্র ভাগ্যের খেলা! শয়ে শয়ে লোক আপন আপন ভাগ্য পরীক্ষা করতে রওনা হয়ে পড়ে। দেওগড়ে নতুন নতুন রঙ-বেরঙের মানুষ দেখা যেতে থাকে। প্রতিটি রেলগাড়ি থেকে প্রার্থীদের যেন একটি মেলা এসে

নামে। কেউ আসে পাঞ্জাব থেকে,কেউ বা মাদ্রাজ থেকে,কেউ ফ্যাশনপ্রেমী আবার কেউ সেকেলে সাধাসিধে। পণ্ডিতমশাই আর মৌলবীসাহেবরাও নিজের নিজের ভাগ্যপরীক্ষার সুযোগ পেয়েছে। বেচারারা ডিগ্রীর জন্য হা-হুতাশ করত, কিন্তু এখানে ওসবের কোনও দরকার নেই। বঙীন পাগড়ি,চোগা,রকমারী আঙরাখা আর কানঢাকা টুপি দেওগড়ে আপন আপন শোভা দেখাতে শুরু করেছে। তবে গুনতিতে সবচেয়ে ভারি গ্র্যাজুয়েটরাই, কারণ ডিগ্রী অবশ্য প্রয়োজনীয় না হলেও ডিগ্রী দিয়ে দুর্বলতা তো চাপা পড়ে।

সর্দার সুজানসিংহ এসব মহানুভবদের আদর আপ্যায়নের খুব সুব্যবস্থা করে দিয়েছেন। লোকগুলো নিজের নিজের ঘরে বসে রোজা পালন করা মুসলমানদের মত মাসের এক একটা দিন গুনছেন। প্রতিটি মানুষ তাঁর নিজের জীবনটাকে নিজের বুদ্ধিমত ভালো করে দেখাতে চেষ্টা করছেন। মিস্টার 'এ' সকাল ন'টা অবধি ঘুমুতেন, আজকাল উনি বেড়াতে বেড়াতে উষা দর্শন করছেন। মিস্টার 'বি'র হুঁকো টানার অভ্যেস, কিন্তু এখন উনি রাত দুপুরে দরজা বন্ধ করে আঁধার ঘরে বসে সিগার ফুঁকছেন। মিস্টার 'সি', 'ডি' আর 'জি'-এর জ্বালায় ওঁদের বাড়িতে চাকরবাকরদের প্রাণ ওষ্ঠাগত ছিল, কিন্তু এই ভদ্রলোকেরা আজকাল 'আপনি' আর 'জনাব' ছাড়া চাকরবাকরদের সঙ্গে কথাই কন না। 'ক' মশায় ছিলেন নাস্তিক, হাক্সলের শিষ্য, কিন্তু ইদানীং ওঁর ধর্মনিষ্ঠা দেখে মন্দিরের পূজারী পুরুত মশায়ের চাকরি যাবার আশংকা দেখা দিচ্ছে। 'এল' মহোদয় দু'চক্ষে বই দেখতে পারতেন না, আর এখন বিরাট বিরাট সব গ্রন্থ ঘাঁটাঘাঁটি করায় তন্ময় হয়ে আছেন। যার সঙ্গেই কথা বলুন, তিনি যেন বিনয় আর শিষ্টাচারের অবতার। শর্মামশায় এক ঘণ্টা রাত থাকতে উঠে বেদমন্ত্র পাঠ করতে শুরু করেছেন, আর মৌলবী সাহেবের তো নমাজ আর কোরাণপাঠ ছাড়া আর কোনও কাজই নেই। সবাই ভাবছে একটা মাসের তো ঝঞ্ঝাট, কোনও মতে কাটিয়ে দেই, কার্যসিদ্ধি হয়ে গেলে তারপর কে দেখছে।

ওদিকে মানুষের সেই পাকা জহুরী আড়ালে বসে খুঁজে চলেছেন, এই বকসভায় হংস কোথায় লুকিয়ে আছে?

তিন

একদিন হাল ফ্যাশনওয়ালাদের মাথায় ঝোঁক চাপল নিজেদের মধ্যে হকি খেলা হোক না। হকির পাকা খেলুড়েরাই প্রস্তাবটা করে। আর কিছু না হোক এও তো একটা গুণ। একেই বা লুকিয়ে রাখা কেন? হতে পারে হাতের এই কৌশলটাই হয়ত কাজে লেগে যেতে পারে। ব্যস, সব ঠিক হয়ে যায়। 'কোর্ট' তৈরি হয়, খেলা

শুরু হয়, আর বলটা যেন কোনও একটি দপ্তরের অ্যাপ্রেন্টিসের মত ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে ফেরে।

দেওগড় রাজ্যে এ খেলাটা সম্পূর্ণ নতুন। লেখাপড়া জানা ভদ্রলোকেরা দাবা আর তাসের মত ভারিক্কি খেলা খেলতেন। দৌড়ঝাঁপের খেলাকে তাঁরা ছেলে' ছোকবা-দের খেলা মনে করতেন।

খুব উৎসাহে খেলা চলে। আক্রমণকারী খেলুড়েরা যখন বলটাকে নিয়ে দ্রুত ছুটে চলে তখন দেখে মনে হয় যেন একটা ঢেউ ছুটে যাচ্ছে। আবার ওদিকের খেলুড়েরা এগিয়ে আসা এই ঢেউটাকে এমনভাবে প্রতিহত করে যেন একটা লৌহপ্রাচীর।

সন্ধ্যে অবধি হৈচৈ চলে। সব্বাই ঘেমে নেয়ে একাকার। রক্তের উষ্ণতা চোখে মুখে ফুটে উঠেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে দম আটকে আসছে, তবু জয়পরাজয়ের মীমাংসা হচ্ছে না।

আঁধার নেমে আসে। খেলার মাঠ থেকে একটুখানি দূরে একটি নালা। নালার ওপরে কোনও পুল নেই। পথিকদের নালাতে নেমে হেঁটে পেরুতে হয়। খেলা ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে, খেলুড়েরা বসে বসে বিশ্রাম করছে, এমন সময় একজন চাষী আনাজভর্তি একটি গরুর গাড়ি নিয়ে ঐ নালায় আসে। একে তো নালাতে কাদা, তার উপর চড়াই এতটা খাড়া যে গাড়ি কিছুতেই ওপরে ওঠাতে পারছে না। চাষী কখনো বলদ দুটোকে হাঁকাচ্ছে, কখনো আবার চাকা দুটোকে হাত দিয়ে ঠেলছে, কিন্তু এদিকে বোঝা বেশ ভারি আর ওদিকে বলদ দুটোও দুর্বল। গাড়ি ওপরে ওঠে না, উঠলেও কিছুটা উঠেই গড়িয়ে আবার নিচে চলে আসে। চাষী বারবার জোর লাগায়, বার বার বিরক্ত হয়ে বলদ দুটোকে চাবকায়, কিন্তু গাড়ি ওঠবার নাম করে না। বেচারা চাষী হতাশ চোখে এদিকে ওদিকে তাকায়, কিন্তু কোথাও কোনও সাহায্যকারী চোখে পড়ে না। গাড়িটাকে ফেলে রেখে কোথাও সে যেতেও পারছে না। বড় বিপদে পড়ে গেছে।

ইতিমধ্যে খেলুড়েরা স্টিক হাতে নিয়ে হেলতে দুলতে ওদিক দিয়ে যায়। চাষী ওদের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখে, কিন্তু কারুর কাছে সাহায্য চাইতে তার সাহস হয় না। খেলুড়েরাও ওর দিকে তাকায়, তবে তা উপেক্ষার চোখে। সে দৃষ্টিতে সহানুভূতি নেই, আছে স্বার্থপরতা আর আত্মম্ভরিতা। উদারতা ও প্রেমের লেশমাত্রও নেই।

চা

তবে ওদলে একজন মানুষ ছিল যার মনে ছিল দয়া, ছিল সাহস। হকি খেলতে খেলতে আজ পায়ে তার চোট লেগেছে। লেংচে লেংচে আস্তে আস্তে সে হেঁটে

আসছে। হঠাৎ গাড়ির উপর তার নজর পড়ে। দাঁড়িয়ে পড়ে সে। কৃষকের মুখ দেখেই সে সব কিছু বুঝতে পারে। স্টিকটাকে একপাশে রেখে দেয়। গায়ের কোটটা খুলে রেখে চাষীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে—আমি তোমার গাড়িটাকে উঠিয়ে দেব?

চাষী তাকিয়ে দেখে একজন ঋজুদেহী দীর্ঘকায় পুরুষ সামনে দাঁড়িয়ে। ভয়ে ভয়ে বলে—হুজুর! আপনাকে কি করে বলি? যুবকটি বলে—দেখে মনে হচ্ছে তুমি অনেকক্ষণ ধরে এখানে পড়ে আছো। বেশ, গাড়িতে উঠে বসে তুমি বলদ দুটোকে হাঁকাও, আমি চাকা দুটোকে ঠেলছি। এক্ষুণি গাড়ি ওপরে উঠে যাবে।

চাষী গাড়িতে গিয়ে বসে। যুবক চাকা দুটোকে জোরে ঠেলে। কাদা বড্ড বেশি। হাঁটু অবধি তার কাদার ভেতর ঢুকে যায়। তবু সাহস হারায় না সে। আবার জোরে ঠেলে। ওদিকে চাষীটিও বলদ দুটোকে হাঁকায়। বলদ দুটো সাহায্য পায়, ফলে ওদের সাহস হয়, ওরা কাঁধ ঝুঁকিয়ে আর একবার জোরে টানতেই গাড়িটা নালার ওপর উঠে আসে।

যুবকের সামনে এসে জোড়হাত করে দাঁড়ায় চাষী। বলে—হুজুর! আপনি আজ আমাকে বাঁচিয়েছেন, তা না হলে সারাটা রাত এখানেই পড়ে থাকতে হত।

যুবক হেসে বলে—আমাকে তবে কিছু পুরস্কার দাও। চাষী গম্ভীর হয়ে বলে—নারায়ণ যদি চান দেওয়ানী আপনিই পাবেন।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাষীকে তাকিয়ে দেখে যুবক। ওর মনে একটা সন্দেহ জাগে—লোকটি সুজানসিংহ নয় তো? গলার স্বর তেমনি মনে হচ্ছে, চেহারাও যেন তেমনি। চাষীও ওর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকায়। বোধ হয় ওর মনের সন্দেহটাকে টের পেয়ে যায়; হেসে বলে—গভীর জলে ডুব দিলে তবেই তো মুক্তো মেলে।

পাঁচ

অবশেষে এক মাস পুরো হয়। নির্বাচনের দিন এসে পড়ে। প্রার্থীরা সকাল থেকেই নিজেদের ভাগ্যফল জানতে উৎসুক। সময় কাটানো মুশকিল হয়ে পড়ে। প্রতিটি মুখে আজ আশা ও নিরাশার দোলা। কে জানে কার আজ কপাল খুলবে? না জানি কার ওপর লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি পড়বে।

সন্ধ্যায় রাজার দরবারে বসে। শহরের সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য সব লোক, রাজকর্মচারী, সভাসদ এবং দেওয়ান পদের প্রার্থীরা সকলেই রঙচঙে সাজপোশাকে সুসজ্জিত হয়ে দরবারে এসে বসেন। প্রার্থীদের বুক টিপটিপ করতে থাকে।

সর্দার সুজানসিংহ উঠে দাঁড়িয়ে বলেন—দেওয়ান পদের প্রার্থী মহোদয়গণ! আপনাদের আমি যে কষ্ট দিয়েছি তার জন্য আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। এই

পদের জন্য এমন একজন মানুষের প্রয়োজন যাঁর হৃদয়ে দয়া এবং সেইসঙ্গে আত্মবল আছে। এমন অন্তঃকরণ চাই যা উদার; সেই আত্মবল চাই যা নির্ভীকভাবে বিপদের সম্মুখীন হতে পারে। আমাদের রাজ্যের ভাগ্য সুপ্রসন্ন যে এমন একজন সুযোগ্য পুরুষকে আমরা পেয়ে গেছি। এমন গুণবান ব্যক্তি পৃথিবীতে খুব কমই আছেন, আর যাঁরা আছেন তাঁরা কীর্তি ও খ্যাতির শিখরে অধিষ্ঠিত, তাঁরা আমাদের নাগালের বাইরে। পণ্ডিত জানকীনাথের মত মানুষকে দেওয়ানরূপে লাভ করার জন্য আমি আমাদের রাজ্যকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সব রাজকর্মচারী এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জানকীনাথের দিকে তাকান। সব প্রার্থীদের চোখও ওঁর দিকে। তবে ওঁদের চোখে অভিনন্দন আর এঁদের চোখে ঈর্ষা।

সর্দার সুজানসিংহ এরপর বলেন—একথা স্বীকার করতে নিশ্চয়ই আপনারা কেউ দ্বিধা করবেন না যে, যে মানুষ স্বয়ং আহত হয়েও একটি গরীব চাষীর আনাজভরা গাড়িখানাকে কাদা থেকে বের করে নালার ওপরে উঠিয়ে দেন, তাঁর হৃদয়ে নিবাস করছে সাহস, আত্মবল এবং উদারতা। এমন একজন মানুষ কখনও গরীব মানুষকে কষ্ট দেবেন না। এমন মানুষের সংকল্প হয় দৃঢ়, যা তাঁর চিত্তকে স্থির রাখবে। এমন মানুষ নিজে প্রতারিত হলেও দয়া এবং ধর্মের পথ থেকে কখনও বিচ্যুত হবেন না।

প্রথম প্রকাশ: 'হংস' পত্রিকায়, ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায়।

গুলিডাণ্ডা

আমাদের ইংরেজ বন্ধুরা স্বীকার করুন বা না করুন, আমি তো বলব গুলিডাণ্ডাই সব খেলার রাজা। আজও বাচ্চাদের ডাংগুলি খেলতে দেখলে ওদের সঙ্গে গিয়ে খেলতে মনটা আকুলিবিকুলি করে। না আছে লনের দরকার, না কোর্টের, না নেটের, না ব্যাটের। গাছ থেকে মজাসে একটা ডাল কেটে নিলাম, গুলি বানিয়ে নিলাম, দু'টো লোকও জুটে গেল তো ব্যস্ খেলা শুরু।

বিলিতী খেলাগুলোর সবচেয়ে বড় দোষ হল ওদের সরঞ্জামগুলো সব বড্ড দামী। যতক্ষণ না কমসেকম শ'খানেক খরচ করবেন, খেলোয়াড় বলেই কেউ মনে করবে না। অথচ গুলিডাণ্ডা হর্তুকী ফটকিরি ছাড়াই পাকা রঙ দেয়; তবু আমরা বিলিতী জিনিস বলতে এমন পাগল যে নিজেদের সবেতেই অরুচি। স্কুলের সব কটা ছেলের কাছ থেকে বছরে তিনটে চারটে টাকা শুধু খেলার ফি বলে নেওয়া হয়। কারুর মাথায় এটা আসে না যে স্বদেশী খেলা খেলাই, যা পয়সাকড়ি ছাড়াই খেলা যায়। বিলিতী খেলা তাদের জন্য, যাদের হাতে পয়সা আছে। গরীব ছেলেগুলোর ঘাড়ে এ বিলাসিতা চাপানো কেন? বেশ গুলিতে যদি চোখ ফুটো হবার ভয় থাকে, তাহলে কি ক্রিকেটে মাথা ফুটো হবার, পিলে ফুটো হবার, ঠ্যাং খোঁড়া হবার ভয় থাকে না? আমাদের কপালে গুলির দাগ যদি আজও থেকে থাকে, তাহলে আমাদের কিছু বন্ধু এমনও আছে যারা তাদের ব্যাটকে ক্রাচে বদলে বসে আছে। এটা হল যে আপন আপন রুচির ব্যাপার। আমার কাছে গুলিটাই সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে আর ছেলেবেলার মধুর সব স্মৃতির মধ্যে গুলিই সবচেয়ে মিষ্টি।

সেই সকালবেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া, সেই গাছে চড়ে ডাল কাটা, ডাং-গুলি বানানো, সেই উৎসাহ, সেই একাগ্রতা, খেলুড়েদের সেই জমায়েত, সেই গুলি লুফে নেওয়া, সেই ডাং পেটানো, সেই ঝগড়া মারামারি, সেই সরল স্বভাব যার কাছে ছুত-অচ্ছুতে, ধনী-গরীবে কোনও ভেদাভেদ থাকত না, যাতে বড়লোকী

ঠাকঠমক, চালচলন বা দেমাক দেখাবার কোন সুযোগই ছিল না, এসব তখুনি ভুলব যখন • যখন···। বাড়ির সবাই রাগ করছে, বাবা রান্নাঘরে বসে বড় তাড়াতাড়ি রুটির ওপর গায়ের জ্বালা মেটাচ্ছেন, মার দৌড় তো শুধু দরজা অবধি। কিন্তু ওঁদের বিচারে আমার অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ ফুটো নৌকোর মত হেলছে দুলছে; আর এদিকে আমি ডাং পেটাতে মশগুল, না আছে চানের চিন্তা না আছে খাবার ভাবনা। ছোট্ট একটুখানি তো গুলি। কিন্তু ও যে সারা দুনিয়ার সব মেঠাইয়ের চেয়ে মিষ্টি আর তামাসার মজাতে ভর্তি।

আমার খেলার সাথীদের মধ্যে একটি ছেলের নাম ছিল গয়া। আমার চাইতে বছর দু'তিনের বড় হবে। পাতলা, লম্বাটে, বাঁদরের মত লম্বা লম্বা পাতলা আঙুল, বাঁদরের মতই চপলতা, তেমনি খিটখিটে ভাব। গুলি যেমনই হোক না কেন, ওর ওপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ত টিকটিকি যেমন পোকা দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মনে পড়ে না ওর বাবা মা ছিল কি ছিল না কিংবা কোথায় সে থাকত, কি খেত। তবে ছেলেটি ছিল আমাদের গুলি ক্লাবের চ্যাম্পিয়ান। যে দলে সে খেলত সে দলের জয় ছিল অনিবার্য। আমরা সবাই ওকে দূর থেকে আসতে দেখলে ছুটে গিয়ে ওকে অভ্যর্থনা করে নিজেদের দলে নিয়ে নিতাম।

একদিন আমি আর গয়াই শুধু খেলছিলাম। সে ডাং পেটাচ্ছিল আমি গুলি লুফ্‌ছিলাম। অদ্ভুত ব্যাপার হল আমরা সারাদিন ডাং পেটাতে মশগুল থাকতে পারি, কিন্তু এক মিনিটও গুলি লুফ্‌তে ভাল লাগে না। আমি রেহাই পাবার জন্য সব চালই চেলেছিলাম যা এসব ক্ষেত্রে শাস্ত্রবিহিত না হলেও মার্জনীয়। কিন্তু গয়াটা তার দান আদায় না করে আমাকে রেহাই দিচ্ছিল না।

আমি বাড়ির দিকে ছুট দিয়েছিলাম। অনুনয় বিনয়ে কোনও কাজ হয়নি।

গয়া ছুটে এসে আমাকে ধরে ফেলে ডাণ্ডার বাড়ি মেরে বলেছিল—আমার দান দিয়ে যা। খুব তো বাহাদুরী করে ডাং পেটালি, গুলি লুফবার বেলায় পালিয়ে যাচ্ছিস কেন?

'তুই সারাদিন ধরে ডাং পেটালে কি আমি সারাদিন ধরে গুলি লুফব নাকি!'

'হ্যাঁ, তোকে সারাদিনই লুফ্‌তে হবে।,

'খেতে যাবনা, জলও খাব না?'

'হ্যাঁ আমার দান না দিয়ে কোথাও যেতে পারবি না।'

'আমি কি তোর চাকর!'

'হ্যাঁ, আমার চাকর।'

'আমি বাড়ি যাচ্ছি, দেখি আমার কি করতে পারিস!'

'বাড়ি যাবি কি করে, ঠাট্টা নাকি। দান দিয়েছি, দান আদায় করে তবে ছাড়ব।'
'বেশ, কাল আমি পেয়ারা খাইয়েছিলাম। ওটা ফিরিয়ে দে।'
'সে তো পেটে চলে গেছে।'
'বের কর্ পেট থেকে। তুই খেলি কেন আমার পেয়ারা?
'পেয়ারা তুই দিয়েছিস, আমি খেয়েছি। আমি তোর কাছে মাগতে যাই নি।'
'যতক্ষণ না আমার পেয়ারা দিচ্ছিস, আমি দান দেব না।'
আমি ভেবেছিলাম ন্যায় আমার দিকে। যতই হোক আমি একটা স্বার্থ নিয়েই ওকে পেয়ারা খাইয়ে ছিলাম। নিঃস্বার্থভাবে কে কার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে। ভিক্ষে তাও স্বার্থের জন্যই দেয়। গয়া যখন পেয়ারা খেয়েছে তখন আমার কাছ থেকে দান নেবার তার কি অধিকার? ঘুষ দিয়ে তো লোকে খুন পর্যন্ত হজম করে ফেলে? আমার পেয়ারাটাকে ও এমনি এমনি হজম করে ফেলবে? পেয়ারা ছিল পয়সায় পাঁচটা, যা গয়ার বাপের কপালেও জুটবে না। এ যে ভাহা অন্যায়!
গয়া আমাকে হাত ধরে টেনে বলেছিল—আমার দান দিয়ে যা, পেয়ারা-টেয়ারা আমি জানি না।
ন্যায় আমার দিকে। গয়া অন্যায়কে আঁকড়ে ধরে বসে ছিল। আমি হাত ছাড়িয়ে পালাতে চাইলাম। সে আমাকে যেতে দিচ্ছিল না। আমি ওকে গালি দিয়েছিলাম, ও তার চাইতেও কড়া গালি দিয়েছিল। শুধু গালিই নয়, একটা চাঁটিও মেরেছিল। আমি ওকে কামড়ে দিয়েছিলাম, ও আমার পিঠে ডাণ্ডা বসিয়ে দিয়েছিল। আমি কেঁদে উঠেছিলাম। গয়া আমার এই অস্ত্রের সামনে দাঁড়াতে পারে নি। পালিয়েছিল। আমি তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেলেছিলাম। ডাণ্ডার বাড়ি ভুলে গিয়ে হাসতে হাসতে বাড়ি গিয়েছিলাম। আমি দারোগার ছেলে একটা নিচু জাতের ছেলের হাতে মার খেয়েছি এটা ঐ বয়সেও আমার কাছে অপমানজনক মনে হয়েছিল, তবু বাড়িতে কারুর কাছে নালিশ্ করিনি।

দুই

সে সময় বাবা ওখান থেকে বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। নতুন জায়গা দেখার আনন্দে এত মেতে উঠেছিলাম যে খেলার সাথীদের ছেড়ে যাবার দুঃখ মোটেই হয়নি। বাবা দুঃখিত। এটা খুব পয়সা রোজগারের জায়গা ছিল। মাও দুঃখিত, এখানে সব জিনিস সস্তা ছিল, তাছাড়া পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার খুশির সীমা ছিল না। ছেলেদের কাছে বড় গলায় বলছিলাম ওখানে এমন ঘরদোর মোটেই নেই। এমন সব উঁচু উঁচু বাড়ি যেন আকাশের সঙ্গে কথা বলছে।

ওখানকার ইংরেজী স্কুলে কোনও মাস্টার যদি কোনও ছেলেকে মারে তো তার জেল হয়ে যায়। বন্ধুদের ক্যাল ক্যাল করা চোখ আর বিস্ময় মুঢ় মুখ বলছিল ওদের চোখে আমি কত উঁচুতে উঠে গেছি। মিথ্যাকে সত্যি করে ভাবার যে ক্ষমতা শিশুদের রয়েছে তাকে আমরা যারা সত্যকে মিথ্যা বানিয়ে নিচ্ছি, কি করে বুঝব ? ও বেচারাদের মনে আমার প্রতি না জানি কত ঈর্ষা হচ্ছিল। ওরা যেন বলছিল—তুমি ভাগ্যবান ভাই, যাও। আমাদের তো এই পোড়া গাঁয়েই বাঁচতেও হবে, মরতেও হবে।

বিশ বছর কেটে গেছে। আমি ইঞ্জিনীয়ারীং পাস করে ঐ জেলাতেই ট্যুর করতে করতে ঐ শহরেই ডাকবাংলোয় গিয়ে উঠেছি। জায়গাটাকে দেখেই এত সব মধুর শৈশব-স্মৃতি মনে জেগে ওঠে যে ছড়ি হাতে নিয়ে শহরে বেড়াতে বেরুই। চোখ দুটো যেন এক তৃষ্ণার্ত পথিকের মত ছেলেবেলাব সেসব ক্রীড়াস্থলগুলোকে দেখতে ব্যাকুল হয়ে উঠছে। কিন্তু শুধু সেই পরিচিত নামখানি ছাড়া ওখানে আর কিছুই পরিচিত নেই। যেখানে ভগ্নস্তূপ ছিল সেখানে এখন পাকা বাড়ি দাঁড়িয়ে। পুরানো বটগাছটা যেখানে ছিল, সেখানে এখন একটা সুন্দর বাগান। জায়গাটার কায়া পালটে গিয়েছে। যদি জায়গাটার নাম আর অবস্থান জানা না থাকত তাহলে ওকে চিনতেই পারতাম না। শৈশবের সঞ্চিত অমর স্মৃতিগুলো দু'বাহু বাড়ায়ে তার সেই পুরোনো সব বন্ধুদের গলা জড়িয়ে ধরতে আকুল হয়ে উঠেছে কিন্তু সেই দুনিয়া পাল্টে গেছে। মন চাইছে ঐ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কেঁদে বলি তুমি আমাকে ভুলে গেছ। আমি তো আজও তোমার সে রূপটাই দেখতে চাইছি।

হঠাৎ একটা খোলা জায়গায় আমি দু'তিটে ছেলেকে গুলিডাণ্ডা খেলতে দেখি। তৎক্ষণাৎ আমি নিজেকে একেবারে ভুলে যাই। ভুলে যাই যে আমি একজন বড় অফিসার, সাহেবী পোশাক পরা, ক্ষমতা আর প্রতিপত্তির আবরণে মোড়া।

একটি ছেলেকে গিয়ে জিজ্ঞেস করি—বল তো বাবা, এখানে গয়া নামে কোন লোক থাকে ?

একটি ছেলে ডাংগুলি সামনে নিয়ে ভীরু গলায় বলে—কে গয়া ? গয়া চামার ?

আমি বলে ফেলি—হ্যাঁ-হ্যাঁ ওই। গয়া নামের কোনও লোক আছে তো ? বো হয় ঐ লোকই।

'হ্যাঁ, আছে তো।'

'একটু গিয়ে ওকে ডেকে আনতে পার ?'

ছেলেটিকে ছুটতে ছুটতে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি হাতপাঁচেকের কালো দেবতাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে দেখা যায়। আমি দূর থেকেই চিনে ফেলি। লাফিে

ওর দিকে ছুটে যেতে চাই। চাই ওর গলা জড়িয়ে ধরতে, কিন্তু, কিছু ভেবে চুপ করে থাকি। বলি—কি গয়া, আমাকে চিনতে পারছ ?

গয়া নুয়ে নমস্কার করে—হ্যাঁ, হুজুর, আরে চিনব না কেন ? আপনি ভালো আছেন তো ?

'খুব ভালো আছি। তোমার কথা বলো।'

'ডিপ্টী সাহেবের সহিস আমি।'

'মতই, মোহন, দুর্গা সব কোথায় ? ওদের খবর জানো ?'

'মতই তো মরে গেছে, দুর্গা আর মোহন দুজনেই ডাকপিওন হয়েছে। আপনি ?

'আমি এই জেলার ইঞ্জিনীয়ার।'

'হুজুর তো ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় ভালো ছিলেন।'

'এখন আর ডাংগুলি খেল ?'

গয়া আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়—এখন আর ডাং গুলি কি খেলব হুজুর, এখন তো পেটের ধান্ধা থেকে রেহাই পাওয়া যায় না।

'এসো, আজ তুমি আর আমি খেলব। তুমি ডাং পেটাবে, আমি গুলি লুফব। আমার কাছে তোমার একটা দান পাওনা আছে। আজ সেটা নিয়ে নাও।'

অনেক কষ্টে গয়া রাজী হয়। ও এক টাকার মজুর, আমি বড় অফিসার। ওতে আমাতে মিল কই ? বেচারা লজ্জা পাচ্ছে। আমারও কিন্তু কম লজ্জা হচ্ছে না ; লজ্জা এজন্য নয় যে আমি গয়ার সঙ্গে খেলতে যাচ্ছি। বরং লজ্জা এজন্য যে লোকে এই খেলাটাকে আজব মনে করে মজা দেখবে আর বেশ ভালোমত একটা ভিড় জমে যাবে। ঐ ভিড়ে আনন্দ কোথায় থাকবে, কিন্তু না খেলেও তো থাকা যাচ্ছে না। শেষপর্যন্ত ঠিক হ'ল দু'জনেই শহর থেকে বহু দূরে নির্জন জায়গায় গিয়ে খেলব। ওখানে দেখবার লোক কে বসে থাকবে। মজাসে খেলব আর ছোটবেলার সেই মিঠাইটাকে খুব রসিয়ে রসিয়ে খাব। আমি গয়াকে নিয়ে ডাকবাংলোয় এসে মোটরে চেপে দু'জনে মাঠের দিকে যাই। সঙ্গে একখানা কুড়ুল নি। আমি গম্ভীর হয়ে থাকি, গয়া ব্যাপারটাকে এখনো ঠাট্টা ভাবছে। তবুও ওর মুখে উৎসুকতা বা আনন্দের কোন চিহ্ন নেই। বোধ হয় আমাদের দু'জনের মাঝে যে প্রভেদ দাঁড়িয়ে গেছে ও তাই ভাবতে মগ্ন।

আমি জিজ্ঞেস করি—আমার কথা তোমার কখনো মনে পড়ত গয়া ? সত্যি সত্যি বলবে।

গয়া লজ্জা পেয়ে বলে—আপনার কথা আমি ভাবব, আমি কি তার যুগ্যি ? কপালে আপনার সঙ্গে কদিন খেলা লেখা ছিল তাই, নইলে আমি আবার কি ?

আমি একটু দুঃখ পেয়ে বলি—আমার কিন্তু সব সময় তোমার কথা মনে পড়ত। তুমি যে আচ্ছা করে ডাণ্ডা মেরেছিলে—মনে পড়ে ?

গয়া আপসোস করে বলে—সেটা ছেলেবেলা ছিল হুজুর, ও কথা আর মনে করে দিও না।

বাঃ, ও আমার বাল্যজীবনের সবচেয়ে রসালো স্মৃতি। তোমার ঐ ডাণ্ডার বাড়িতে যে রস ছিল, সে তো এখন মান-সম্মানেও পাই না, টাকা পয়সাতেও না। এমন একটি মাধুর্য তাতে ছিল যে আজও মনকে মধুর করে তুলেছে।

ততক্ষণে আমরা শহর থেকে প্রায় মাইল তিনেক দূরে এসে পড়েছি। চারদিক নিস্তব্ধ। পশ্চিম দিকে মাইলের পর মাইল বিশাল ঝিল পড়ে আছে, যেখানে এসে আমরা কখনো-সখনো পদ্মফুল তুলে নিয়ে যেতাম, তার ঝুমকো বানিয়ে কানে পরতাম। জ্যৈষ্ঠের সন্ধ্যা গেরুয়া রঙে ডুবে যাচ্ছে। আমি লাফ দিয়ে একটা গাছে উঠে একটা ডাল কেটে আনি। চটপট গুলিডাণ্ডা তৈরি। খেলা শুরু হয়ে যায়। আমি গর্তে গুলি রেখে জোরে উপরে ছুঁড়ি। গুলি গয়ার সামনে দিয়ে বেরিয়ে যায়। সে হাত ছোঁড়ে, যেন মাছ ধরছে। গুলিটা ওর পেছনে গিয়ে পড়ে। এই গয়ার হাতে গুলি যেন এসে ধরা দিত। তা ডাইনে-বাঁয়ে যেখানেই হোক, গুলি ওর হাতে এসে যেত। গুলিকে যেন সে বশীকরণ করে ফেলত। নতুন গুলি, পুরনো গুলি, ছোট গুলি, বড় গুলি, ছুঁচালো গুলি, ভোঁতা গুলি সবই ওর হাতে এসে পড়ত। যেন ওর হাতে কোন চুম্বক লাগানো, গুলিকে টেনে নিত। কিন্তু আজ গুলির সঙ্গে ওর সে ভালবাসা নেই। যাক, আমি ডাং পেটা.ত শুরু করি। নানা রকম চোট্টামি করছি। অভ্যাসের অভাবটাকে বেইমানি করে পুরো করছি। মোড় হওয়া সত্ত্বেও ডাং পিটেই যাচ্ছি, যদিও নিয়মমত গয়ার পালা আসা উচিত। গুলিতে যদি একটু আস্তে আঘাত লেগে সেটা যদি অল্প একটু দূরে গিয়ে পড়ে, তাহলে আমি লাফিয়ে গিয়ে গুলি তুলে নিয়ে আবার হাঁকাই। গয়া এসব চোট্টামি দেখছে, কিন্তু কিচ্ছু বলছে না। যেন সে সব কায়দা-কানুন ভুলে গেছে। ওর টিপ কত অভ্রান্ত ছিল। গুলি ওর হাত থেকে ছুটে এসে টন করে ডাণ্ডায় লাগত। গয়ার হাত থেকে ছুটে গুলিটার কাজ ছিল ডাণ্ডায় এসে লাগা। আর আজ ঐ গুলি ডাণ্ডায় লাগছেই না। কখনো ডাইনে যাচ্ছে, কখনও বাঁয়ে, কখনো সামনে, কখনো পেছনে।

আধঘণ্টা পেটানোর পর একবার গুলি ডাণ্ডায় এসে লাগে। আমি চোট্টামি করি—গুলি ডাণ্ডায় লাগেনি, একেবারে কাছ দিয়ে গেছে, কিন্তু লাগেনি।

গয়া কোনও অসন্তোষ প্রকট করে না।

'লাগেনি বোধ হয়।'

'ডাণ্ডায় লাগলে কি আমি বেইমানি করতাম ?'

'না দাদা, তুমি কি আর বেইমানি করবে।'

ছেলেবেলায় কি সাধ্য ছিল অমন গোলমাল করে পার পাওয়া। এই গয়াই ঘাড়ে চড়ে বসত। আর আজ আমি কত সহজে ওকে ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছি। গাধাটা! সব কিছু ভুলে গেছে।

আচমকা গুলি আবার এসে ডাণ্ডায় লাগে, এবার এত জোরে লাগে যেন বন্দুক ছুঁড়েছে। এই প্রমাণের সামনে এবার কোন চোট্টামি করার সাহস আমারও হয় না; তবুও একবার এসবকে মিথ্যে বানাবার চেষ্টা করে দেখি না ? আমার আর ক্ষতি কি ? স্বীকার করলে প্রশংসা হবে; দু চার দান খেলতে হবে। অন্ধকারের ছুতো করে তাড়াতাড়ি রেহাই নিয়ে নেব। তারপর আবার কে দান দিতে আসছে।

গয়া বজ্রোল্লাসে বলে—লেগেছে, লেগেছে! টং করে শব্দ হয়েছে।

আমি অজ্ঞতার ভান করে বলি—তুমি লাগতে দেখেছ ? আমি তো দেখি নি।

'টং করে শব্দ হয়েছে হুজুর!'

'আর যদি কোনও ইটে লেগে থাকে ?'

আমার মুখ থেকে এই বাক্যটা ও সময় কি করে যে বেরুল, তাতে আমি নিজেই আশ্চর্য হচ্ছি। এই সত্যটাকে মিথ্যে বলা মানে দিনকে রাত বলা। আমরা দু'জনেই গুলিটাকে ডাণ্ডার সঙ্গে জোরে লাগতে দেখেছি; তা সত্ত্বেও গয়া আমার কথাটাকে মেনে নিল।

'হাঁ, হয়ত কোনও ইটের সঙ্গেই লেগে থাকবে। ডাণ্ডায় লাগলে এতটা আওয়াজ হত না।'

আমি আবার ডাং পেটাতে শুরু করি, কিন্তু এতটা প্রত্যক্ষ বিশ্বাসঘাতকতার পর গয়ার সরলতায় আমার দয়া হতে থাকে; তাই যখন তিনবারের বার গুলি এসে ডাণ্ডায় লাগলো আমি খুব উদারতার সঙ্গে দান দিতে রাজী হয়ে যাই।

গয়া বলে—এখন তো আঁধার নেমে গেছে দাদা, কালকের জন্যে তোলা থাক।

আমি ভাবি, কাল অনেক সময় পাবে, জানি না এ কতক্ষণ ধরে পেটাবে, তাই এখনি মামলা সাফ করে ফেলা ভাল।

'না, না। এখনো অনেক আলো আছে। তুমি তোমার দান নিয়ে নাও।'

'গুলি দেখতে পাবে না।'

'কুছ পরোয়া নেই।'

গয়া ডাং পেটাতে শুরু করে, কিন্তু তার একদম অভ্যাস নেই। সে দু'বার গুলি হাঁকতে যায়, কিন্তু দু'বারই ফস্কে যায়। এক মিনিটের কম সময়ে সে দান শেষ

করে ফেলে। বেচারা ঘণ্টাখানেক খেটেছিল, কিন্তু মিনিটখানেকের মধ্যেই নিজের দান হারিয়ে বসে। আমি আমার হৃদয়ের বিশালতার পরিচয় দিই।
'আরও এক দান খেলে নাও। তুমি তো প্রথমবারেই ফক্কে বসলে।'
'না, এখন আঁধার হয়ে গেছে।'
'তোমার অভ্যাস নেই। কখনো খেল না?'
'খেলার সময় আর পাই কোথা, দাদা!'

আমরা দু'জনে মোটরে গিয়ে বসি। সন্ধ্যাবাতি জ্বলতে না জ্বলতে শহরে ফিরে আসি। গয়া যেতে যেতে বলে—কাল এখানে ডাংগুলি খেলা হবে। সব পুরনো খেলুড়েরা খেলবে। তুমিও আসবে? যখন তোমার ফুরসৎ হবে, তখনি খেলুড়েদের ডাকব।

পরদিন ম্যাচ দেখতে যাই। এই জনা দশেকের এক একটা দল। ওদের মধ্যে কয়েকজন আমার খেলার সাথীও বেরুল। বেশীর ভাগই যুবক, যাদের আমি চিনি না। খেলা শুরু হল। আমি মোটরে বসে বসে তামাসা দেখি। আজ গয়ার খেলা দেখে, ওর নৈপুণ্য দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। ডাণ্ডার বাড়ি খেয়ে গুলি যেন আকাশ ছুঁয়ে আসে। কালকের মত সেই সংকোচ, সেই কুণ্ঠা, সেই ঔদাসীন্য আজ নেই। ছেলেবেলার সেই গুণ আজ প্রৌঢ়তাপ্রাপ্ত হয়েছে। কাল যদি ও আমার সঙ্গে এভাবে ডাং পেটাত, তাহলে আমি নিশ্চয় কেঁদে ফেলতাম। ওর ডাণ্ডার বাড়ি খেয়ে গুলি দু'শ গজ দূরে পড়ত।

গুলি লুফনেওয়ালাদের দলে একটি যুবক কিছু চোট্টামি করে। তার কথামত সে গুলিটাকে লুফে নিয়েছে। গয়ার কথা হ'ল—গুলি মাটিতে লেগে লাফিয়ে উঠেছিল। এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে মারামারি হবার উপক্রম। যুবকটি চেপে যায়। গয়ার থমথমে মুখ দেখে ভয় পেয়ে যায়। যদি সে চুপ না করত তাহলে ঠিকই মারপিট হয়ে যেত।

আমি খেলছিলাম না; কিন্তু অন্যদের এই খেলায় আমি ছেলেবেলার সেই আনন্দ পাচ্ছিলাম, যখন আমরা সব কিছু ভুলে খেলায় মেতে উঠতাম। এবার আমি বুঝলাম যে কাল গয়া আমার সঙ্গে খেলেনি, কেবল খেলবার ভান করেছে। সে আমাকে দয়ার পাত্র মনে করেছে। আমি চোট্টামি করেছি, বেইমানী করেছি, কিন্তু তাতে ওর একটুও রাগ হয়নি। কারণ সে খেলছিল না, আমাকে খেলাচ্ছিল, আমার মন রাখছিল। সে আমাকে দৌড়ঝাঁপ করিয়ে আমাকে গলদঘর্ম করাতে চায় নি। আমি এখন অফিসার। এই অফিসারী আমার আর ওর মাঝখানে দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি এখন ওর খাতির পেতে পারি, সেলাম পেতে পারি, সাহচর্য পেতে পারি না। ছেলেবেলায় আমি তখন ওর সমকক্ষ ছিলাম। আমাদের মাঝে কোন প্রভেদ ছিল না। এই পদে অধিষ্ঠিত হয়ে এখন আমি শুধু ওর দয়ার যোগ্য। সে আমাকে তার জুড়ি বলে মনে করে না। সে বড় হয়ে গেছে, আমি ছোট হয়ে গেছি।

প্রথম প্রকাশ : 'মাধুরী' পত্রিকায়, মে, ১৯৩০ সংখ্যায়।

পৌষের রাত

হল্কু এসে বউকে বলে—পেয়াদাটা এসেছে। দাও, যে কটা টাকা রেখেছিলাম, দিয়ে দিই ওকে, আপদ বিদেয় হোক।

মুন্নী ঝাঁট দিচ্ছিল। পেছন ফিরে বলে—তিনটে তো মাত্তর টাকা, দিয়ে দিলে কম্বল কোত্থেকে আসবে শুনি? পৌষ-মাঘ মাসের রাতে খেতে কি করে কাটাবে? গিয়ে ওকে বলে দাও, ফসল উঠলে চুকিয়ে দেব। এখন নেই।

হল্কু কিছুক্ষণ দ্বিধাগ্রস্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। পৌষ মাস মাথার ওপর এসে গেছে। কম্বল ছাড়া রাতে মাচায় কিছুতেই সে শুতে পারবে না। কিন্তু পেয়াদা যে শুনবে না, চোটপাট করবে, গালাগালি দেবে। মরুক গে, শীতে না হয় মরব, আপদটা তো এখন বিদেয় হবে। এই ভেবে সে তার মোটাসোটা গতরটা নিয়ে (যা তার নামটাকে মিথ্যে প্রমাণিত করছে) বউয়ের কাছে গিয়ে খোশামোদ করে বলে—যা, এনে দে, ঝামেলা তো মিটুক। কম্বলের কিছু একটা উপায় করবই।

মুন্নী ওর কাছ থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়ে চোখ পাকিয়ে বলে—আর করেছ উপায়! শুনি তো একটু, কি উপায় করবে? কেউ খয়রাত দেবে নাকি কম্বল? জানি না আর কত বাকি আছে, এ যেন কিছুতেই শোধ হচ্ছে না। বলি, তুমি চাষবাস ছেড়ে দাও না কেন? মরে মরে কাজ করবে, তারপর যেই ফসল উঠবে অমনি বাকি বকেয়া চুকাবে, ব্যস শেষ। ধার শোধ করতেই যেন আমাদের জন্ম। পেট ভরাতে মজুরি করো। চুলোয় যাক অমন চাষ-বাস। দেব না আমি টাকা—কিছুতেই দেব না।

হল্কু দুঃখের সঙ্গে বলে—তাহলে কি গালাগালি খাব?

মুন্নী তড়পে ওঠে—গালাগালি দেবে কেন? এ কি ওর রাজত্ব নাকি?

কথাটা বলে ফেলেই ওর কোঁচকানো ভুরু দুটো শিথিল হয়ে পড়ে। হল্কুর ঐ কথাগুলোর রূঢ় সত্যতা যেন একটি হিংস্র পশুর মতো চোখ পাকিয়ে দেখতে থাকে।

গিয়ে তাকের ওপর থেকে টাকা কটা বার করে এনে সে হল্‌কুর হাতে তুলে দেয়। বলে—তুমি এবার চাষবাস ছেড়ে দাও। মজুরি করলে তবু শান্তিতে একখানা রুটি খেতে পাব। কারুর ধমকানি তো শুনতে হবে না। বেশ চাষবাস যা হোক। জনমজুর খেটে রোজগার করো, তাও ওতেই উচ্ছুগ্‌গ করে দাও, তার ওপর আবার চোখ রাঙানি।

হল্‌কু টাকা কটা হাতে নিয়ে এমনভাবে বাইরে যায় যেন সে তার কলজেটাকেই ছিঁড়ে দিতে যাচ্ছে। মজুরির রোজগার থেকে একটা একটা করে পয়সা বাঁচিয়ে সে তিনটে টাকা জমিয়েছিল একটা কম্বল কিনবে বলে। সে টাকা কটাও আজ বেরিয়ে যাচ্ছে। এক একটা পা ফেলছে আর মাথাটা যেন তার দৈন্যের ভারে নুয়ে নুয়ে পড়ছে।

দুই

পৌষের অন্ধকার রাত। আকাশের তারাগুলোও যেন শীতে থর থর করে কাঁপছে। হল্‌কু খেতের একপাশে আখের পাতার ছাউনির নিচে বাঁশের মাচার ওপর তার পুরানো মোটা সুতীর চাদরখানা মুড়ি দিয়ে পড়ে পড়ে হিহি করে কাঁপছে। মাচার নিচে ওর সঙ্গী কুকুর জবরা মুখখানাকে পেটের মধ্যে গুঁজে শীতে কুঁ-কুঁ করে চলেছে। দু'জনের কারুরই চোখে ঘুম নেই।

হাঁটু দুটোকে ঘাড়ের সঙ্গে চাপতে চাপতে হল্‌কু বলে—কি রে জবরা, শীত করছে? বলেছিলাম না, বাড়িতে খড়ের ওপর শুয়ে থাক, তা এখানে কি করতে এসেছিস? মর্‌ এবার ঠাণ্ডায়। আমি কি করব? ভেবেছিলি আমি বোধহয় হালুয়া-পুরি খেতে আসছি, তাই ছুটতে ছুটতে আগে আগে চলে এসেছিস। এখন কাঁদো বসে বসে।

জবরা শুয়ে শুয়ে লেজ নাড়ে আর তার কুঁ…কু…শব্দটাকে দীর্ঘায়িত করে একটা হাই তুলে চুপ করে যায়। তার সারমেয়-বুদ্ধি বোধহয় মনে করে যে ও কুঁ… কুঁ… করছে বলে মনিবের ঘুম আসছে না।

হাত বের করে জবরার ঠাণ্ডা পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বুলোতে হল্‌কু বলে—কাল থেকে আমার সঙ্গে আর আসিস নে। এলে ঠাণ্ডায় জমে যাবি। এই শালা পশ্চিমা বাতাস কি জানি কোথেকে বরফ বয়ে আনছে। দেখি উঠে আর এক ছিলিম তামাক খেয়ে নি। কোনও মতে রাতটা তো কাটবে। আট ছিলিম টানা তো শেষ। এই হল গে চাষবাসের মজা। আবার এক একজন এমন ভাগ্যিবানও আছেন যাঁদের কাছে শীত গেলে ভয়ে পালাবে। মোটা মোটা সব লেপ, তোষক, কম্বল। সাধ্যি কি যে শীত পাত্তা পাবে। বরাতের জোর আর কি

খেটে মরব আমরা, মজা লুটবে অন্যে।

হল্কু ওঠে। গর্ত থেকে খানিকটা আগুন বের করে নিয়ে কলকে সাজায়। জবরাও উঠে বসে।

তামাক খেতে খেতে হল্কু বলে—খাবি তামাক? শীত আর কমে কই। হ্যাঁ, একটু যা মনটাকেই বুঝ দেওয়া।

জবরা ওর মুখের পানে স্নেহভরা চোখে তাকিয়ে থাকে।

হল্কু—আজ একটু শীত সয়ে নে। কাল আমি এখানটায় খড় বিছিয়ে দেব। খড়ের ভেতর ঢুকে শুয়ে থাকিস, তাহলে শীত লাগবে না।

থাবা দুটোকে হল্কুর হাঁটুর ওপর তুলে দিয়ে হল্কুর মুখের কাছে মুখ নিয়ে যায় জবরা। হল্কুর গালে ওর গরম নিঃশ্বাস লাগে।

তামাক খেয়ে হল্কু আবার শুয়ে পড়ে। এবার সংকল্প করে শোয় যে যত যাই হোক না কেন এবার ঘুমবই। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর বুকের ভেতরে কাঁপুনি শুরু হয়ে যায়। একবার এপাশ ফিরে শোয়, আবার ওপাশ। কিন্তু শীত যেন পিশাচের মত ওর বুকে চেপে বসে থাকে।

কিছুতেই আর থাকতে না পেরে সে জবরাকে আস্তে করে তুলে ওকে কোলে টেনে নেয়। জবরার মাথাটাকে আস্তে আস্তে চাপড়াতে থাকে। কুকুরটার গা থেকে না জানি কেমন একটা দুর্গন্ধ আসে, তবু হল্কু তাকে কোলে জাপটে ধরে এমন আরাম পায় যা সে ইদানীং কয়েকমাস পায়নি। জবরা বোধহয় ভাবে এই বুঝি স্বর্গ। হল্কুর নিষ্পাপ মনে কুকুরটির প্রতি লেশমাত্র ঘৃণাও নেই। সে তার কোন অভিন্নহৃদয় বন্ধু বা ভাইকেও এমনি আগ্রহের সঙ্গেই আলিঙ্গন করত। আজকের এই দৈন্যদশা তার মনকে মোটেই আহত করেনি। এই অদ্ভুত মিত্রতা তার হৃদয়ের সমস্ত দ্বারকে উন্মুক্ত করে দিয়ে হৃদয়ের প্রতিটি অণুকণাকে যেন আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলেছে।

হঠাৎ জবরা জানোয়ারের পায়ের আওয়াজ পায়। অন্তরঙ্গ এই আত্মীয়তা তার মনে এক নতুন উন্মাদনা জাগিয়ে তোলে, যার কাছে ঠাণ্ডা হাওয়ার দাপটও তুচ্ছ। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সে ছাউনির বাইরে এসে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। হল্কু ওকে কয়েকবার চু চু করে ডাকে তবু সে তার কাছে ফিরে আসে না। খেতের চারপাশে ছুটে ছুটে ডাকাডাকি করে চলে। কিছুক্ষণের জন্য এলেও তাড়াতাড়ি আবার ছুটে যায়। কর্তব্যভাবনা যেন ওর মনটাকে আকাঙ্ক্ষার মতই উথালপাথাল করে তোলে।

তিন

আরও একটা ঘণ্টা কাটে। রাত যেন শীতকে হাওয়ার ঝাপটা দিয়ে দিয়ে আরও

শানিয়ে তোলে। হল্কু উঠে বসে হাঁটু দুটোকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে দুহাঁটুর মাঝখানে মাথাটা গুঁজে নেয়। তবুও শীত মানে না। মনে হচ্ছে যেন সব রক্ত জমে বরফ হয়ে গেছে। ধমনীতে রক্তের বদলে বরফ বইছে। সে ঝুঁকে আকাশের দিকে তাকায়—রাত আর কত বাকি! সপ্তর্ষিমণ্ডল এখনো যে আকাশের অর্ধেকটাও ওঠেনি! ওপরে উঠে এলেই তবে গিয়ে ভোর হবে। এখনো পহরখানেক রাত রয়েছে।

হল্কুর ক্ষেত থেকে একটু দূরে একটা আমবাগান। পাতা ঝরা শুরু হয়ে গেছে। বাগানে রাশি রাশি শুকনো পাতা। হল্কু ভাবে গিয়ে পাতা কুড়িয়ে আগুন জেলে বেশ করে আগুন পোহায়। এত রাতে কেউ পাতা কুড়োতে দেখলে ভাববে ভূত: কে জানে কোন জানোয়ার টানোয়ার কোথাও লুকিয়ে বসে আছে কিনা; কিন্তু আর যে বসে থাকা যাচ্ছে না।

পাশের অড়হর খেতে গিয়ে কয়েকটা গাছ উপড়ে নিয়ে তা দিয়ে একটা ঝাড়ু মত বানিয়ে হাতে ঘুঁটে জালিয়ে নিয়ে সে বাগানের দিকে যায়। জবরা তাকে দেখে কাছে এসে লেজ নাড়ে।

হল্কু বলে আর যে থাকতে পারছি না রে জবরু! চল্, বাগানে পাতা কুড়িয়ে আগুন পোহাই। গা গরম করে নিয়ে এসে শোব। এখনো অনেক রাত।

জবরা কুঁ...কুঁ করে সম্মতি জানিয়ে সামনের বাগানের দিকে এগিয়ে যায়।

ঘুরঘুট্টি অন্ধকার বাগানে। অন্ধকারে দুরন্ত হাওয়া পাতাগুলোকে মাড়িয়ে দিয়ে যায়। গাছ থেকে শিশিরবিন্দু টুপ টুপ করে নিচে ঝরে ঝরে পড়ে।

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া মেহেদী ফুলের গন্ধ বয়ে আনে।

হল্কু বলে—কি মিষ্টি গন্ধ রে জবরু! তুইও নাকে সুগন্ধ পাচ্ছিস তো?

জবরা মাটিতে পড়ে থাকা এক টুকরো হাড় খুঁজে পায়, দাঁত দিয়ে সেটাকে চিবোতে শুরু করে।

মাটিতে আগুনটাকে রেখে হল্কু পাতা জড়ো করতে লেগে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে একরাশ পাতা জমে ওঠে। ঠাণ্ডায় ওর হাত দুখানা কাঁপে। খালি পা দুটো যেন অবশ হয়ে পড়ে। পাতার পাহাড় সে খাড়া করেছে। শীতকে এই আগুনের কুণ্ডে জালিয়ে ভস্ম করে দেবে সে।

খানিক বাদেই আগুন জ্বলে ওঠে। আগুনের শিখা ওপরের গাছের পাতাগুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। সেই চঞ্চল আলোয় বাগানের বিরাট বিরাট গাছগুলোকে মনে হয় অথই আঁধারকে তারা যেন মাথায় তুলে রেখেছে। অন্ধকারের এই সাগরে এই আলোটা যেন একখানা নৌকোর মত হেলতে দুলতে থাকে।

হল্কু আগুনের সামনে বসে আগুন পোহায়। একটু পরেই গায়ের চাদর খুলে সে

বগলদাবা করে রাখে। পা দুখানা মেলে দেয়, ভাবখানা যেন শীতকে ডেকে বলছে— 'দেখি কর্ তোর যা খুশি।' শীতের অসীম ক্ষমতাকে হারিয়ে দেবার বিজয়গর্বকে সে হৃদয়ে চেপে রাখতে পারছে না।

জবরাকে বলে, 'কি রে, আর শীত লাগছে না তো?'

জব্বর কুঁ-কুঁ করে যেন বলে—এখন কি করে আর শীত লাগবে?

'আগে থাকতে কথাটা মনে আসেনি। নইলে কি আর শীতে এত ভুগতাম।'

জব্বর লেজ নাড়ে।

'বেশ বাবা এসো তো দেখি এই আগুনটাকে টপকে পার হই। দেখি কে যেতে পারে? পুড়েটুড়ে গেলে বাবা, আমি কিন্তু ওষুধ দেব না।

অগ্নিকুণ্ডটার দিকে কাতর নয়নে তাকিয়ে দেখে জব্বর।

'মুন্নীকে কাল আবার বলে দিও না যেন, তাহলে ঝগড়া করবে।'

বলে সে লাফদিয়ে আগুনটার ওপর দিয়ে টপকে যায়। পায়ে একটুখানি আঁচ লাগে বটে, তবে তা তেমন কিছু নয়। জবরা আগুনের পাশ দিয়ে ঘুরে ওর কাছে এসে দাঁড়ায়।

হল্কু বলে—উহুঁ উহুঁ, এটা ঠিক হচ্ছে না। ওপর দিয়ে টপকে এসো, বলে সে আবার লাফ দিয়ে আগুনের এপাশে চলে আসে।

চার

পাতা সব পুড়ে ছাই। বাগানে অন্ধকার আবার ছড়িয়ে পড়ে। ছাইয়ের নিচে কিছু কিছু আগুন রয়েছে, যা বাতাসের ঝাপটা এলে একটুখানি জ্বলে উঠে পরক্ষণেই আবার নিভে যায়।

হল্কু আবার চাদর গায়ে জড়িয়ে নিয়ে গরম ছাইয়ের পাশে বসে গুনগুন করে একটা গান ধরে। গাটা ওর গরম হয়েছে বটে, কিন্তু আস্তে আস্তে আবার শীত যত বাড়ে ওকে তত আলসেমিতে পেয়ে বসে।

জোরে ঘেউ ঘেউ করে খেতের দিকে জবরা ছুটে যায়। হল্কুর যেন মনে হয় এক-পাল জানোয়ার ওর ক্ষেতে এসে ঢুকেছে। বোধহয় নীল গাইয়ের পাল। ওদের দাপাদাপি, ছুটোছুটির আওয়াজও পরিষ্কার ওর কানে আসে। মনে হচ্ছে যেন ওরা খেতের ফসল খেয়ে ফেলছে। ওদের চিবানোর চরচর আওয়াজও শোনা যায়।

হল্কু মনে মনে বলে—নাঃ, জবরা থাকতে কোনও জানোয়ারের সাধ্যি নেই খেতে ঢুকবে। ও ছিঁড়েই ফেলবে। এ আমার মনের ভুল। কই, আর তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না। আমিও কি যে ভুল শুনি!

জোর হাঁক পাড়ে সে—জবরা, জবরা!

জবরা ঘেউ ঘেউ করে চলে। ওর ডাক শুনেও কাছে আসে না।

আবার খেতের ফসল খাওয়ার আওয়াজ শোনা যায়। এবারে নিজের মনকে সে আর ধোঁকা দিতে পারে না। কিন্তু জায়গা ছেড়ে ওঠা যেন বিষের মত লাগে। বেশ জুৎ করে গরম হয়ে বসেছিল। এই কনকনে শীতে খেতে যাওয়া, জানোয়ারগুলোর পেছনে ছুটোছুটি করা অসহ্য মনে হচ্ছে। নিজের জায়গা ছেড়ে সে একটুও নড়ে না। জোরে হাঁক দিয়ে ওঠে সে—হিলো! হিলো!! হিলো!!

জবরা আবার ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। জানোয়ারগুলো খেতটাকে শেষ করে ফেলছে। ফসল পেকে উঠেছে। এবার কি সুন্দর ফসল হয়েছিল। কিন্তু নচ্ছার এই জানোয়ার-গুলো যে সব বরবাদ করে ফেলছে।

দৃঢ় সংকল্প করে হল্কু উঠে দাঁড়ায়। দু'তিন পা এগিয়েও যায়; কিন্তু আচমকা একটা ঠাণ্ডা, ছুঁচ বেঁধানো, বিছের হুলের মত বাতাসের ঝাপটা এসে ওর গায়ে লাগতেই ও আবার নিভু-নিভু আগুনের কাছটাতে ফিরে এসে বসে পড়ে। ছাই-গুলোকে খুঁচিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা গাটাকে গরম করতে বসে।

ওদিকে জবরা গলা ফাটিয়ে ফেলছে। নীল গাইগুলো খেতটাকে শেষ করে ফেলছে; এদিকে হল্কু গরম ছাইয়ের পাশে শান্ত হয়ে চুপচাপ বসে। অকর্মণ্যতা যেন দড়ির বাঁধনের মত তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে।

ছাইয়ের পাশে গরম মাটির উপর চাদরমুড়ি দিয়ে সে শুয়ে পড়ে।

সকালে ওর ঘুম ভাঙলে দেখে চারদিকে রোদ ঝলমল করছে। মুন্নী ডেকে বলছে—আজ কি তুমি শুয়েই থাকবে গো? এখানে এসে আরাম করে তুমি ঘুমিয়ে রয়েছ আর ওদিকে সারাটা খেত যে হতচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

হল্কু উঠে বলে—তুই কি খেত হয়ে আসছিস নাকি?

মুন্নী বলে—হ্যাঁ, সারাটা খেত ছারখার হয়ে গেছে। আরে, এমন করেও কেউ ঘুমোয় গো? তোমার তাহলে এখানে টং বানিয়ে কি লাভটা হল?

হল্কু ছুতো দেখায়—মরতে মরতে যে আমি কোনও মতে বেঁচেছি সেই যথেষ্ট। আর তুই আছিস তোর খেতের চিন্তা নিয়ে। পেটে আমার সে যে কী যন্ত্রণা, এমন অসহ্য যন্ত্রণা যে সে আমিই টের পেয়েছি।

দু'জনে খেতের আলে এসে দাঁড়ায়। দেখে, সারাটা খেত তছনছ হয়ে গেছে, জবরা মাচার নিচে চিত হয়ে শুয়ে, যেন তার ধড়ে প্রাণে নেই।

দু'জনেই খেতের হাল দেখে। মুন্নীর মুখে বেদনার ছায়া, হল্কু কিন্তু খুশি।

চিন্তিত হয়ে মুন্নী বলে—এবার মজুরি করে জমির খাজনা শুধতে হবে।

খুশিমুখে বলে হল্কু—রাতে শীতে তো আর এখানে শুতে হবে না।

প্রথম প্রকাশ : 'মান সরোবর', অক্টোবর, ১৯৩১ সাল।

সদ্‌গতি

বাড়ির দরজায় ঝাঁট দিচ্ছে দুখী চামার আর ওর বৌ ঝুরিয়া গোবর দিয়ে ঘর নিকোচ্ছে। দুজনেরই কাজ সারা হলে ঝুরিয়া দুখীকে বলে—এবার তাহলে তুই গিয়ে পণ্ডিতমশাইকে বলে আয়, উনি আবার অন্য কোথাও বেরিয়ে টেরিয়ে না যান।

দুখী—হ্যাঁ যাচ্ছি; কিন্তু ভেবে দেখ্ তো উনি বসবেন কিসে?

ঝুরিয়া—কোথাও একটা খাটিয়া কাটিয়া পাবি না? বামুনপাড়া থেকে না হয় একটা চেয়ে নিয়ে আসিস।

দুখী—তুই তো মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলিস যে শুনলে পিত্তি জলে যায়। বামুনপাড়ার ওনারা আমাকে খাটিয়া দেবে! বলে একটুকুন আগুন পর্যন্ত বাড়ি থেকে দেয় না, খাটিয়া দেবে! কুয়োর ধারে গিয়ে এক ঘটি জল চেয়ে পাই না, আর খাটিয়া দেবে! এ কি আমাদের ঘুঁটে, কঞ্চি, ভুষো কিংবা কাঠ যে যার যেমন খুশি নিয়ে চলে যাবে। নে, আমাদের খাটিয়াটাকেই ধুয়েটুয়ে রেখে দে। গরমের দিন, ঠাকুরমশাই আসতে আসতে শুকিয়ে যাবে।

ঝুরিয়া—আমাদের খাটিয়াতে উনি বসবেন না। দেখিস না কী রকম আচারে বিচারে থাকেন।

দুখী একটু চিন্তিত হয়ে বলে—তা ও তো বটে। তাহলে মহুয়া পাতা পেড়ে এনে একটা আসন বানিয়ে নিলে বোধ হয় ঠিক হয়। ওতে করে বড় বড় সব লোকেরা খায়। মহুয়া পাতা পবিত্তর। দে তো লাঠিটা, কটা পাতা পেড়ে আনি।

ঝুরিয়া—পাতা দিয়ে আসন আমি বানিয়ে রাখব'খন। তুই যা। আর হ্যাঁ, ঠাকুরমশাইকে তো সিধেও দিতে হবে। আমাদের থালাটাতে করে সিধে সাজিয়ে রেখে দেব।

দুখী—কক্ষনো অমন সব্বনাশটি করিস না। তাহলে সিধেও যাবে, থালাখানাও ভাঙবে। এক টান মেরে বাবাঠাকুর থালাখানাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। ওনার বড্ড তাড়াতাড়ি রাগ চেপে যায়, রাগ চাপলে বামুনমাকেও ছেড়ে কথা কন না; ছেলেটাকে তো এই সেদিন এমন ঠ্যাঙানি ঠেঙিয়েছেন যে বেচারা আজও ভাঙা

হাত নিয়ে ঘুরছে। পাতাতে করেই সিধে দিস। হ্যাঁ, দেখিস তুই কিন্তু কিচ্ছু ছুঁস না। ঝুরি গোঁড়ের মেয়েকে ডেকে নিয়ে সাহুর দোকান থেকে সব জিনিস নিয়ে আসিস। সিধেতে সব জিনিস যেন ঠিক থাকে। সেরখানেক আটা, আধ সের চাল, পোয়াটাক ডাল, আধপো ঘি, নুন, হলুদ দিস আর পাতার এক কোণে চার আনা পয়সাও রেখে দিস। গোঁড়ের মেয়েকে না পেলে তুই ভুজিনকে হাতে পায়ে ধরে ডেকে নিয়ে যাস। দেখিস তুই কিন্তু কিচ্ছু ছুঁবি না, তাহলে সব্বনাশ হয়ে যাবে।

সব কথা ভালো করে বুঝিয়ে পড়িয়ে দুখী লাঠিটা নিয়ে ঘাসের একটা বড়সড় গাঁটরি মাথায় নিয়ে পণ্ডিতমশাইকে খোশামুদি করতে চলল। খালি হাতে বাবাঠাকুরের সামনে যায় কোন্ মুখে। আর নজরানা বলতে ঘাস ছাড়া ওর কাছে আর কিই বা আছে। ওকে খালি হাতে দেখলে ঠাকুরমশাই দূর থেকেই যে দূর দূর করে খেদিয়ে দেবেন।

দুই

পণ্ডিত ঘাসীরাম পরম ঈশ্বরভক্ত। ঘুম থেকে উঠেই পূজার্চনা নিয়ে পড়েন। হাতমুখ ধুতে ধুতে আটটা বাজে। তারপর শুরু হয় পুজো। পুজোর প্রথম কাজ হল ভাঙ ঘোঁটা। তারপর আধ ঘণ্টা ধরে বসে চন্দন ঘষেন, আয়নার সামনে বসে একটা কাঠি দিয়ে কপালে তিলক আঁকেন। চন্দনের দুটো রেখার মাঝখানে সিঁদুরের লাল ফোঁটা কাটেন। একে একে বুকে, হাতে, চন্দনের গোল গোল মুদ্রা আঁকেন। এরপর ঠাকুরের বিগ্রহকে স্নান করান, চন্দন দিয়ে সাজান, ফুল দেন, আরতি করেন, ঘণ্টা বাজান। দশটা নাগাদ উনি পুজো সেরে ওঠেন। ভাঙের সরবৎ খেয়ে ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। ততক্ষণে দু-চারজন যজমান এসে পড়ে বাড়িতে। ঠাকুর-পুজোর ফল হাতে হাতে পেয়ে যান। এই হল ওঁর পেশা।

আজ ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে এসে উনি দেখেন দুখী চামার এক গাঁটরি ঘাস নিয়ে বসে আছে। দুখী ওঁকে দেখেই সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করে জোড়হাতে উঠে দাঁড়ায়। বাবাঠাকুরের তেজোময় মূর্তি দেখে দুখীর হৃদয় শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে। আহা কি দিব্য মূর্তি! ছোটখাট গোলগাল চেহারা, মসৃণ ভাল, প্রসন্ন বদন, ব্রহ্মতেজে প্রদীপ্ত নয়ন। সিঁদুরে আর চন্দনরেখায় দেখাচ্ছে যেন দেবতা! দুখীকে দেখে শ্রীমুখে বলে ওঠেন—আজ কি মনে করে এলি রে দুখীয়া!

দুখী মাথা হেঁট করে বলে—মেয়েটার বিয়ে দিচ্ছি বাবাঠাকুর! পাঁজিপুঁথি দেখে একটা শুভলগ্ন দেখে দিতে হবে যে। কখন দয়া হবে বাবা?

ঘাসী—আজ তো সময় হবে না রে। ঠিক আছে, না হয় সন্ধ্যে নাগাদ যাব।

দুখী—না না, বাবাঠাকুর, একটু তাড়াতাড়ি চলুন। আমি সব কিছু ঠিকঠাক করে রেখে এসেছি। এই ঘাসটা কোথায় রাখি?

ঘাসী—এই গরুটার সামনে দিয়ে দে ওটা। আর ঝাড়ুগাছা নিয়ে বাড়ির দরজায় একটু ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার করে দে তো। বৈঠকখানাটাও আজ কদিন ধরে লেপা-পোঁছা হয়নি। ওটাকে একটু গোবর দিয়ে লেপে দে। আমি ততক্ষণে সব্যটেবা সেরে নিই। তারপর একটুখানি বিশ্রাম করে নিয়ে যাব। হ্যাঁ, এই কাঠটাকেও একটু চিরে দিস তো। আর শোন্, খামারে ঝুড়ি চারেক ভুষি পড়ে আছে, ওগুলোকেও নিয়ে এসে ভুষি রাখার ঘরটায় রেখে দিস, কেমন।

দুখী সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল করতে শুরু করে দেয়। দরজায় ঝাড়ু দেয়, বৈঠকখানাকে গোবর দিয়ে নিকিয়ে দেয়। এসব কাজ সারতে সারতে বেলা বারোটা বেজে যায়। পণ্ডিতমশাই খেতে যান। দুখী সকাল থেকে কিচ্ছু খায়নি। জোর খিদে পেয়েছে ওরও; কিন্তু এখানে কে ওকে খেতে দেবে। বাড়ি এখান থেকে মাইলখানেক দূরে। বাড়িতে খেতে গেলে পণ্ডিতমশায় যদি রাগ করেন। বেচারা খিদে চেপে কাঠ চিরতে শুরু করে। মোটামতন একটা গাঁট, যার ওপর এব আগে কত না শিশু তাদের শক্তিপরীক্ষা করে সেরেছে। দুখীও একই শক্তি আর দৃঢ়তা সহকারে এই কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। দুখীর কাজ ঘাস কেটে বাজারে নিয়ে গিয়ে বেচা। কাঠ চেরাব অভ্যাস আদৌ নেই তার। ঘাস ওর খুরপির সামনে মাথা নোয়ায়। দুখী জোরে জোরে কুড়ুলের কোপ মারে, গাঁটে কিন্তু আঁচড়টুকুও পড়ে না। কুড়ুল ঠিকরে যায়। ঘেমে নেয়ে ওঠে দুখী, হাঁপাতে থাকে, অবসন্ন হয়ে বসে পড়ে, আবার উঠে দাঁড়ায়। হাত ওঠাতে গিয়ে ওঠাতে পারে না। পা দুটো কাঁপে, কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারে না। চোখে আঁধার ঘনিয়ে আসে, মাথা ঝিম ঝিম করে। তবুও সে কাজ করে চলে। ভাবে এক ছিলিম তামাক যদি টানতে পেতাম তাহলে হয়ত একটু তাগদ পেতাম। কিন্তু কলকে তামাক এখানে পাব কোথায়। বামুনদের পাড়া। বামুনরা তো আর আমাদের নীচু জাতের মতন তামাক খায় না। হঠাৎ খেয়াল হয় এ গাঁয়ে তো এক ঘর গোঁড়ও আছে। ওর কাছে ঠিকই কল্কে তামাক পাওয়া যাবে। সঙ্গে সঙ্গে দুখী ছোটে ওর বাড়ি। যাক পরিশ্রম সার্থক হয়—সে তামাক দেয়, কল্কে দেয়। কিন্তু আগুন পাওয়া গেল না সেখানে। দুখী বলে- আগুনের জন্য ভেবো না ভাই! আমি যাচ্ছি, পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়ি থেকে চেয়ে নেব। ওঁর বাড়িতে তো এই একটু আগেও রান্না হচ্ছিল।

বলে জিনিস দুটো নিয়ে দুখী চলে আসে। পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়ির দেউড়িতে দাঁড়িয়ে ডাকে—বাবাঠাকুর, একটুন আগুন যদি পেতাম তাহলে এক ছিলিম তামাক টেনে নিতাম।

পণ্ডিতমশাই খেতে বসেছেন। বামুনগিন্নী জিজ্ঞেস করেন—আগুন চাইছে কে এটা?

পণ্ডিত— আরে ঐ শালা দুখিয়া চামার। ওকে বলেছি কাঠটাকে একটু চিরে দিতে আগুন তো রয়েছে, দাও না একটু।

বামুনগিন্নী ভুরু কুঁচকে বলে ওঠেন—পুঁথিপত্তরের ফেরে পড়ে ধরম করম সব কিছুর তো মাথা খেয়ে বসে আছ। চামার হোক, ধোপা হোক, নাপিত হোক মাথা উঁচু করে একেবারে ভেতর বাড়িতে চলে আসবে। এ যেন হিন্দুর বাড়ি নয়, একটা সবাইখানা। বলে দাও পোড়ারমুখোকে চলে যেতে, না হলে এই পোড়াকাঠ দিয়ে মুখ পুড়িয়ে দেব। আগুন চাইতে এসেছে!

পণ্ডিতমশাই বুঝিয়ে বলেন – ভেতরে চলে এসেছে তো কি হয়েছে? তোমার তো কোন কিছু ছোঁয়নি। মাটি হল পবিত্র। একটুখানি আগুন দিয়ে দিচ্ছ না কেন? কাজটা তো আমাদেরই করছে। কোন মজুর লাগিয়ে এই কাঠ চেলাতে গেলে কম করে চার আনা পয়সা তো নিত।

বামুনগিন্নী মুখঝামটা দিয়ে বলেন—ওটা বাড়িতে ঢুকেছে কেন?

হার মেনে বলেন পণ্ডিতমশাই—শালার কপাল খারাপ এ ছাড়া আর কি?

বামুনগিন্নী– বেশ, এবারের মত আগুন দিয়ে দিচ্ছি; কিন্তু আবার যদি এভাবে কোন ব্যাটা বাড়িতে ঢোকে তো তার মুখে নুড়ো জ্বেলে দেব।

সব কথাই কানে আসে দুখীর। মনে মনে পস্তাচ্ছে—কেন যে শুধু শুধু এলাম। সত্যি কথাই তো। বামুনপণ্ডিতের বাড়ির ভেতরে চামার ঢোকে কি করে। বড় পবিত্তর এনারা, তাই তো দুনিয়ার সবাই এত খাতির করে, তাই তো এত মান্যিগন্যি। মুচি-চামার তো নয়। এই গাঁয়েই বুড়ো হলাম আর এ আক্কেলটুকুন হল না আমার।

তাই বামুনগিন্নী আগুন নিয়ে বেরুলে দুখী যেন হাতে স্বর্গ পায়। জোড়হাত করে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বলে—মা ঠাকরুণ, বড় ভুল হয়ে গেছে গো। বাড়ির ভেতরে চলে এসেছি। চামারের বুদ্ধি তো মা! এতটা মুখ্যুসুখ্যু যদি নাই হব, তাহলে লাথিঝাঁটা খাব কেন?

বামুনগিন্নী চিমটে দিয়ে ধরে আগুন এনেছেন। হাত পাঁচেক দূরে দাঁড়িয়ে ঘোমটার আড়াল থেকে আগুনটাকে দুখীর দিকে ছুঁড়ে দেন। বড় একটা আগুনের টুকরো এসে দুখীর মাথায় পড়ে। তাড়াতাড়ি পিছু হটে সে মাথা ঝাঁকায়। তার মন বলে ওঠে—এ হল গে একটি পবিত্তর বামুনের বাড়িকে অপবিত্তর করার সাজা। ভগবান হাতে হাতে সাজা দিয়ে দিয়েছেন। এজন্যেই তো সারা দুনিয়া বামুনদের এত ভয় করে; আর অন্য সব লোকের টাকা পয়সা মার যায়। কই বামুনদের পয়সা মেরে নিক তো কেউ। গুষ্টিসুদ্ধু সবার সব্বনাশ হয়ে যাবে না, পা পচে পচে খসে পড়বে না!

বাইরে এসে সে তামাক খায়, তারপর আবার কুড়ুল নিয়ে কাজে লেগে পড়ে।

খট.খট আওয়াজ আসতে থাকে।

ওর গায়ে আগুন পড়েছে, তাই বামুনঠাকরুনের একটু মায়া হয় দুখীর উপর। পণ্ডিতমশাই খেয়ে উঠলে বলেন—চামারটাকে একটু কিছু খেতেটেতে দাও, বেচারা সেই কখন থেকে কাজ করছে, হয়ত খিদে পেয়েছে।

পণ্ডিতমশাই এই প্রস্তাবটার বাস্তব দিকটা উপলব্ধি করে জিজ্ঞেস করেন—রুটি আছে?

পণ্ডিতগিন্নী—দু'চারখানা হয়ত বেঁচে যাবে।

পণ্ডিত—দু'চারখানা রুটিতে কি হবে? ব্যাটা চামার, কম করে সেরখানেক তো গিলবে।

পণ্ডিতগিন্নী কানে হাত দিয়ে বলেন—ওরে বাপ রে! সেরখানেক! তাহলে থাকগে।

পণ্ডিতমশাই এবার উল্টো চাপ দেন, বলেন—কিছু ভুষি-টুষি থাকলে আটার সঙ্গে মিশিয়ে দুখানা মোটা চাপাটি সেঁকে দাও না, শালার পেট ভরে যাবে। ঐ পাতলা পাতলা রুটিতে এসব ছোটলোকের পেট ভরে না। এদের তো জোয়ারের মোটা চাপাটি চাই।

পণ্ডিতগিন্নী বলেন—ছাড়ো তো, এই দুপুর রোদে কে মরতে ওসব করে।

তিন

দুখী তামাক খেয়ে আবার কুড়ুল নেয়। দম নিয়ে হাতে একটু জোর পায়। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে একনাগাড়ে কুড়ুল চালিয়ে যায়। তারপর অবসন্ন হয়ে সেখানেই মাথাটা চেপে ধরে বসে পড়ে।

এর মধ্যে গোঁড় এসে পড়ে। বলে—কেন জানটা খোয়াচ্ছ বুড়ো দাদা। তোমার কোপানিতে এই গাঁট ফাটবে না। শুধু শুধু হয়রাণ হচ্ছ।

কপালের ঘাম মুছে বলে—এখনো একগাড়ি ভুষি বয়ে আনতে হবে রে ভাই।

গোঁড়—খেতে টেতে কিছু দিয়েছে কি, না শুধু কাজই করিয়ে চলেছে। গিয়ে চেয়ে-টেয়ে নিচ্ছ না কেন?

দুখী—বলছ কি চিখুরী! বামুনের অন্ন কি আমাদের পেটে হজম হবে?

গোঁড়—হজম তো ঠিকই হবে, আগে পাও তো। গোঁফে তা দিয়ে খেয়ে নিয়েছে তারপর এখন তোমাকে কাঠ চেরার হুকুম দিয়ে আরাম করে ঘুমুচ্ছে। জমিদারও তো কিছু না কিছু খেতে দেন। হাকিমও বেগার খাটালে কিছু না কিছু মজুরী দেন। ইনি ওঁদেরও ছাড়িয়ে গেছেন। তার উপর নিজেকে ধার্মিক বলে জাহির করেন।

দুখী—আস্তে আস্তে বল্ রে ভাই, শুনে-টুনে ফেললে বিপদ হবে।

বলে দুখী আবার তৈরী হয়ে কুড়ুল চালাতে থাকে। দেখে চিখুরীর দয়া হয়। এগিয়ে এসে ওর হাত থেকে কুড়ুলখানা কেড়ে নিয়ে একনাগাড়ে আধঘণ্টা খুব জোরেজোরে

কুড়ুল চালায়, কিন্তু গাঁটে একটুখানি ফাটও ধরে না। কুড়ুলটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে বলতে বলতে যায়—এ গাঁট চেরা তোমার কম্মো না, চাই কি জানটাই দিয়ে দাও না কেন।

দুখী ভাবে বাবাঠাকুর এই গাঁটটা পেলেন কোথায় যাকে এত কুপিয়েও চেরা যাচ্ছে না। কোথাও একটুখানি চিড় পর্যন্ত খাচ্ছে না। আমি কতক্ষণ ধরে কোপাব এটাকে? ওদিকে বাড়িতে এখনও শতেক কাজ পড়ে রয়েছে। কাজকম্মের বাড়ি, একটা না একটা কাজ তো লেগেই আছে। কিন্তু এতে কার কি মাথাব্যথা। যাই ততক্ষণে না হয় ভুষিগুলোই নিয়ে আসি। বলব, বাবাঠাকুর, আজ তো কাঠ চিরতে পারলাম না, কাল এসে না হয় চিরে দেব।

ঝুড়ি মাথায় করে দুখী ভুষি বয়ে আনে। বাড়ি থেকে খামার দু'ফার্লংয়ের কম নয়। খুব চাপাচাপি করে ঝুড়ি যদি ভরে আনতে পারত তাহলে কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেত বটে, কিন্তু মাথায় তুলে দেবে কে ঝুড়ি। পুরোপুরি ভরতি ঝুড়িকে একা ও মাথায় তুলতে পারে না। তাই অল্প অল্প করেই আনে। চাবটে নাগাদ ভুষি আনা তার শেষ হয়। পণ্ডিতমশাইয়েরও ঘুম ভাঙে। মুখ হাত ধুয়ে, পান খেয়ে বাইরে আসেন। দেখেন ঝুড়ির উপর মাথা রেখে দুখী ঘুমুচ্ছে। জোরে হাঁক দেন—ওরে ও দুখিয়া! বলি, তুই ঘুমুচ্ছিস? কাঠ তো এখনো যেমনকার ঠিক তেমনি পড়ে রয়েছে। এতক্ষণ তুই করছিলি কি? একমুঠো ভুষো আনতেই দিন কাবার করে ফেললি। তার উপর আবার পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিস। নে নে, তোল্ কুড়ুল। কাঠটা চিরে দে। তোকে দিয়ে একটুখানি কাঠ চেরানোও যায় না। বেশ! লগনও তাহলে তেমনি বের হবে, আমাকে কিন্তু তখন দুষতে পাববি না। সাধে বলে, ছোট জাতের ঘরে খাবার জুটল তো ব্যস ওদের মতিও পালটে গেল।

দুখী আবার কুড়ুল হাতে নেয়। যে কথা বলবে বলে ভেবে রেখেছিল, সে সব ভুলে যায়। পেট পিঠে লেগে গেছে। সেই সকাল থেকে আজ জলটুকু পর্যন্ত খায়নি। সময়ই পায়নি। উঠে দাঁড়াতেই কষ্ট হচ্ছে। দেহ বসে যাচ্ছে। তবু মনটাকে শক্ত করে উঠে দাঁড়ায়। পণ্ডিতমশাই উনি, শুভ সময়টা ঠিকমত যদি না দেখে দেন, তাহলে হয়ত সব্বনাশ হয়ে যাবে। এজন্যেই তো সংসারে এত খাতির এত মান। শুভ মুহূর্তেরই তো সব খেলা। যাকে ইচ্ছে শেষ করে ফেলবে। পণ্ডিতমশাই কাঠটার কাছে এসে দাঁড়ান, আর উৎসাহ দিয়ে যান—মার্ কষে, আবার মার্—কষে মার্—কি রে মার না রে জোরে—তোর হাতে তো যেন জোরই নেই—লাগা কষে, দাঁড়িয়ে ভাবছিস কি হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যস্ এই তো ফাটল বলে। দে দে, ঐ ফাটলতাতেই আবার দে।

দুখীর হুঁশ থাকে না। না জানি কী এক গুপ্তশক্তি ওর বাহু দুটিতে ভর করে। ক্লান্তি, অবসাদ, ক্ষুধা সবই যেন উবে যায়। নিজের বাহুবলে নিজেই অবাক। এক একটি আঘাত পড়ছে যেন বজ্রের মত। আধ ঘণ্টা ধরে উন্মাদের মত সে কুড়ুল চালিয়ে যায়। শেষে কাঠখানাও মাঝখান দিয়ে ফেটে যায়। সেই সঙ্গে দুখীর হাত থেকে কুড়ুলটাও ছিটকে পড়ে। মাথা ঘুরে পড়ে যায় দুখী। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় ক্লান্ত অবসন্ন শরীর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

পণ্ডিতমশাই ডাকেন—নে রে, উঠে দু'চার কোপ আরও দিয়ে দে। পাতলা পাতলা চেলি হয়ে যাবে। দুখী ওঠে না। পণ্ডিত মশাইও আর ওকে এখন বিরক্ত করা উচিত মনে করেন না। ভেতরে গিয়ে ভাঙের সরবৎ খান, শৌচকর্ম সারেন, স্নান করেন, তারপর পণ্ডিতমশাইয়ের পোশাকে সেজেগুজে বাইরে আসেন। দেখেন দুখী তখনো একইভাবে পড়ে রয়েছে। পণ্ডিতমশাই জোরে ডাক দেন—অ্যাই দুখী, তুই কি শুয়েই থাকবি রে, চল তোর বাড়িতেই যাচ্ছি। সব জিনিসটিনিস ঠিকঠাক যোগাড় করে রেখেছিস তো? দুখী কিন্তু তবু ওঠে না।

এবার পণ্ডিতমশাইয়ের মনে ভয় হয়। কাছে গিয়ে দেখেন, দুখী টাননান হয়ে পড়ে আছে। ভড়কে গিয়ে ভেতরে ছোটেন, গিয়ে বামুনগিন্নীকে বলেন—দুখিয়াটা মনে হচ্ছে মরে গেছে।

পণ্ডিতগিন্নী হকচকিয়ে বলেন—সে কি! এক্ষুণি তো ও কাঠ চিরছিল না।

পণ্ডিত—হ্যাঁ, কাঠ চিরতে চিরতে মরে গেছে। সর্বনাশ হয়েছে, এখন কি হবে?

পণ্ডিতগিন্নী ঠাণ্ডা গলায় বলেন—কি আবার হবে, চামার বস্তিতে খবর পাঠিয়ে দাও যেন মড়া তুলে নিয়ে যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যে সারা গাঁয়ে খবর রটে যায়। বামুনদেরই ঘর সব। কেবল এক ঘর গোঁড়। ওদিকের রাস্তা দিয়ে হাঁটা সবাই ছেড়ে দেয়। কুয়োতে যাবার রাস্তা ওদিক দিয়েই, জল আনবে কি করে। চামারের মড়ার পাশ দিয়ে জল আনতে যাবে কে? এক বুড়ি গিয়ে পণ্ডিতমশাইকে বলে—এখনো মড়াটা ফেলাচ্ছ না যে। গাঁয়ে কেউ জলটল খাবে না নাকি!

এদিকে চিখুরী চামার বস্তীতে গিয়ে সবাইকে সাবধান করে দিয়ে আসে—খবরদার, মড়া আনতে তোরা কেউ যাবি না। এক্ষুনি পুলিস আসবে, তদন্ত হবে। মজা পেয়েছে নাকি যে একটি গরীব বেচারাকে এভাবে পরাণে মেরে ফেলবে। পণ্ডিতই হোন আর যেই হোন সে তো নিজের কাছে। লাশ যদি তোরা আনিস তবে পুলিস তোদেরও বেঁধে নিয়ে যাবে।

তার পর পরই পণ্ডিতমশাই গিয়ে পৌঁছান। কিন্তু চামারবস্তির কোনও লোক লাশ

তুলে আনতে রাজী হয় না। শুধু দুখীর বউটা আর মেয়েটা হাহাকার করতে করতে ছুটে যায়। পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়ির দরজায় গিয়ে ওরা কপাল চাপড়ে চাপড়ে ডুকরে কাঁদতে থাকে। ওদের সঙ্গে আরও পাঁচ-দশটি চামার মেয়েছেলে—কেউ কাঁদছে, কেউ বা ওদের সান্ত্বনা দিচ্ছে। চামার বেটাছেলে নেই কেউ। পণ্ডিতমশাই চামারদের উপরে অনেক চোটপাট করেন,কত বোঝান, কাকুতি-মিনতি করেন, কিন্তু চামারদের সবার মনে পুলিসের ভয় এতটা ছড়িয়ে পড়েছে যে একজনও রাজী হয় না। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে উনি ফিরে আসেন।

চার

মাঝরাত পর্যন্ত কান্নাকাটি চলে। ব্রাহ্মণ দেবতাদের পক্ষে ঘুমোনো মুশকিল হয়ে পড়ে। লাশ নিয়ে যেতে কোনও চামারই আসে না। এদিকে বামুনরাই বা চামারের মড়া ছোঁবে কি করে। এমন কথাও কি কোন শাস্ত্র-পুরাণে লেখা আছে? কই, দেখিয়ে দিক তো কেউ!

পণ্ডিতগিন্নী গজর গজর করেন—এই ডাইনীগুলো তো মাথা খেয়ে ফেললে। এগুলোর গলাও ব্যথা করে না!

পণ্ডিতমশাই বলেন—কাঁদুক পেত্নীগুলো, কতক্ষণ কাঁদবে? যদ্দিন বেঁচে ছিল, কেউ একবার পোঁছেওনি। মরে গেছে, এখন চিল্লাচিল্লি করতে সব কটা এসে জুটেছে।

পণ্ডিতগিন্নী—চামারের কান্না অলক্ষুণে নাকি গো?

পণ্ডিত—হ্যাঁ, বড্ড অমঙ্গলের।

পণ্ডিতগিন্নী—এখন থেকেই গন্ধ বেরুচ্ছে।

পণ্ডিত—চামার তো শালা! খাদ্যাখাদ্যের কি কোনও বাছবিচার আছে ওগুলোর?

পণ্ডিতগিন্নী—ওগুলোর ঘেন্নাও করে না।

পণ্ডিত—সব কটা ভ্রষ্ট।

রাত তো কাটল কোনও মতে, কিন্তু সকালেও কোনও চামার এল না। চামার মেয়েছেলেরাও কেঁদেকেটে চলে গেছে। দুর্গন্ধ একটু একটু করে ছড়াতে শুরু করেছে। পণ্ডিতমশাই একগাছি দড়ি নিয়ে আসেন। দড়ির ফাঁস বানিয়ে মড়ার পায়ে ছুঁড়ে দেন। তারপর টান মেরে ফাঁসটা কষে নেন। আবছা আবছা অন্ধকার। পণ্ডিতমশাই দড়ি ধরে লাশটাকে টানতে শুরু করেন। টানতে টানতে গাঁয়ের বাইরে টেনে নিয়ে যান। সেখান থেকে ফিরে এসে চটপট স্নান করে নেন, চণ্ডীপাঠ করেন। তারপর সারা বাড়িতে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেন।

ওদিকে দুখীর লাশটাকে শেয়াল, শকুনে, কুকুরে আর কাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। তার আজীবন ভক্তি, সেবা আর ধর্মনিষ্ঠার পুরস্কার।

লেখকের সবশেষ গল্প। প্রথম প্রকাশ: ১৯৩৬ সালে, 'জামিয়া'-য় প্রকাশ

কফন

এক

ঝুপড়ির দরজায় বাপ-বেটা দু'জনে নিভে যাওয়া আগুনটার সামনে চুপচাপ বসে। ওদিকে ঘরের ভেতরে ছেলের জোয়ান বউ বুধিয়া প্রসববেদনায় আছাড়পাছাড় খাচ্ছে। থেকে থেকে ওর মুখ দিয়ে এমন কলজে-কাঁপানো আওয়াজ আসছে যে ওরা দু'জন বুকে পাথর চেপে কোনও মতে তা সহ্য করছে। শীতের রাত, প্রকৃতি নিস্তব্ধতায় ডুবে আছে। সমস্ত গ্রামখানা অন্ধকারে মিশে গেছে।

ঘিসু বলে—"মনে হচ্ছে বাঁচবে না। সারাটা দিন দৌড়ঝাঁপ করেই কাটল। যা না, গিয়ে একবারটি দেখে আয় না।"

মাধব খেপে গিয়ে বলে—"মরবেই যদি তো তাড়াতাড়ি মরে না কেন? দেখে করবটা কী?"

"পরাণে তোর একটুও দরদ নাই রে। সারাটা বছর যার সঙ্গে সুখে শান্তিতে ঘর করলি, তার সঙ্গেই অমন বেইমানী!"

"তা আমি যে ওর ছটফটানি আর হাত পা ছোঁড়া চোখে দেখতে পারছি না।"

চামার-বাড়ি; সারা গাঁয়ে ওদের বদনাম। ঘিসু একদিন কাজে যায় তো তিনদিন ঘরে বসে থাকে। মাধবটা কাজে এত ফাঁকিবাজ যে আধঘণ্টা কাজ করে তো একঘণ্টা বসে বসে ছিলিম টানে। তাই ওরা কোথাও মজুরি পায় না। ঘরে যদি একমুঠো খাবার থাকে তো ব্যস ওরা যেন কাজ না করার শপথ নেয়। দু'চারটে উপোস দেবার পর ঘিসু গাছে উঠে কাঠকুটো ভেঙে আনে আর মাধব বাজারে গিয়ে সেগুলোকে বেচে আসে; তারপর যতক্ষণ সে পয়সা হাতে থাকে দু'জনে টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। আবার যখন উপোস করার হাল হয়, তখন আবার হয় কাঠকুটো কুড়িয়ে আনে কিংবা জনমজুরির খোঁজে বের হয়। গাঁয়ে কাজের কমতি নেই। চাষাভুষোর গাঁ, খেটে খাওয়া মানুষের হাজার রকমের কাজ। তবু ওদের

দু'জনকে লোকে কেবল তখনি ডাকে যখন দু'জনের মজুরী দিয়ে একজনের কাজ-টুকুতেই সন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকে না। এ দু'জন যদি সাধু-সন্ন্যেসী হত, তবে সন্তোষ এবং ধৈর্যের জন্য কোন সংযম-নিয়মেরই আবশ্যকতা হত না, কারণ এসব তো ছিল ওদের স্বভাবজাত। ছন্নছাড়া অদ্ভুত জীবন। ঘরে দুচারখানা মাটির বাসন ছাড়া সম্পত্তি বলতে আর কিচ্ছু নেই। ছেঁড়া কাপড় পরে নিজেদের নগ্নতাকে কোনমতে ঢেকে জীবন কাটায়। সংসারের সব রকমের ভাবনাচিন্তা থেকে মুক্ত। ঋণে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। গালাগালি খায়, মারধোরও খায়, তবুও কোনও দুঃখ নেই। গরীব এত যে পরিশোধের আশা লেশমাত্র নেই জেনেও সবাই ওদের কিছু না কিছু ধার দেয়। মটর বা আলুর সময় অন্যের ক্ষেত থেকে মটর কিংবা আলু চুরি করে তুলে নিয়ে এসে সেগুলোকে ভেজে বা পুড়িয়ে খেয়ে নেয়; কিংবা পাঁচ দশ গাছা আখ ভেঙে এনে রাতের বেলা বসে বসে চোষে। ঘিসু এই রকম আকাশবৃত্তিতেই ষাট ষাটটা বছর কাটিয়ে দিয়েছে; আর মাধবও বাপের বেটার মত তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে; বরং বলা চলে বাপের নামকে আরও উজ্জ্বল করে চলেছে। এই যে এখন দুজনে আগুনের সামনে বসে আলুগুলো পোড়াচ্ছে তাও কারু না কারু খেত থেকে তুলে আনা। ঘিসুর বউটা তো অনেকদিন আগেই দেহরক্ষা করেছে। মাধবের বিয়ে হয়েছে এই গত বছর। যেদিন থেকে এই মেয়েটি এদের ঘরে এসেছে, সে এই পরিবারে একটা শৃঙ্খলা এনেছে। গম পিষেই হোক বা ঘাস তুলেই হোক সেরটাক আটার যোগাড় সে ঠিক করে নিত আর এই বেহায়া দুটোকে পিণ্ডি গেলাত। মেয়েটা ঘরে আসার পর এরা দু'জন আরও আলসে আরও আরামপ্রিয় হয়ে উঠেছিল; বরং বলা চলে ওদের গুমরও যেন বেড়ে গিয়েছিল কেউ কাজ করতে ডাকলে ইদানীং বিনা দ্বিধায় দুনো মজুরি হেঁকে বসত। এই মেয়েটিই আজ এদিকে প্রসববেদনায় মরে যাচ্ছে আর এরা দু'জন বোধ করি অপেক্ষা করে আছে যে ও চোখ বুজলে আরাম করে ঘুমোতে পাবে।

ঘিসু আলু বের করে খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বলে, "গিয়ে দেখ্ তো কি অবস্থা বেচারীর! পেত্নীর নজর লেগেছে, তাছাড়া আর কি? এসব ঝাড়াতে টাড়াতে তো ওঝা কম করেও একটা টাকা চাইবে।"

মাধবের ভয় ওঘরে ঢুকলে ঘিসু আলুগুলোর বেশির ভাগটা না সাবাড় করে দেয়। বলে—"ওর কাছে যেতে আমার ভয় করছে।"

"ভয় কিসের রে, আমি তো এখানে রয়েছিই!"

"তাহলে তুইই গিয়ে দেখ্ না।"

"আমার বউ যখন মারা গিয়েছিল; আমি তিনদিন ওর কাছ থেকে নড়িনি। আর

তাছাড়া আমাকে দেখলে ও লজ্জা পাবে না? কোনদিন যার মুখ দেখিনি, আজ ওর উদলা গা দেখব! ওর তো এখন গা-গতরের হুঁশ-টুশও নেই। আমাকে দেখে ফেললে ভালো করে হাত-পাও যে ছুঁড়তে পারবে না।"

"আমি ভাবছি যদি বাচ্চাটাচ্চা হয়ে পড়ে তাহলে কি হবে? শুঁঠ, গুড়, তেল কিছুই তো ঘরে নেই।"

"সবই এসে যাবে। ভগবান দিক তো! যারা এখন একটা পয়সা দিচ্ছে না, তারাই কালকে যেচে এসে টাকা দেবে। আমার ন' ন'টা ছেলে হয়েছে, ঘরে তো কোনদিন কানাকড়িও ছিল না, তবু ভগবান কোনও না কোনও মতে কাজ তো চালিয়ে দিয়েছেন।"

যে সমাজে দিনরাত খেটে খাওয়া মানুষের হাল ওদের চাইতে বেশী কিছু ভালো নয়, যেখানে চাষীদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে যারা মুনাফা লোটে তারাই চাষীদের চেয়ে অনেক বেশী সংগতিপন্ন, সে সমাজে এ ধরনের মনোবৃত্তির সৃষ্টি হওয়া কিছু একটা অবাক হবার মত কথা নয়। বরং বলব ঘিসু চাষীদের চাইতে ঢের বেশী বুদ্ধিমান তাই সে নির্বোধ চাষীদের পালে না ভিড়ে আড্ডাবাজদের কুৎসিত দলে গিয়ে জুটেছিল। তবে হ্যাঁ, ওর মধ্যে এতটা ক্ষমতা ছিল না যে আড্ডাবাজদের নিয়মকানুন ঠিকঠাক রপ্ত করে। তাই ওর দলভুক্ত অন্য সবাই যেখানে গাঁয়ের মাতব্বর কিংবা মোড়ল হয়ে গেছে, সেখানে সারা গাঁ ওর নিন্দে করে। তবু এ সান্ত্বনটুকু ওর আছে যে ওর হাঁড়ির হাল খারাপ হলেও অন্ততঃপক্ষে ওকে ওসব চাষীদের মত হাড়ভাঙা খাটুনি তো খাটতে হয় না। ওর সরলতা এবং নিরীহতা থেকে অন্যরা অনুচিত মুনাফা তো লুটতে পারছে না।

দু জনে আলু বের করে করে গরম গরম খেয়ে চলে। কাল থেকে পেটে কিচ্ছু পড়েনি। তাই আলু ঠাণ্ডা হবার তর সইছে না। ফলে বারকয়েক দু'জনেরই জিভ পুড়ে যায়। খোসা ছাড়ালে আলুর ওপরটা তো খুব বেশি গরম বলে মনে হয় না, কিন্তু দাঁতের নিচে পড়া মাত্রই ভেতরটা জিভ, গলা আর টাকরাকে পুড়িয়ে দেয়। ঐ অঙ্গারটাকে তখন মুখে রাখার চাইতে অনেক বেশি ভালো সেটাকে ভেতরে পাচার করে দেওয়া। সেখানে ওটাকে ঠাণ্ডা করার মত যথেষ্ট বস্তু রয়েছে। তাই দু'জনে কপকপ গিলে ফেলছে। যদিও এ করতে গিয়ে ওদের চোখে জল এসে পড়ছে।

খেতে খেতে জমিদারের বিয়েতে সেই বরযাত্রী যাবার কথা ঘিসুর মনে পড়ে যায়। বছর কুড়ি আগে সে ঐ বরযাত্রী গিয়েছিল। ওই ভোজ খেয়ে যে তৃপ্তি সে পেয়েছিল তা তার জীবনে একটা মনে রাখার মত ঘটনা, আর আজও সে স্মৃতি তার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। বলে—"ঐ ভোজের কথা ভুলতে পারি না। তারপর সারা

জীবনে অমন খাবার আর পেট পুরে খাইনি। মেয়ের বাড়ির লোকেরা সবাইকে পেট ভরে পুরি খাইয়েছিল, সব্বাইকে! ছোট বড় সবাই পুরি খেয়েছিল, একেবারে খাঁটি ঘিয়ে ভাজা! চাটনি, রায়তা, তিন রকমের শুকনো তরকারী, একটা ঝোল, দই চাটনি, মিষ্টি। কি বলব ঐ ভোজে সেদিন কী আস্বাদ পেয়েছিলাম! কোনও নিষেধ মানা ছিল না। যে জিনিস যত খুশি চেয়ে নাও, যত চাই খাও। সবাই অ্যাত্ত অ্যাত খেয়েছিল যে কেউ জল পর্যন্ত খেতে পারেনি। হলে হবে কি পরিবেশকরা পাতে গরম গরম, গোল গোল, সুগন্ধি কচুরী দিয়েই চলছিল। যত মানা করি যে আর চাই না পাতের ওপর হাত চাপা দিয়ে রাখি, কিন্তু তবু ওরা দিয়ে যাচ্ছিল তো যাচ্ছিলই। তারপর যখন আঁচিয়ে এলাম, তখন পান-এলাচও পেয়েছিলাম কিন্তু আমার তখন পান খাবার হুঁশ কোথায়। দাঁড়িয়ে থাকতেই পারছিলাম না। চটাপট গিয়ে আমার কম্বল পেতে শুয়ে পড়েছিলাম। এত দিলদরিয়া ছিলেন ওঁরা।"

মাধব মনে মনে জিনিসগুলোর স্বাদ কল্পনা করতে করতে বলে—"আজকাল কেউ তো আর আমাদের অমন ভোজ খাওয়ায় না।"

"আজকাল আর খাওয়াবে কে, খাওয়াবেই বা কি? ঐ জমানাটাই ছিল আলাদা। এখন তো সবাই পয়সা বাঁচানোর ধান্দাতেই আছে। বিয়ে-সাদিতে খরচ করো না, ক্রিয়া-করমে খরচ করো না। বলি গরীবগুলানের পয়সা লুটে লুটে রাখবি কোথায়? লুটবার বেলায় ক্ষ্যামা নেই, শুধু খরচের বেলাতেই যত হিসাব।"

"তুমি খান বিশেক পুরি খেয়েছিলে বোধহয়?"

"বিশখানার বেশিই খেয়েছিলাম।"

"আমি হলে পঞ্চাশখানা সেঁটে ফেলতাম।"

"খান পঞ্চাশের কম আমিও খাইনি। তাগড়া জোয়ানমদ্দ ছিলাম। তুই তো আমার আদ্দেকও নোস।"

আলু খাওয়া হয়ে গেলে দু'জনেই জল খেয়ে ওখানেই আগুনের সামনে কাপড়ের খুঁট গায়ে জড়িয়ে পেটে পা গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ে। যেন দুটো বড় বড় অজগর কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে।

ওদিকে বুধিয়া তখনও সমানে ককিয়ে চলেছে।

২

সকালে ঘরে ঢুকে মাধব দেখে বউটা তার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ওর মুখের ওপর মাছি ভন্‌ভন্ করছে। পাথরের মত স্থির নিশ্চল দু'টি চোখ ওপরদিকে চেয়ে রয়েছে। সমস্ত শরীর ধুলোয় মাখামাখি। ওর পেটে বাচ্চাটা মরে গেছে।

মাধব ছুটতে ছুটতে ঘিসুর কাছে যায়। তারপর দু'জনে জোরে জোরে হাহাকার

করতে করতে বুক চাপড়াতে থাকে। পাড়াপড়শীরা কান্নাকাটি শুনে ছুটতে ছুটতে আসে এবং চিরাচরিত রীতি অনুসারে এই হতভাগ্য দু'জনকে সান্ত্বনা দেয়।
কিন্তু বেশি কান্নাকাটির সময় নেই। শবাচ্ছাদনের নতুন কাপড় আর কাঠের ভাবনা ভাবতে হবে। এদিকে ঘরে পয়সা তো যেমন চিলের বাসায় মাংস তেমনি শূন্য। বাপ-বেটা দু'জনে কাঁদতে কাঁদতে গাঁয়ের জমিদারের কাছে যায়। উনি এই দু'জনের মুখই দেখতে পারেন না। বার কয়েক এ দু'জনকে নিজের হাতে পিটুনি দিয়েছেন চুরি করেছে বলে কিংবা কথা দিয়ে ঠিকমত কাজে আসেনি বলে। জিজ্ঞেস করেন—'কি হয়েছে রে ঘিসুয়া, কাঁদছিস কেন? আজকাল তো কোথাও তোর দেখা মেলা ভার। মনে হচ্ছে যেন এ গাঁয়ে থাকার তোর ইচ্ছে নেই।"
ঘিসু মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে জলভরা চোখে বলে—"কত্তামশায় গো! বড় বিপদে পড়েছি! মাধবের বউটা কাল রাতে মরে গেছে। সারাটা রাত ছটফট করেছে, কর্তা! আমরা দু'জন ওর শিয়রে বসে ছিলাম। ওষুধবিষুদ যদ্দূর পেরেছি, সব করেছি। তবুও বউটা আমাদের দাগা দিয়ে গেল, কত্তা! একখানা যে রুটি করে খাওয়াবে এমন কেউ আর রইল না। কত্তাবাবু! একেবারে পথে বসেছি। সংসারটা ছারখার হয়ে গেল, হুজুর। হুজুরের গোলাম আমরা। এ বিপদে হুজুর আপনি ছাড়া কে ওর ঘাটের দায় উদ্ধার করবে? আমাদের হাতে যা কিছু দু'চার পয়সা ছিল, সব ওষুধ আর পথ্যিতে শেষ হয়ে গেছে। হুজুর যদি দয়া করেন তাহলেই ওকে ঘাটে তুলতে পারব। আপনি ছাড়া আর কার দোরে গিয়ে হাত পাতব হুজুর!"
জমিদারবাবু দয়ালু। তবে ঘিসুকে দয়া করার মানে তো ভস্মে ঘি ঢালা। ইচ্ছে হল বলে দেন—ভাগ, দূর হ সামনে থেকে। এমনিতে তো ডেকে পাঠালেও আসিস না। আজ গরজ পড়েছে, তাই এসে খোশামোদ করছিস। হারামজাদা, বদমাস কোথাকার! কিন্তু রাগ করার বা সাজা দেবার সময় এখন নয়। মনে মনে গজগজ করতে করতে দুটো টাকা বের করে ছুঁড়ে দেন। সান্ত্বনার একটি কথাও মুখ দিয়ে বের হয় না। ওর দিকে ফিরেও তাকান না, যেন ঘাড় থেকে আপদ দূর করেন।
জমিদারমশাই যখন দু'টাকা দিয়েছেন, তখন গাঁয়ের বেনে মহাজনেরা নিষেধ করে কি করে! ঘিসু জমিদারের নামের ঢাক পেটাতেও খুব ওস্তাদ। ওরা কেউ দেয় দু'আনা, কেউ চার আনা। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ঘিসুর হাতে টাকা পাঁচেকের মত পুঁজি যোগাড় হয়ে যায়। এছাড়া কেউ গমটম দেয়, কেউ বা কাঠ। তারপর দুপুরবেলা ঘিসু আর মাধব বাজার থেকে কফনের জন্য নতুন কাপড় আনতে যায়।

এদিকে অন্তরা বাঁশ কাটতে শুরু করে।

গাঁয়ের কোমলমনা মেয়েরা এসে এসে মৃতাকে দেখে যায়, আর বেচারীর অসহা অবস্থা দেখে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলে চলে যায়।

দি

বাজারে এসে ঘিসু বলে—"ওকে জ্বালানোর মত কাঠ তো যোগাড় হয়ে গেছে ভাই না রে মাধব ?"

মাধব বলে—"হ্যাঁ, কাঠ তো অনেক হয়েছে, এখন কফন হলেই হয়।"

"তাহলে চল সস্তা দেখে একখানা কফন কিনে নিই।"

"হ্যাঁ, তাছাড়া আর কি ? মড়া তুলতে তুলতে রাত হয়ে যাবে। রাতের বেলা কফন অত কে দেখতে যাচ্ছে ?"

"কেমনতর যে বাজে নিয়ম সব, বেঁচে থাকতে গা ঢাকার জন্য একখানা ছেঁড় তেনাও যে পায়নি মরলে তার জন্য নতুন কফন চাই।"

"কফনটা তো মড়ার সঙ্গেই পুড়ে যায়।"

"তা না তো কি থেকে যায় নাকি ? এই টাকা পাঁচটা আগে পেলে বউটাকে একটু ওষুধ-পথ্যি খাওয়াতে পারতাম।"

দু'জনেই দু'জনের মনের কথাটি টের পাচ্ছে। বাজারে এখানে ওখানে ঘুরছে তে ঘুরছেই। কখনো এ কাপড়ের দোকানে কখনো ও দোকানে। নানা রকমের কাপড় —রেশমী কাপড়, সুতী কাপড় সব দেখে, কিন্তু কোনটাই পছন্দ হয় না। এই করতে করতে সন্ধ্যা নামে। তখন দু'জনেই না জানি কোন এক দৈবী প্রেরণাবশে একটি পানশালার দরজায় এসে দাঁড়ায়, তারপর যেন কোনও পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পন মত ভেতরে ঢুকে পড়ে। ভেতরে ঢুকে কিছুক্ষণ দু'জনে অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর গদীর সামনে গিয়ে ঘিসু বলে—"সাহুজী, এক বোতল আমাদেরকেও দিন।"

এরপর কিছু চাট আসে, মাছভাজা আসে, আর ওরা দু'জনে বারান্দায় বসে নিশ্চিন্ত মনে মদ গিলে চলে।

কয়েক ভাঁড় তড়বড় করে গেলবার পর দু'জনেরই একটু একটু নেশার আমেজ আসে।

ঘিসু বলে—"কফন দিলে হতোটা কী ? শেষ অব্দি পুড়েই তো যেত। বউয়ের সঙ্গে তো আর যেত না।"

মাধব আকাশের দিকে তাকিয়ে যেন সব দেবতাকে তার নিষ্পাপ হবার সাক্ষী মেনে বলে—"দুনিয়ার দস্তুরই যে এই, নইলে লোকে বামুনঠাকুরদের হাজার হাজার

টাকাই বা দেয় কেন ? কে দেখছে, পরলোকে পাচ্ছে কি পাচ্ছে না।"

বড়লোকদের হাতে পয়সা আছে, ইচ্ছে হ'লে ওড়াক গে। আমাদের কাছে উড়িয়ে দেবার মতন আছেটা কী!"

"কিন্তু ওদের সবাইকে কি বলবি ? ওরা জিজ্ঞেস করবে না কফন কই ?"

ঘিসু হাসে- "আরে ধ্যাৎ, বলব, টাকা ট্যাঁক থেকে কোথায় যে খসে পড়ে গেছে, অনেক খুঁজেছি, পাইনি। ওরা বিশ্বাস করবে না ঠিকই, তবু ওরাই আবার টাকা দেবে।"

মাধবও হেসে ফেলে; এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে বলে—"আহা! বড় ভালো ছিল গো বেচারী! মরেও খুব খাইয়ে গেল।"

আধ বোতলের ওপর শেষ হয়ে যায়। ঘিসু দু'সের পুরি আনিয়ে নেয়। সঙ্গে চাটনি, আচার, মেটের কারি। শুঁড়িখানার সামনেই দোকান। মাধব ছুটে গিয়ে দুটো ঠোঙায় করে সব জিনিস নিয়ে আসে। পুরো দেড়টি টাকা আরও খরচ হয়ে যায়। হাতে শুধু আর কটা পয়সা বাকি থাকে।

দু'জনে এখন বেশ মেজাজে বসে পুরি খাচ্ছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন বনের বাঘ বনে বসে তার শিকার সাবাড় করছে। না আছে জবাবদিহি করার ভয়, না আছে বদনামের ভাবনা। এসব ভাবনাচিন্তাকে ওরা অনেক আগেই জয় করে নিয়েছে।

ঘিসু দার্শনিকের মত বলে—"এই যে আমাদের আত্মা খুশি হচ্ছে, এতে কি বউ আনন্দ পাবে না?"

মাধব ভক্তিতে মাথা নুইয়ে সায় দেয়—"খুব পাবে, আলবাৎ পাবে। ভগবান, তুমি অন্তর্যামী। ওকে সগ্‌গে নিয়ে যেও। আমরা দু'জনে মন খুলে আশীর্বাদ করছি। আজ যে খাওয়াটা খেলাম অমনটা সারাজীবনে কোনদিন কপালে জোটেনি।"

খানিক বাদে মাধবের মনে একটা সন্দেহ জাগে। বলে—"আচ্ছা বাবা, আমরাও তো একদিন ওখানে যাব।"

ঘিসু এই সোজা সহজ প্রশ্নটার কোন জবাব দেয় না। পরলোকের কথা ভেবে এই আনন্দটাকে মাটি করতে সে চায় না।

"যদি ও ওখানে আমাদের জিগ্যেস করে তোমরা আমাকে কফন দাওনি কেন, তাহলে কি বলবি ?"

"বলব, তোর মুণ্ডু।"

"জিগ্যেস তো ঠিকই করবে।"

"তোকে কে বলেছে যে ও কফন পাবে না? তুই কি আমাকে অমন গাধা ঠাউরেছিস? ষাটটা বছর কি এই দুনিয়াতে ঘোড়ার ঘাস কেটে আসছি। বউ

কঙ্কন ঠিক পাবে আর এর থেকে অনেক ভাল পাবে।"

মাধবের বিশ্বাস হয় না। বলে—"দেবেটা কে ? পয়সা তো তুই খেয়ে ফেলেছিস ও তো আমাকেই জিগেস করবে।. ওর সিঁথের সিঁদুর যে আমিই পরিয়েছি।"

ঘিসু গরম হয়ে বলে—"আমি বলছি ও কঙ্কন পাবে। তোর পেত্যয় হচ্ছে না কেন?

"দেবেটা কে বলছিস না কেন ?"

"ও লোকগুলানই দেবে যারা এবার দিয়েছে। হ্যাঁ, তবে এর পরের টাকাটা আ আমাদের হাতে আসবে না।"

যেমন যেমন অন্ধকার বেড়ে চলে, আকাশের তারাগুলোর দীপ্তি বাড়ে, মদ দোকানের রঙতামাশাও তেমনি বাড়তে থাকে। কেউ গান গায়, কেউ ডিগবাজি খায়, কেউ বা তার সাথীর গলা জড়িয়ে ধরে। কেউ তার ইয়ারের মুখে মদে ভাঁড় তুলে দেয়।

এখানকার পরিবেশে মাদকতা, হাওয়াতে নেশা। কত লোক তো এখানে এসে এ ঢোঁক খেয়েই মাতাল হয়ে পড়ে। মদের থেকেও বেশি এখানকার হাওয়া ওদে নেশা ধরায়। জীবনের দুঃখ-কষ্ট ওদের এখানে টেনে আনে। কিছু সময়ের জন্য ও ভুলে থাকে ওরা বেঁচে আছে না মরে গেছে। নাকি বেঁচেও নেই, মরেও নেই।

বাপ-বেটা দু'জনে এখনো মৌজ করে করে চুমুক দিয়ে খাচ্ছে। সবার নজর ওদে দু'জনের ওপর। কী ভাগ্য দু'জনের! পুরো একটা বোতল ওদের মাঝখানে।

পেট ভরে খেয়ে মাধব বেঁচে যাওয়া পুরির ঠোঙাটা নিয়ে গিয়ে একটি ভিখারীটিকে দিয়ে দেয়। ভিখারীটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে ক্ষুধাতুর চোখে তাকাচ্ছিল দেবার গৌরব, আনন্দ আর উল্লাস মাধব জীবনে এই প্রথম অনুভব করে।

ঘিসু বলে—"নে রে, যা ভালো করে খা আর আশীর্বাদ কর্। যার দৌলতে খাও ও তো মরে গেছে। তবু তোর আশীর্বাদ ওর কাছে পৌঁছুবে। মন খুলে পরান খু আশীর্বাদ কর্, বড় কষ্টের রোজগারের পয়সা রে।"

মাধব আবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে—"ও ঠিক বৈকুণ্ঠে যাবে গো বা ও বৈকুণ্ঠের রাণী হবে।"

ঘিসু উঠে দাঁড়িয়ে যেন উল্লাসের তরঙ্গে সাঁতরাতে সাঁতরাতে বলে—"হ্যাঁ বা বৈকুণ্ঠেই যাবে বৈকি। কাউকে কষ্ট দেয়নি, দুখ্খু দেয়নি। মরতে না মর আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সাধটি পুরিয়ে দিয়ে গেছে। ও যদি বৈকুণ্ঠে না যা তো কি ঐ ধুমসো ধুমসো লোকগুলান যাবে যারা গরীবগুলানরে দুহাতে লুটছে আ নিজেদের পাপ ধুয়ে ফেলতে গঙ্গায় গিয়ে চান করছে, মন্দিরে পুজো দিচ্ছে।"

ভক্তিশ্রদ্ধার এই অনুভূতিটি তাড়াতাড়ি বদলে যায়। অস্থিরতাই নেশার বৈশিষ্ট

এরপর দুঃখ আর হতাশা মনে ভর করে।

মাধব বলে—"বাবা, বেচারী কিন্তু জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছে। মরল, তাও কত যন্ত্রণা সয়ে।"

বলে চোখে হাতচাপা দিয়ে কাঁদতে শুরু করে দেয়। ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ওঠে।

ঘিসু বোঝায়—"কাঁদচিস কেন বাবা, আনন্দ কর্। বউ এই মায়া থেকে ছুট্টি পেয়ে গেছে। এই জঞ্জাল থেকে রেহাই পেয়েছে। বড় ভাগ্যিমানী ছিল রে, তাইতো এত তাড়াতাড়ি মায়ামমতা কাটিয়ে চলে গেছে।"

তারপর দু'জনে উঠে দাঁড়িয়ে গান গাইতে শুরু করে দেয়—

"ঠগিনী, কেঁয়ো নৈনা ঝমকায়ৈ! ঠগিনী!"

সব মাতাল এদের দু'জনকে দেখছে। এরা দু'জনে মত্ত হয়ে গান গেয়ে চলে। তারপর দু'জনে নাচতে শুরু করে দেয়। লাফ দেয়। ঝাঁপ দেয়। পড়েও যায়। উঠে গেলেদুলে চলে। কতরকম ভাবভঙ্গী করে। অভিনয় করে। তারপর শেষ পর্যন্ত নেশায় চুবচুর হয়ে ওখানেই টলে পড়ে যায়।

১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌতে সারা ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের প্রথম সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ

সাহিত্যের উদ্দেশ্য

এই সম্মেলন আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। আজ পর্যন্ত আমাদের সভা সমিতিতে প্রধানতঃ ভাষা এবং তার প্রচার নিয়েই আমরা আলোচনা করে এসেছি। এমনকি উর্দু এবং হিন্দীর আদিপর্বের যে সাহিত্য প্রচলিত আছে—তারও উদ্দেশ্য ছিল চিন্তা এবং অনুভূতিকে প্রভাবিত করা নয়, কেবলমাত্র ভাষাকে নির্মাণ করা। এও এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল, সন্দেহ নেই। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত না ভাষা এক স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করে, ততক্ষণ চিন্তা এবং অনুভূতিকে প্রকাশ করার শক্তি আসবে কোথা থেকে? আমাদের ভাষার এই "পাইওনীয়র"—অর্থাৎ পথি-প্রদর্শকগণ হিন্দুস্থানী ভাষা নির্মাণ করে জাতিকে যা দিয়ে গেছেন, আমরা যদি তার জন্য ঋণ স্বীকার না করি, তবে তা হবে আমাদের কৃতঘ্নতা।

ভাষা উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য নয়। বর্তমানে আমাদের ভাষা যে রূপ প্রাপ্ত হয়েছে, তাতে আমরা নিতান্ত ভাষাচর্চা থেকে আরও এগিয়ে গিয়ে অনুভূতির প্রতি দৃষ্টি দিতে পারি এবং যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই ভাষার নির্মাণ কার্য শুরু হয়েছিল, তাকে পূর্ণ করার বিষয়ে চিন্তা করতে পারি। যে ভাষায় আদিপর্বে "বাগ-ও বাহার" কিংবা "বৈতাল পচীসী" রচনাই ছিল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি, আজ তা দর্শন এবং বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনার যোগ্য হয়েছে,—এবং এই সম্মেলন উক্ত সত্যেরই স্পষ্ট স্বীকৃতি।

ভাষা কথ্য হয়, আবার লিখিতও। কথ্য ভাষা তো মীর অম্মন এবং লল্লুলালের যুগেও প্রচলিত ছিল; কিন্তু তাঁরা যে ভাষা নির্মাণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তা ছিল লিখিত-ভাষা আর তাই ছিল সাহিত্য। আমাদের কাছের মানুষের কাছে আমরা কথ্য ভাষায়ই নিজেদের প্রকাশ করি—আমাদের সুখ-দুঃখের ভাবনার ছবি আঁকি। সাহিত্যিক ঐ কাজই তাঁর লেখনীদ্বারা করে থাকেন। অবশ্য, তাঁর শ্রোতার পরিধি অনেক বিস্তৃত। এবং যদি তাঁর বক্তব্যে সত্যতা থাকে তবে শতাব্দী এবং যুগ পরম্পরায় তাঁর রচনাসমূহ হৃদয়কে আলোড়িত করতে থাকে।

কিন্তু, আমার এ কথা বলার অভিপ্রায় নেই যে যা কিছু লেখা হয়, তা সবই সাহিত্য। সাহিত্য বলা যায় সেই রচনাকেই, যাতে কোন সত্য প্রতিফলিত হয়েছে, যার

ভাষা পরিপক্ক, মার্জিত ও সুন্দর, এবং যাতে হৃদয় ও বুদ্ধিকে প্রভাবিত করার গুণ রয়েছে ; আর সাহিত্যে এই গুণ তখনই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় যখন তা জীবনের বাস্তবতা এবং অভিজ্ঞতাসমূহকে ব্যক্ত করে। ভোজবাজির গল্প ভূত-প্রেতের কাহিনী আর প্রেম-বিরহের আখ্যান কোন এক সময় আমাদের খুবই আকৃষ্ট করে থাকতে পারে, কিন্তু, আজ আর আমাদের তা হৃদয়স্পর্শ করে না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে মানব-প্রকৃতির দরদী সাহিত্যিক রাজকুমারদের প্রেম-কাহিনী ও ভোজবাজির গল্পে ও জীবনের বাস্তবতা বর্ণনা এবং সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারেন, এবং তাতে বরং এ কথাই প্রমাণিত হয় যে সাহিত্যকে চিত্তাকর্ষক হতে হলে জীবনের বাস্তবতার দর্পণ হতে হবে। তারপর আপনি তাকে যে কোন কাঠামোয় লাগাতে পারেন—ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর গল্প আর গোলাপ ও বুলবুলের উপকথাও এর উপযুক্ত হতে পারে।

সাহিত্যের নানাপ্রকার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু, আমার মতে এর সর্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞা হল "জীবনের পর্যালোচনা"। প্রবন্ধই হোক, কিংবা কাহিনী বা কাব্যই হোক, যা চাই তা হল জীবনের আলোচনা এবং ব্যাখ্যা।

আমরা যে যুগ সবে পার হয়ে এসেছি, জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিলনা। আমাদের সাহিত্যিকরা কল্পনার এক সৃষ্টি দাঁড় করিয়ে ভোজবাজি দিয়ে তার ফাঁক পূরণ করতেন। কখনো লেখা হত "ফিসান-এ-আজায়ব," কখনো "বস্তান-এ-খয়াল," আবার কখনো "চন্দ্রকান্তা সন্ততি"র গল্পকাহিনী। এইসব গল্পের উদ্দেশ্য কেবল ছিল মনোরঞ্জন এবং গতানুগতিক রস-লালসার তৃপ্তি। জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের কোন সংযোগ আছে, এ কথা ছিল কল্পনাতীত। গল্প গল্পই, আর জীবন হল জীবন—এই দুইকে মনে করা হত পরস্পরবিরোধী। কবিরাও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায় আচ্ছন্ন ছিলেন। প্রেমের পরাকাষ্ঠা ছিল বাসনার তৃপ্তিতে, আর চোখের তৃপ্তিতেই সৌন্দর্য। এই সকল শৃঙ্গাররস সৃষ্টিতেই কবিকুল আপন আপন প্রতিভা ও কল্পনার চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করতেন। কবিতায় কোন নূতন শব্দ-যোজনা বা নূতন রূপকল্প সৃষ্টি—তা বাস্তব পরিস্থিতি থেকে যত দূরই হোক না কেন—বাহবা পাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আশিয়ানা (অর্থাৎ নীড়) এবং কফস (অর্থাৎ পিঞ্জর), বর্ক (অর্থাৎ বিজুরি) এবং খিরমন (অর্থাৎ খড়কুটো) রূপকল্প বিরহের বর্ণনায় নিরাশা ও বেদনার বিবিধ অবস্থাকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলত যে শ্রোতার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যেত। এবং আজও এই ধরনের কবিতা কত জনপ্রিয়,—তা আমরা ভাল ভাবেই জানি।

নিঃসন্দেহে বলা যায়, কাব্য ও সাহিত্যের উদ্দেশ্য আমাদের অনুভূতির তীব্রতাকে বৃদ্ধি করা, কিন্তু, মনুষ্যজীবন তো কেবল স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের জীবন নয়। যে

সাহিত্যের বিষয়বস্তু আদি রস এবং তজ্জনিত বিরহ-ব্যথা, নিরাশা ইত্যাদিতেই সীমাবদ্ধ,—পৃথিবীর কঠোর বাস্তবতা থেকে পলায়নই যে সাহিত্যে জীবনের সার্থকতা বলে বিবেচিত,—আমাদের চিন্তা ও অনুভূতির প্রয়োজন মিটান কি তার পক্ষে সম্ভব? আদি রস মানবজীবনের এক অঙ্গ মাত্র। যে সাহিত্যের অধিকাংশ এ বিষয় নিয়েই রচিত—তা ঐ জাতি বা ঐ যুগের পক্ষে গর্বের কারণ বা সুরুচির পরিচায়ক হতে পারে না।

কি হিন্দী আর কি উর্দু, কবিতায় দু'য়েরই এক হাল ছিল। ঐ সময়ে সাহিত্য এবং কাব্যের ব্যাপারে যা লোক-রুচি ছিল, তার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা সহজ ছিল না। প্রশংসা এবং খ্যাতির লোভ প্রত্যেকেরই থাকে। কবিদের কাব্যরচনাই ছিল জীবনধারণের উপায়, আর পয়সাওয়ালা ও ধনকুবের ভিন্ন কবিতার পৃষ্ঠ-পোষকতা আর কে করতে পারে? একে তো আমাদের কবিদের সাধারণ জীবনের মুখোমুখি হবার এবং তার বাস্তবতাকে অনুভব করার অবসরই ছিল না অপর দিকে ছোট বড় সকলেই এমন এক মানসিক অবক্ষয়ে আচ্ছন্ন ছিল যে মানসিক ও বৌদ্ধিক জীবন বলতে কিছু ছিল না।

এজন্য আমরা কেবল তৎকালীন সাহিত্যিকগণকেই দোষারোপ করতে পারি না। সাহিত্য হল সমকালের প্রতিবিম্ব। যে অনুভূতি এবং চিন্তা জনগণের হৃদয়কে স্পন্দিত করে, তাই সাহিত্যে তার ছায়া ফেলে। এই প্রকার অধঃপতনের যুগে মানুষ হয় প্রেমে ঢলে পড়ে, নয়তো আধ্যাত্মবাদ ও বৈরাগ্যে মনের সান্ত্বনা খোঁজে। যখন সাহিত্যে সংসারের নশ্বরতার রং চড়ান হয়, এবং তার এক একটি শব্দ নৈরাশ্যে ডোবান, সময়ের প্রতিকূলতার কান্নায় ভরা ও ইন্দ্রিয়াসক্তির প্রতিবিম্বে পরিণত হয়, —তখন বুঝে নিতে পারেন জাতি জড়তা ও অবক্ষয়ের কবলে পড়েছে এবং উদ্যোগ ও সংগ্রামের শক্তি তাতে অবশিষ্ট নেই—উঁচু লক্ষ্য থেকে সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে এবং পৃথিবীকে দেখার ও বোঝার শক্তি তার লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু, আমাদের সাহিত্যিক-রুচির দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। আজ সাহিত্য কেবল মন ভুলান জিনিস নয়, মনোরঞ্জন ছাড়াও তার আরও কিছু উদ্দেশ্য আছে। আজ তা কেবল নায়ক-নায়িকার মিলন-বিরহের কাহিনী শোনায় না, জীবনের সমস্যা-সমূহ নিয়েও আলোচনা করে এবং তার সমাধান খোঁজে। আজ সাহিত্য তার প্রেরণার জন্য অদ্ভুত আশ্চর্যজনক ঘটনার সন্ধান কিংবা অনুপ্রাসের অন্বেষণ করে না, যে সকল প্রশ্নে সমাজ ও ব্যক্তি প্রভাবিত হয় তাতেই আকৃষ্ট হয়। অনুভূতির সেই তীব্রতা যা আমাদের চিন্তায় ও অনুভবে গতিশীলতার জন্ম দেয়, তাই সাহিত্যের উৎকর্ষতার বর্তমান নিরিখ।

নীতিশাস্ত্র এবং সাহিত্য-শাস্ত্রের লক্ষ্য একই, কেবল তাদের উপদেশরীতি ভিন্ন। নীতিশাস্ত্র তর্ক ও উপদেশের দ্বারা বুদ্ধি ও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে। সাহিত্য নিজের জন্য বেছে নিয়েছে মনের বিভিন্ন অবস্থা ও অনুভূতির ক্ষেত্র। আমরা জীবনে যা কিছু দেখি অথবা যা কিছু আমাদের জীবনে ঘটে থাকে তারই অনুভব এবং আঘাত কল্পনায় পৌঁছে সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা যোগায়। কবি ও সাহিত্যিকের অনুভূতির তীব্রতা যত বেশী, তাঁদের রচনা তত আকর্ষণীয় ও উচ্চ শ্রেণীভুক্ত। যে সাহিত্য আমাদের সুরুচিকে জাগ্রত করে না, মানসিক ও আত্মিক তৃপ্তি দেয় না, আমাদের শক্তি ও গতি দেয় না, আমাদের সৌন্দর্যপ্রেম সৃষ্টি করে না,—এবং আমাদের মধ্যে উৎপন্ন করে না, সংকল্প ও কাঠিন্যকে জয় করার দৃঢ়তা—সে সাহিত্য আজ প্রয়োজনহীন এবং সাহিত্যপদবাচ্য হবার উপযুক্ত নয়।

পুরানো দিনে সমাজের লাগাম থাকত ধর্মের হাতে। মানুষের আত্মিক ও নৈতিক সভ্যতার ভিত্তি ছিল ধর্মীয় অনুশাসন, যা ভয় ও প্রলোভনের দ্বারা কার্য সাধন করত—পাপপুণ্যের বোধ ছিল তার হাতিয়ার।

বর্তমানে, সাহিত্য এ কাজের ভার নিয়েছে, এবং তার হাতিয়ার হল সৌন্দর্য-প্রেম। এই সৌন্দর্যপ্রেমকেই সে মানুষের মধ্যে জাগাতে চায়। এমন কোন মানুষ নেই যার মধ্যে সৌন্দর্যানুভূতি নেই। সাহিত্যিকের মধ্যে এই চিত্তবৃত্তি যত জাগ্রত ও সক্রিয় —তাঁর রচনা ততই প্রভাবশালী। প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ এবং আপন অনুভূতির তীক্ষ্ণতাবশতঃ তাঁর সৌন্দর্যবোধে এত তীব্রতা আসে যে যা কিছু অসুন্দর, বর্বর ও মনুষ্যত্ববর্জিত—তাই তাঁর পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠে। তিনি তাঁর ভাষা ও ভাবনার সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে আক্রমণ করেন। অতএব বলতে পারেন, সাহিত্যিকই মানবতা, সৌন্দর্য এবং সভ্যতার ধারক ও বাহক। যে নিপীড়িত, বঞ্চিত, পদদলিত—সে ব্যক্তিই হোক বা সমষ্টিই হোক—তার পক্ষে দাঁড়িয়ে কথা বলা তাঁর দায়িত্ব। তিনি তাঁর আদালতের সামনে সওয়াল পেশ করেন এবং আদালতের ন্যায়বোধ ও সৌন্দর্যবোধকে জাগ্রত করতে পারলে নিজের প্রচেষ্টা সফল হল মনে করেন।

তবে সাহিত্যিক সাধারণ উকীলের মত মক্কেলের উচিত অনুচিত সব রকমের দাবী পেশ করেন না, অতিরঞ্জন করে কাজ গুছান না এবং মনগড়া কথা বলেন না। তিনি জানেন যে এই সমাজের আদালতে এ সব যুক্তি ধোপে টিকবে না। এই আদালতের মনে আপনি দাগ কাটতে পারেন কেবলমাত্র যদি সত্য থেকে আপনি কখনো বিচ্যুত না হন তবেই। নতুবা, আদালত আপনার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করবে এবং আপনার বিরুদ্ধে রায় দেবে। এই সাহিত্যিক গল্প লেখেন,

কিন্তু বাস্তবতাকে মনে রেখেই, মূর্তি তৈরী করেন, কিন্তু এমন ভাবে যেন তাতে সজীবতা ও ভাবব্যঞ্জনা থাকে—তিনি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে মানবপ্রকৃতিকে দেখেন, মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন, এবং তাঁর চেষ্টা থাকে যাতে তাঁর পাত্রপাত্রীরা সমস্ত রকম অবস্থায় রক্তমাংসের মানুষের মতই আচরণ করে; সহজ সহানুভূতি ও সৌন্দর্যপ্রেমের বলে তিনি জীবনের সেই সূক্ষ্মলোকে পৌঁছে যান, যেখানে সাধারণ মানুষ পৌঁছাতে অসমর্থ।

আধুনিক সাহিত্যে বাস্তব-বর্ণনার ঝোঁক এত বেড়ে যাচ্ছে যে আধুনিক গল্প যথাসম্ভব লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সীমার মধ্যেই থাকে। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে পাত্রপাত্রীরা মানুষের অনুরূপ হলেই আমরা সন্তুষ্ট নই, বস্তুত আমরা এই নিশ্চয়তাও চাই যে তারা একেবারে সত্যিকারের মানুষ এবং লেখক যথাসম্ভব তাদের জীবনকথাই লিখেছেন; কারণ কল্পনায় গড়া মানুষে আমাদের বিশ্বাস নেই —এদের কাযে এবং চিন্তায় আমরা আকৃষ্ট হই না। আমাদের এ নিশ্চয়তা চাই যে লেখক যা সৃষ্টি করেছেন, তা প্রত্যক্ষ অনুভূতির ভিত্তিতেই করেছেন এবং তার চরিত্রসমূহের কথাগুলি তাঁর নিজেরই।

এজন্যই কোন কোন সমালোচক সাহিত্যকে লেখকের মনোবিজ্ঞানিক জীবন চরিত আখ্যা দিয়েছেন।

একই ঘটনা বা পরিস্থিতি সব মানুষকে সমানভাবে প্রভাবিত করে না। প্রতিটি মানুষের মনোবৃত্তি এবং দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা। লেখক যে দৃষ্টিকোণ বা মনোবৃত্তি থেকে কোনও বিষয়কে দেখেন, পাঠককে তার সহযোগী করে তোলাই হল রচনাকৌশল, এবং এইখানেই তার সাফল্য। এই সঙ্গে আমরাও সাহিত্যিকের কাছ থেকে এটাই আশা করি যে তিনি তাঁর প্রজ্ঞা ও চিন্তার দ্বারা আমাদের জাগ্রত করবেন এবং আমাদের দৃষ্টি এবং মানসিকতার পরিধি বিস্তৃত করবেন,—তাঁর দৃষ্টি এত সূক্ষ্ম, এত গভীর, এবং এত বিস্তৃত হবে যে তা আমাদের আত্মিক আনন্দ এবং বল দেবে।

প্রতিটি মানুষের মধ্যেই রয়েছে তার অবস্থাকে আরও ভাল করার প্রেরণা। আমাদের মধ্যকার ভুলগুলি ব্যধির মত আমাদের উপর চেপে আছে। যেমন শারীরিক স্বাস্থ্য প্রকৃতির এক স্বাভাবিক অবস্থা এবং রোগ তার উল্টো, অনুরূপ ভাবে নৈতিক ও মানসিক স্বাস্থ্যও এক স্বাভাবিক অবস্থা, এবং রোগী যেমন তার রোগকে পছন্দ করে না, নৈতিক ও মানসিক রোগকেও আমরা তেমনি অপছন্দ করি। যেমন রোগী সর্বদা একজন চিকিৎসকের সন্ধানে থাকে, সেইরকম আমরাও আমাদের দুর্বলতাকে দূরে ফেলে দিয়ে আরও ভালো হওয়ার চেষ্টায় থাকি। এইজন্যই আমরা সাধু-ফকিরের খোঁজে থাকি, পূজা-অর্চনা করি, বয়স্কদের কাছে বসি, বিদ্বান্‌গণের

ব্যাখ্যা শুনি, আর সাহিত্য অধ্যয়ন করি।

আর আমাদের সমস্ত দুর্বলতার জন্য দায়ী হল আমাদের কুরুচি এবং প্রেমানুভূতির অভাব। যেখানে প্রকৃত সৌন্দর্যপ্রেম আছে, যেখানে প্রেমের বিস্তৃতি আছে, সেখানে দুর্বলতা কিভাবে থাকতে পারে? প্রেমই আত্মার খাদ্য, আর সব দুর্বলতাই তো খাদ্যের অভাব অথবা দূষিত খাদ্যগ্রহণ থেকে জন্ম নেয়। শিল্পী আমাদের মধ্যে সৌন্দর্যের অনুভূতি এবং প্রেমের উষ্ণতা সৃষ্টি করেন। তাঁর একটি শব্দ, একটি বাক্য, একটি ইংগিত এমন ভাবে আমাদের ভেতরে প্রবেশ করে যায় যে আমাদের অন্তর উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আর শিল্পী যতক্ষণ পর্যন্ত স্বয়ং সৌন্দর্যপ্রেমে মাতোয়ারা না হন এবং তাঁর আত্মা এই জ্যোতিতে উদ্ভাসিত না হয়, ততক্ষণ তিনি আমাদের সেই আলোকে কিভাবে নিয়ে যাবেন?

প্রশ্ন হতে পারে সৌন্দর্য কাকে বলে? স্পষ্টতঃই এই প্রশ্ন নিরর্থক, কারণ, সৌন্দর্যের বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নেই। আমরা সূর্যকে উঠতে ও ডুবতে দেখেছি, উষা ও সন্ধ্যার লালিমা দেখেছি, সুন্দর সুগন্ধে ভরা ফুল দেখেছি, পাখীর গান শুনেছি, কল কল নিনাদিনী নদী দেখেছি, নৃত্যপরা ঝর্ণা দেখেছি---এই তো সৌন্দর্য। এইসব দৃশ্য দেখে আমাদের অন্তর মন কেন নেচে ওঠে? না, এইজন্য যে এই সবে বর্ণ ও ধ্বনির সামঞ্জস্য রয়েছে। সুর এবং তালের সামঞ্জস্যই সংগীতের মাদকতার কারণ। আমাদের সৃষ্টিই হয়েছে বিভিন্ন উপাদানের সামঞ্জস্যপূর্ণ মিলনের ফলে, আর সেইজন্যই আমাদের আত্মা সর্বদা ঐ সাম্য ও সামঞ্জস্যের সন্ধানে থাকে। শিল্পীর আত্মিক সামঞ্জস্যেরই ব্যক্ত রূপ সাহিত্য। এই সামঞ্জস্য সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে, ধ্বংস নয়। আমাদের মধ্যে তা বিশ্বস্ততা, সত্যতা, সহানুভূতি, ন্যায়প্রিয়তা এবং সাম্যের অনুভূতিকে পুষ্ট করে। যেখানে এইসব অনুভূতি আছে সেখানে দৃঢ় সঙ্কল্প আছে, জীবন আছে, যেখানে এসকলের অভাব আছে, সেখানেই বিভেদ, বিরোধ ও স্বার্থপরতা,—বিদ্বেষ, শত্রুতা আর মৃত্যু। এই বিচ্ছিন্নতা এবং বিরোধ প্রকৃতি-বিরোধী জীবনের লক্ষণ, যেমন প্রকৃতি-বিরুদ্ধ আহার-বিহারের চিহ্ন রোগ। যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে অনুকূলতা আর সামঞ্জস্য রয়েছে, সেখানে সংকীর্ণতা ও স্বার্থের অস্তিত্ব কিভাবে সম্ভব? যখন আমাদের আত্মা প্রকৃতির মুক্ত বায়ুমণ্ডলে লালিতপালিত হয়, তখন নীচতা-হীনতার কীট আপনা থেকেই ঐ আলো ও হাওয়ায় মরে যায়। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেকে সীমিত করলেই কেবল সমস্ত রকম মানসিক ও ভাবগত রোগের উৎপত্তি হয়। সাহিত্য আমাদের জীবনকে স্বাধীন এবং স্বাভাবিক করে গড়ে তোলে। এক কথায়, সাহিত্য দ্বারা সংস্কার সাধন হয়। এই হল তার মুখ্য উদ্দেশ্য।

আমার বিবেচনায় "প্রগতিশীল লেখক সঙ্ঘ'—এই নামটাই ভুল। সাহিত্যিক বা শিল্পী স্বভাবতঃই প্রগতিশীল। যদি এ তাঁর স্বভাব না হত তবে হয়ত তিনি সাহিত্যিকই হতেন না। তিনি তাঁর ভিতরে এবং বাইরে এক অভাব অনুভব করেন, এবং এই অভাবকে পূর্ণ করার জন্য তাঁর আত্মা উৎসুক থাকে। তিনি কল্পনায় ব্যক্তি এবং সমাজকে যে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে দেখতে চান, তা তিনি জীবনে দেখতে পান না। এজন্যই সমকালীন মানসিক এবং সামাজিক অবস্থা তাঁর হৃদয় কুরে কুরে খায়। তিনি এই অপ্রীতিকর অবস্থার অবসান ঘটাতে চান, যাতে পৃথিবী বাঁচার ও মরার পক্ষে আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। এই বেদনা এবং এই অনুভূতি তাঁর হৃদয় ও মস্তিষ্ককে সক্রিয় করে রাখে। নিয়ম এবং আচারের বন্ধনে সমাজ যে কষ্ট ভোগ করে,—বেদনায় ভরা তাঁর হৃদয় তা সহ্য করতে পারেনা। আমরা কেন এমন কিছু একত্রিত করি না যাতে এই দাসত্ব এবং দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাওয়া যায়? এই বেদনাকে তিনি যত তীব্রতার সঙ্গে অনুভব করেন, ততই তাঁর রচনায় সত্য এবং শক্তির উন্মেষ ঘটে। নিজের অনুভূতিকে তিনি যে পরিমাণে ব্যক্ত করেন, তাই তাঁর শিল্পকুশলতার মাপকাঠি।

প্রগতি বলতে আমি সেই অবস্থাকে বুঝি যা আমাদের মধ্যে দৃঢ়তা আর কর্মশক্তি সৃষ্টি করে, আমাদের দুঃখজনক অবস্থাকে অনুভব করতে পারার ক্ষমতা দেয়, অন্তর ও বাহিরের কি গূঢ় কারণে আমাদের এই নির্জীবতা ও অবক্ষয়, তা জানিয়ে দেয়, এবং তা দূর করার সচেষ্টতা জাগ্রত করে।

যে কবিতায় আমাদের মনে নশ্বরতার ধারণার আধিপত্য আরও দৃঢ় হয়, তা আমাদের পক্ষে নিরর্থক। যে সব কবিতায় আমাদের মাসিকপত্রের পৃষ্ঠা ভরে থাকে তা যদি আমাদের মধ্যে গতি ও তাপ সৃষ্টি না করে তবে তা অর্থহীন। দুটি নবীন হৃদয়ের প্রেমের কাহিনী বলে যদি আমাদের সৌন্দর্য-প্রেমের উপর কোন প্রভাব না পড়ে কিংবা যদিও বা পড়ে তা শুধু এই যে আমরা ওদের বিরহ ব্যথায় কাঁদি—তবে তা আমাদের মন বা রুচিকে কতদূর অগ্রসর করে? এইসব বিষয়বস্তু থেকে কোন এক যুগে আমাদের ভাবাবেশ হত, আজ এসব নিরর্থক। আজ তো আমাদের সেই শিল্পের প্রয়োজন, যাতে রয়েছে কর্মের বাণী। হজরত ইকবালের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বলি:

"জীবন রহস্য যদি তুমি খোঁজ—পাবে না তা সংগ্রাম ছাড়া কোনখানে।
একি লজ্জা! নদী বিশ্রাম নেয় সাগরের কোলে॥
নীড়ে আমার আনন্দ নেই—
আমি ঘুরে ফিরি—ফুলদলে কিংবা নদীতটে॥"

আমার এ কথা বলতে কোন দ্বিধা নেই যে আমি অন্য বস্তুর ন্যায় শিল্পকেও উপযোগিতার তুলাদণ্ডে ওজন করি। সন্দেহ নেই যে শিল্পের উদ্দেশ্য সৌন্দর্যবৃত্তির পুষ্টি এবং শিল্প আমাদের আত্মিক আনন্দের চাবিকাঠি, কিন্তু এমন কোন রুচিগত মানসিক অথবা আত্মিক আনন্দ নেই, যার কোন উপযোগিতার দিক নেই! আনন্দের নিজেরই এক উপযোগিতার দিক রয়েছে—উপযোগিতার দৃষ্টিকোণ থেকে কোন বস্তুতে আমাদের সুখও হয়, আবার কোন বস্তুতে দুঃখও।

আকাশ ছাওয়া লাল রং নিঃসন্দেহে বড় সুন্দর দৃশ্য,—কিন্তু, আষাঢ়ে যদি আকাশ এমনি লালে ছেয়ে যায়, তবে তা আমাদের প্রসন্নতা দিতে পারে না! ঐ সময়ে তো আমরা আকাশে কালো মেঘের ঘটা দেখেই আনন্দিত হই। ফুল দেখে আমাদের এজন্যই আনন্দ হয় যে ওতে ফলের আশা রয়েছে,—প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের জীবনের সুর মিলিয়ে আমাদের আত্মিক সুখ এজন্যই মেলে যে তাতে আমাদের জীবন বিকশিত এবং পরিপুষ্ট হয়। প্রকৃতির নিয়মই হল বৃদ্ধি এবং বিকাশ,—আর যে সকল ভাব, অনুভূতি ও চিন্তায় আমাদের আনন্দ মেলে—তা বৃদ্ধি এবং বিকাশের সহায়ক। শিল্পী আপনার শিল্প দ্বারা সৌন্দর্য সৃষ্টি করে পরিস্থিতিকে বিকাশের উপযোগী করে তোলে।

কিন্তু সৌন্দর্যও অন্য পদার্থের মতই আপেক্ষিক,—স্বতন্ত্র বা অন্যনিরপেক্ষ নয়। একজন ধনশালী ব্যক্তির পক্ষে যা সুখ, তা অপরের পক্ষে দুঃখের কারণ হতে পারে। একজন ধনিক যখন তাঁর সুরভিত সুরম্য উদ্যানে বসে পাখীর কাকলী শোনেন, তখন তাঁর স্বর্গীয় সুখপ্রাপ্তি ঘটে। অপর একজন মানুষের কাছে বৈভবের এইসব সামগ্রী ঘৃণিত বস্তু বলে বোধ হয়।

বন্ধুত্ব ও সমতা, সংস্কৃতি ও প্রেম—সমাজের শুরু থেকেই আদর্শবাদীদের সোনালী স্বপ্ন হয়ে রয়েছে। ধর্মপ্রবর্তকগণ ধার্মিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বন্ধন দ্বারা এই স্বপ্নকে সত্য করে তোলার জন্য নিরন্তর, অথচ নিষ্ফল প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। মহাত্মা বুদ্ধ, যীশু খ্রীষ্ট, হজরত মহম্মদ আদি সকল ধর্মপ্রবর্তক ও পয়গম্বর নীতির উপরে এই সাম্যের সৌধ নির্মাণ করতে চেয়েছেন, কিন্তু সফলতা কেউ লাভ করেননি, আর আজ ছোট ও বড়র বিভেদ যত নিষ্ঠুররূপে প্রকট হয়েছে, তেমন সম্ভবতঃ কখনো হয়নি।

কথায় বলে: "পরীক্ষিতকে পরীক্ষা করা মূর্খতা।" আমরা যদি আজও ধর্ম ও নীতির হাত ধরে সাম্যের উচু লক্ষ্যে পৌছাতে চাই, তবে বিফলতাই শুধু মিলবে। তবে কি আমরা এই স্বপ্নকে উর্বর মস্তিষ্কের সৃষ্টি ভেবে ভুলে যাব? তবে তো মানুষের উন্নতি ও পূর্ণতার জন্য কোন আদর্শই অবশিষ্ট থাকবে না,—এর চেয়ে তো

ভাল মানুষের অস্তিত্বই বিনষ্ট হয়ে যাওয়া। যে আদর্শকে আমরা সভ্যতার সূচনা থেকে পোষণ করে আসছি, যে জন্য মনুষ্যসমাজ, ঈশ্বর জানেন, কত জীবন বলিদান দিয়েছে, যার রূপায়ণের জন্য ধর্মের আবির্ভাব হয়েছে,—মানব সমাজের ইতিহাস যে আদর্শের জন্য সংগ্রামের ইতিহাস,—তাকে এক অবিনাশ ও সার্বজনীন সত্য বলে মেনে নিয়ে প্রগতির ময়দানে পা ফেলতে হবে। আমাদের এমন এক নূতন ব্যবস্থাকে সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা দিতে হবে, যেখানে সাম্য কেবলমাত্র নৈতিক বন্ধনের উপর নিভরশীল না হয়ে আরও দৃঢ়মূল হবে, এবং ঐ আদর্শকেই আমাদের সাহিত্যের সামনে রাখতে হবে।

আমাদের সৌন্দর্য্যের কষ্টিপাথরটিকে বদলাতে হবে। সেদিন পর্যন্ত এই কষ্টিপাথর ছিল বিত্ত ও বিলাসের অনুগত। আমাদের শিল্পী বিত্তশালীর হাত ধরে থাকতে চাইত, তাদেরই পৃষ্টপোষকতার ওপর তার অস্তিত্ব নির্ভর করত এবং ওদের সুখ দু:খ, আশা-নিরাশা, প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাখ্যাই ছিল শিল্পের উদ্দেশ্য। ওদের অন্তঃপুর আর বাংলোতেই ছিল তার দৃষ্টি। ঝুপড়ি বা জীর্ণকুটির তার চিন্তার বাইরে ছিল। এদের তিনি মনুষ্যত্বের পরিধির বাইরে বলে মনে করতেন। কখনো এদের বিষয়ে যদি কিছু বলতেনও, তবে তা শুধুই ঠাট্টার ছলে। গ্রামবাসীর দেহাতী বেশভূষা আর আচার আচরন ছিল হাসি ঠাট্টা আর ব্যাঙ্গ বিদ্রূপের প্রচলিত বিষয়। এরাও মানুষ, এদেরও হৃদয় আছে এবং এদেরও প্রাণে আছে আকাঙ্ক্ষা —একথাটা শিল্পের কল্পনার বাইরে ছিল।

এক সংকীর্ণ রূপ-পূজা, শব্দ-যোজনা এবং ভাব-নিরঞ্জনের নামই ছিল শিল্প, এবং আজও তাই আছে। এর জন্য জীবনের কোন মহৎ আদর্শ বা উদ্দেশ্য ছিল না,—ভক্তি, বৈরাগ্য, আধ্যাত্মিকতা আর জগৎ বিমুখতাই ছিল এঁদের কাছে সর্বোচ্চ কল্পনা। আমাদের শিল্পী বিচারে জীবনের চরম লক্ষ্য ছিল তাই। এঁদের দৃষ্টি এত ব্যাপক ছিল না যে জীবন সংগ্রামের মধ্যে সৌন্দর্যের পরমোৎকর্ষ দেখতে পান। উপবাস ও নগ্নতার মধ্যেও সৌন্দর্যের অস্তিত্ব সম্ভব, তিনি তো কখনও স্বীকার করেন না। এঁর জন্য সৌন্দর্য রয়েছে সুন্দরী রমনীতে, কিন্তু ঐ রূপহীনা গরীব মা এর মধ্যে নয়, যে শিশুকে ক্ষেতের আলের উপর শুইয়ে দিয়ে নিজে ঘর্মাক্ত কলেবরে খাটছে। তিনি এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে রং মাখানো ঠোঁট, গাল ও ভুরুতেই কেবল সৌন্দর্যের বাস, তাঁর জন্য গিঁঠ দেওয়া চুল, ফেটে যাওয়া ঠোঁট আর বিবর্ণ গালে সৌন্দর্য কোথায়?

আসলে এ হল সংকীর্ণ দৃষ্টির ফল। সৌন্দর্য দেখার দৃষ্টি যদি বিস্তৃত হয়ে যায়, তবে তিনি দেখতে পাবেন এই রঙীন ঠোঁট এবং গালের আড়ালে যদি রূপের গর্ব আর

নিষ্ঠুরতা থেকে থাকে, তবে ঐ মলিন ঠোঁটে আর গালের উপর শুকিয়ে যাওয়া অশ্রুতে আছে ত্যাগ, শ্রদ্ধা আর কষ্ট সহিষ্ণুতা। তবে হ্যাঁ এতে রঙ, লাস্ত এবং পেলবতা নেই।

আমাদের শিল্প যৌবনের প্রেমে পাগল, অথচ জানেনা যে বুকে হাত রেখে কবিতা পড়া, নায়িকার নিষ্ঠুরতায় কঁকিয়ে কেঁদে ওঠা বা তার রূপের দেমাক আর ছলাকলার কাছে মাথা নত করার মধ্যে যৌবন নেই। আদর্শবাদ, দুঃসাহস, কঠিনতার মুখোমুখী হবার ইচ্ছা আর আত্মত্যাগের নামই যৌবন। এই জন্যই ইকবালের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি :

"আমার মত দুঃসাহসিকের হাতে
জিব্রায়েল—সে তো তুচ্ছ শিকার।
ধরতেই যদি হয়, হে বীর ধরে নিয়ে এস
খোদাকেই তোমার এই ঘরে ॥"

অথবা, "ঢেউএর মতই আমার জীবনতরী—ঝড়কে পরোয়া করেনা,
ভেবোনা, এই সমুদ্রে কূল খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি।"

আর শিল্পে এই দুঃসাহস তখনই জন্ম নেবে, যখন আমাদের সৌন্দর্যবোধ ব্যাপক হবে, যখন সমগ্র সৃষ্টি তার পরিধিতে এসে যাবে। এ কোন বিশেষ শ্রেণীতে সীমিত থাকবে না, কেবলমাত্র বাগিচার চৌহদ্দিতে নয় সমগ্র ভূমণ্ডলকে ঘিরে এই যে বায়ুমণ্ডল—সেখানে সে উড়ে বেড়াবে। তখন কুরুচি আমাদের সহ্য হবে না, তাকে ধ্বংস করবার জন্ত আমরা কোমর বেঁধে তৈয়ার হয়ে যাব। হাজার মানুষ কয়েকজন অত্যাচারীর দাসত্ব করবে—এই অবস্থাকে যখন আমরা সহ্য করতে পারব না, তখন আমরা কেবল কাগজের পৃষ্ঠায় সৃষ্টি করে সন্তুষ্ট থাকব না ;—যে ব্যবস্থা সৌন্দর্য, সুরুচি, আত্মসম্মান এবং মনুষ্যত্বের বিরোধী নয়, আমরা তাই সৃষ্টি করব।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য কেবল মাইফেল সাজান আর মনোরঞ্জনের সামগ্রী সংগ্রহ করা নয়। দয়া করে একে অত নিচুস্তরে নামাবেন না। সাহিত্য দেশভক্তি বা রাজনীতির পিছু পিছু চলবার জন্তও নয়, বরং তা এদের আগে আগে মশাল নিয়ে চলমান এক সত্য।

আমরা প্রায়ই এই অভিযোগ করি যে সমাজে সাহিত্যিকের কোন স্থান নেই : কথাটা উঠেছে ভারতের সাহিত্যিকদের বিষয়ে। সভ্য দেশসমূহে সাহিত্যিক তো সমাজের সম্মানিত সদস্য, আর বড় বড় ধনপতি ও মন্ত্রীমণ্ডলীর সদস্যরা তাঁর দেখা পেলে গৌরব বোধ করেন। অথচ, ভারতবর্ষ এখনও মধ্যযুগীয় অবস্থায় পড়ে আছে। সাহিত্যিক যদি ধনিকের উপযাচক হয়ে থাকাকেই জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে

দেব,. সমাজে যে আন্দোলন, ঘটনাবলী ও বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে যদি তিনি উদাসীন থাকেন, নিজেরই জগৎ সৃষ্টি করে তাতেই যদি তিনি হাসেন কাঁদেন,—তাহলে এই সমাজে যদি তাঁর কোন জায়গা না থাকে তাতে অন্যায় কি?

এতে কোন সন্দেহ নেই যে সাহিত্যিক জন্মান, সাহিত্যিক তৈরী করা যায় না। কিন্তু যদি শিক্ষা এবং জিজ্ঞাসা দ্বারা এই প্রকৃতির দানকে আমরা সমৃদ্ধতর করতে পারি, তবে তাতে নিশ্চয়ই আমরা সাহিত্যের সেবা বেশী করতে পারব। অ্যারিস্টটল ও অন্যান্য বিদ্বান ব্যক্তিগণ সাহিত্যিক হওয়ার জন্য কঠিন শর্ত আরোপ করেছেন, এবং তাঁর মানসিক, নৈতিক, আত্মিক এবং ভাবগত রুচি ও শিক্ষার জন্য বিধিসমূহ নির্দিষ্ট করে গেছেন। কিন্তু আজ হিন্দীতে সাহিত্যিক হবার জন্য শুধু ইচ্ছাই যথেষ্ট মনে করা হয়,—তার জন্য আর কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন বোধ করা হয় না। এক ব্যক্তি রাজনীতি, সমাজনীতি কিংবা মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত,—তথাপি তিনি একজন সাহিত্যিক।

সাহিত্যিকের সম্মুখে আজকাল যে আদর্শ রাখা হয়েছে,—তাতে সর্বপ্রকারে বিদ্যাই তার বিশেষ অঙ্গ হয়ে গেছে,—এবং সাহিত্যের প্রবণতা অহংবাদ ও ব্যক্তিবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা মনস্তাত্বিক এবং সামাজিক হয়ে উঠছে। সাহিত্য এখন ব্যক্তিকে সমাজ থেকে আলাদা করে নয় সমাজের অঙ্গ হিসেবে তাকে দেখে। কারণ সমাজের অস্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তির অস্তিত্ব জড়িত রয়েছে, সমাজ থেকে আলাদা হলে সে মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

আমাদের মধ্যে যাঁরা সর্বোত্তম শিক্ষা ও সর্বোত্তম মানসিক শক্তি পেয়েছেন,—সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্বও ততখানি। যিনি সমাজের অর্থে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে তা শুধুমাত্র নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধিতে লাগান—সেই "মানসিক পুঁজিপতি"কে আমরা শ্রদ্ধার যোগ্য বলে মনে করি না। সমাজ থেকে নিজের জন্য মুনাফা তোলা এমন এক কাজ, যা কোন সাহিত্যিক কখনও পছন্দ করবেন না। এই মানসিক পুঁজির মালিকের কর্তব্য হল সমাজের লাভকে নিজের লাভের চেয়ে অধিক বিবেচনা করে, নিজের বিদ্যা ও যোগ্যতার দ্বারা সমাজকে অধিক লাভবান করার চেষ্টা করা।

আমরা যদি কোন আন্তর্জাতিক সাহিত্যিক সম্মেলনের রিপোর্ট পাঠ করি, তবে দেখতে পাব যে এমন কোন শাস্ত্রীয়, সামাজিক, ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্বিক প্রশ্ন নেই যার উপরে সেখানে বিচার বিবেচনা না হয়। তার পাশাপাশি আমরা যদি আমাদের জ্ঞানের সীমা লক্ষ্য করি, তবে তাতে নিজেদের অজ্ঞানতার লজ্জা বোধ হয়। আমরা এটা ভেবে রেখেছি যে সাহিত্য রচনার জন্য স্বভাবজাত বুদ্ধি এবং শক্তিশালী কলমই যথেষ্ট। এবং এই চিন্তাই আমাদের সাহিত্যিক অবনতির কারণ। আমাদের

সাহিত্যের মানদণ্ডকে উন্নত করতে হবে, যাতে এই সমাজের অধিক মূল্যবান সেবা হয়, যাতে সমাজে যোগ্য ব্যক্তিই অধিকার প্রাপ্ত হন, যাতে জীবনের প্রতিটি বিভাগের উপর আলোচনা করা সম্ভব হয় ;—আমরা যেন অন্যভাষার সাহিত্যের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট না থাকি,—এবং আমরা নিজেদেরই সাহিত্যের পুঁজি বাড়াই।

আমাদের রুচি এবং প্রবৃত্তি অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করে নিতে হবে, এবং সে বিষয়ের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করতে হবে। আমরা যে আর্থিক অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করছি, তাতে এ কাজ কঠিন সন্দেহ নেই,—কিন্তু আমাদের আদর্শকে উচ্চে রাখা চাই। পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছাতে যদি আমরা নাও পারি, তবুও মধ্য পথে তো পৌঁছে যাব, যা নীচে জমিতে পড়ে থাকার থেকে ঢের ভাল। যদি আমাদের হৃদয় প্রেমের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয় আর আমাদের সম্মুখে যদি থাকে সেবার আদর্শ, তবে এমন কোন কঠিন বস্তু নেই যা আমরা জয় করতে না পারি।

ধনসম্পদ যার প্রিয়, সাহিত্য মন্দিরে তার স্থান নেই। এখানে তো এমন উপাসকের প্রয়োজন, যিনি সেবাকে আপন জীবনের সার্থকতা বলে মেনে নিয়েছেন, যাঁর হৃদয়ে আছে বেদনার অনুরণন এবং প্রেমের উদ্দীপনা নিজের সম্মান তো নিজেরই হাতে। যদি আমরা পবিত্র হৃদয়ে সমাজের সেবা করি, তবে সম্মান, প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি আমাদের পায়ে লুটাবে। কিন্তু সম্মান-প্রতিপত্তির চিন্তা কেন আমাদের কাতর করে ? এসব না পেলেই বা আমরা নিরাশ হব কেন ? সেবায় যে আত্মিক আনন্দ, সেই তো আমাদের পুরস্কার ?—সমাজে নিজেদের জাহির করার আর অহঙ্কার করার শখ কেন আমাদের ? অপরের চেয়ে অধিক আরামে থাকার ইচ্ছাই বা কেন আমাদের আকুল করবে ? নিজেদের আমরা ধনপতিদের দলে কেন গণনা করি ? আমরা তো সমাজের পতাকাবাহী সৈনিক, আর সরল জীবন ও উচ্চ চিন্তাই আমাদের লক্ষ্য। যিনি প্রকৃত শিল্পী, তিনি স্বার্থপর হতে পারেন না। তাঁর মনস্তুষ্টির জন্য আত্মপ্রদর্শনের প্রয়োজন নেই—তিনি তা ঘৃণা করেন। ইকবালের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তিনি বলেন :

> "স্বাধীন আমি এবং এতই অভিমানী
> অন্য লোকের এক পেয়ালা জলেও
> মরেই যেতে পারি।"

আমাদের এই সঙ্ঘ এই ধরণেরই কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। সাহিত্যের আসরে পান-ভোজন বা রাগ-রঙ্গের প্রতি এদের লোভ নেই। এঁরা সাহিত্যকে উদ্যোগ ও কর্মের বাণী বহনকারী রূপে গড়ে তুলতে চান। তারা নিয়ে

এ'দের দ্বন্দ্ব নেই। আদর্শ বিরাট হলে ভাষা আপনা থেকেই সরল হয়ে আসে ভাবের সৌন্দর্য প্রসাধনের পরোয়া করে না। যে সাহিত্যিক বিত্তশালীর মুখাপেক্ষী তিনি ধনীর ভাষায় লেখেন, যিনি জনসাধারণের, তিনি জনসাধারণের ভাষায় লেখেন। আমাদের উদ্দেশ্য দেশে এমন এক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা, যাতে আমাদের ঈপ্সিত সাহিত্য সৃষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি হতে পারে।

আমাদের সাহিত্যিকদের মধ্যে কর্মশক্তির অভাব রয়েছে—এ এক তিক্ত সত্য, কিন্তু, এ সম্বন্ধে আমরা চোখ বুজে থাকতে পারি না। এতদিন পর্যন্ত আমরা সাহিত্যের জন্য যে আদর্শ আমাদের সামনে রেখেছিলাম, তার জন্য কর্মের আবশ্যকতা ছিলনা। কর্মের অভাবই ছিল তার গুণ। যতদিন পর্যন্ত সাহিত্যের কাজ ছিল কেবল মন-ভুলানোর সামগ্রী জুটানো, কেবল ঘুমপাড়ানী গান আর কেবল চোখের জল বইয়ে মন হালকা করা,—ততদিন পর্যন্ত তার জন্য কর্মের আবশ্যকতা ছিলনা।

আজ, আমরা সাহিত্যকে কেবল মনোরঞ্জন ও বিলাসিতার বস্তু মনে করি না। আমাদের কষ্টিপাথরে সে সাহিত্যই উত্তীর্ণ হবে—যাতে উচ্চ চিন্তা রয়েছে, স্বাধীনতার অনুভূতি আছে, সৌন্দর্যের প্রকাশ আছে, সৃষ্টির আত্মা রয়েছে, জীবনের বাস্তবতার প্রকাশ আছে যা আমাদের মধ্যে গতি এবং অস্থিরতার জন্ম দেয়, ঘুম পাড়ায় না,—কারণ এখন আর অধিক ঘুমিয়ে থাকা মৃত্যুরই লক্ষণ।

'সাহিত্য কা উদ্দেশ্য' থেকে বঙ্গানুবাদ।

মৃত্যুর তিনসপ্তাহ আগে, অর্থাৎ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি প্রেমচন্দ এই রচনাটি লিখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর 'হংস' পত্রিকার সেপ্টেম্বর সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়। তাঁর শেষ পূর্ণাঙ্গ রচনা।

মহাজনী সভ্যতা

"মুজ্‌দঃ ইয়ে দিল্ কি মসীহা নফ্‌সে মী আয়দ্।
কি জে অন্‌ফাস খুশশ্ বুয়ে কসে মী আয়দ্॥"—ফার্সী কবিতা।

[হৃদয়, আনন্দে উদ্বেল হও, কারণ অমৃতপানি পরিত্রাতা তোমার কাছে আসছেন। ছাখো, জনতার নিঃশ্বাসে সুমিষ্ট সুবাসের ঘ্রাণ ভেসে আসছে।]

সামন্ত সমাজব্যবস্থায় বলবান পেশী আর সাহসী হৃদয় অত্যাবশ্যক বলে গণ্য হত, আর রাজতন্ত্রের ভিত্তি ছিল বুদ্ধিমত্তা, বক্তৃতাশক্তি, নীরব আজ্ঞাপালন। এই দুই ব্যবস্থার অনেক দোষ থাকলেও কিছু গুণও ছিল। মানবমনের সদ্‌গুণগুলো তখনও লুপ্ত হয়ে যায় নি। সামন্ত-ভূস্বামী যেমন শত্রুর রক্তে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতো, নিজের বন্ধু বা উপকারী ব্যক্তির জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করতো না। রাজার আদেশই ছিল আইন, আর তা না মানলে সে বেয়াদবি রাজা কখনও সহ্য করতেন না বটে, কিন্তু তিনি প্রজাপালন করতেন, ন্যায়পরায়ণতাও প্রদর্শন করতেন। কোন অপমান বা অপকারের বদলা নেবার জন্যে অন্য দেশ আক্রমণ করতেন অথবা নিজের মানমর্যাদা, বীরদর্প প্রতিষ্ঠার জন্যে দেশজয় আর রাজ্যবিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হতেন। প্রজার রক্তশোষণের জন্যে রাজা কখনও দেশজয়ে প্রবৃত্ত হতেন না, কারণ রাজা বা সম্রাট জনসাধারণকে নিজ স্বার্থসিদ্ধি আর ধনসংগ্রহের হাতিয়ার বলে কখনই ভাবতেন না, বরং তাদের সুখ-দুঃখের সাথী হতেন, তাদের গুণের আদর করতেন।

কিন্তু আজকের এই মহাজনী সভ্যতায় সব কার্যকলাপের একমাত্র লক্ষ্য হল পয়সা। কোন দেশকে পদানত করা হয় শুধু এইজন্যই যাতে মহাজন আর পুঁজিপতিরা চূড়ান্ত মুনাফা লুটতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আজ

সারা দুনিয়া জুড়ে মহাজনদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত।

মানব সমাজ আজ দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। অধিকাংশ মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষে চলেছে প্রাণপণে আর মুষ্টিমেয় মানুষ নিজেদের শক্তি আর প্রভাব খাটিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে নিজেদের গোলাম বানিয়ে রেখেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ এই দুর্ভাগা মানুষদের জন্য এদের এতটুকু সহানুভূতি, এতটুকু সমবেদনা নেই। এই মানুষেরা বেঁচে আছে শুধু তাদের প্রভুদের জন্যে রক্ত আর ঘাম ঝরাতে, আর একদিন এই দুনিয়া থেকে নিঃশব্দে বিদায় নিতে। সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে শাসকশ্রেণীর ধ্যানধারণা শাসিতশ্রেণীর মধ্যেও প্রবেশ করেছে, তার ফলে প্রত্যেক মানুষ আজ নিজেকে মনে করে শিকারী আর তার শিকার হল সমাজ। এরা আজ সমাজ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গিয়েছে, সমাজের সঙ্গে এদের একমাত্র সম্বন্ধ হল কোনরকম ফন্দিফিকির করে সমাজকে বোকা বানানো আর এর ভেতর দিয়ে যতটা পারা যায় ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করা।

অর্থলোভ মানুষের ভাব-ভাবনাকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। মানুষের সততা, মেধা, গুণপনা আর দক্ষতা কেবল টাকার অঙ্কে পরিমাপ হয়। টাকা থাকলেই সে দেবতা,—তার মনের ভেতরটা যতই অন্ধকার হোক না কেন। সাহিত্য, সংগীত, কলাবিদ্যা সমস্তই আজ টাকার কাছে মাথা বিকিয়ে বসে আছে। পৃথিবীর বাতাস আজ এমন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে যে বেঁচে থাকাই হয়ে উঠেছে কঠিন। ডাক্তার-কোবরেজ আজ মোটা ফী না পেলে কথা পর্যন্ত বলে না, উকীল আর ব্যারিস্টার মোহরের হিসেবে সময়ের মূল্যায়ন করে। গুণ আর সাফল্যের বিচার হয় টাকা রোজগারের নিরিখে। মৌলবী সাহেব আর পণ্ডিতজীরা আজ বড়লোকের বিনিপয়সার গোলাম, খবরের কাগজ ধনীর দোহার। অর্থলোভ মানুষের চৈতন্যকে এমন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে ধনিক সমাজের ওপর কোনপ্রকার আক্রমণ চালানো কঠিন ও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। স্নেহ-মমতা-সততা-ভদ্রতার প্রতিমূর্তি মানুষ আজ দয়ামায়াহীন নিষ্প্রাণ যন্ত্রমাত্র। মহাজনী সভ্যতা যেসব নূতন নূতন নিয়ম-কানুন তৈরী করেছে, তার ওপর নির্ভর করেই আজকের সমাজ জীবন চলছে। এই সব নিয়মের অন্যতম হল 'সময়ই টাকাকড়ি।' পূর্বে সময় ছিল জীবনের প্রতীক, আর জ্ঞান বা শিল্পচর্চা, বা আর্ত মানুষের সেবাকেই সময়ের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার মনে করা হত। আজ সময়ের সেরা উপযোগ হল পয়সা কামানো ডাক্তার রোগীর নাড়িতে হাত দিয়েই ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকান, তাঁর কাছে প্রতি মিনিটের দাম একটি করে স্বর্ণমুদ্রা। যে রোগী তাঁকে একটিমাত্র স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা দিয়েছে তাকে পরীক্ষা করতে এক মিনিটের বেশি সময় ব্যয় করতে রাজি নন

রোগী তাঁকে নিজ রোগযন্ত্রণার কথা শোনাবার জন্ম অধীর; কিন্তু ডাক্তার সাহেবের সে সব শোনবার ইচ্ছা নেই একটুও। রোগীর প্রতি সামান্যতম দরদ তাঁর নেই, তাঁর চোখে রোগীর মূল্য এইমাত্র যে সে তাঁকে ফি-এর টাকা যোগায়। তাই তিনি তাড়াতাড়ি ব্যবস্থাপত্র লিখেই আর এক রোগী দেখতে ছোটেন। ছেলে পড়াতে যান মাস্টার মশাই—মাত্র একঘণ্টা সময় বরাদ্দ। ঘড়ি সামনে রেখে পড়াতে বসেন, একঘণ্টা শেষ হতেই উঠে পড়েন। ছাত্রের অর্দ্ধেক পড়া মাত্র তৈরী হয়েছে, তাতে তাঁর কী আসে যায়? সময় হল টাকা, উনি একঘণ্টার বেশী দেন কী করে? ধনলোভে মানুষের মনুষ্যত্ব, বন্ধুপ্রীতি পর্যন্ত ভুলিয়ে দিচ্ছে। বৌ ছেলেমেয়ের সঙ্গে পর্যন্ত কথা বলবার অবসর নেই যেখানে স্বামীর, সেখানে আত্মীয়-বন্ধুর তো কথাই নেই। যতক্ষণ কথা বলবে ততক্ষণে কিছু রোজগার হবে। পয়সাতেই সময়ের সার্থকতা, নইলে সময় নষ্ট। না খেয়ে-ঘুমিয়ে চলে না বলেই বেচারা মানুষকে তার জন্যে এত সময় নষ্ট করতে হয়।

আপনার কোন বন্ধু বা আত্মীয় শহরের নামী লোক হয়েছেন, তাহলে জানবেন, আপনার সঙ্গে আর তাঁর হৃদ্যতা রইলো না। তাঁর বাড়ী গিয়ে আপনাকে দেখা করবার জন্ম কার্ড পাঠাতে হবে। সে ভদ্রলোকের এখন অনেক কাজ, তাই অতিকষ্টে আপনার সঙ্গে দু একটা কথা বলবেন, নয় তো সোজা বলে দেবেন যে আজ অবসর নেই। এখন উনি পয়সার পূজারী, বন্ধুত্ব আর শিষ্টাচারের পাট অনেকদিন চুকিয়ে দিয়েছেন।

আপনার এক উকীল বন্ধু আছে। যদি কোন মামলায় জড়িয়ে পড়েন তবে তাঁর কাছ থেকে কোন সাহায্য প্রত্যাশা করবেন না। উনি যদি চোখের চামড়া একেবারে বিসর্জন দিতে না পেরে থাকেন তবে হয় তো আপনার কাছে টাকাকড়ির কথা না তুলতেও পারেন, কিন্তু আপনার মামলায় সামান্যতম সময় ব্যয় করবার অবসর তাঁর হবে না। এর চেয়ে কোন অপরিচিত উকীলের কাছে গিয়ে পুরো ফি দিয়ে কাজ করানো অনেক ভালো। ভগবানের দোহাই, কেউ যেন কোনদিন বড়মানুষ না হয়, তাহলে তার ভেতর মনুষ্যত্বের চিহ্নমাত্র থাকবে না. কারণ প্রতিটি মিনিট তখন মূল্যবান হয়ে উঠবে তাঁর কাছে।

আমি কিন্তু এ কথা বলছি নে যে বৃথা গল্পগুজব করে সময় নষ্ট করা উচিত, আমার বক্তব্য হল ধনলোভ যাতে এমন প্রবল হয়ে না ওঠে যে সেজন্ম মনুষ্যত্ব, বন্ধুত্ব, স্নেহ-সহানুভূতি প্রভৃতি সব জলাঞ্জলি দিতে হয়।

কিন্তু এসব পয়সার দাসদের তো নিন্দা করা উচিত নয় কারণ সারা দুনিয়ায় যে হাওয়া বইছে তারাও সেই হাওয়ায় পাল উড়িয়েছে। মানসম্মানের আকাঙ্ক্ষা

মানবজীবনের লক্ষ্য চিরকাল। যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান-কলাসাধনা মানসম্মান অর্জনের উপায় ছিল তখন লোকে এসবের সাধনা করতো। এখন মানসম্মান লাভের একমাত্র উপায় ধন-অর্জন, তাই আজ মানুষ একনিষ্ঠ হয়ে ধনের উপাসনা করে চলেছে। সে সাধু-সন্ত বা উদাসী-সন্ন্যাসী নয়, তাই সে বুঝতে পারে যে যারা জীবনে মানসম্মান লাভ করেছে তাদের সবাইকেই তার মতো পয়সা কামাবার রাজপথ ধরেই এগুতে হয়েছে। জীবনের লক্ষ্যঅর্জন সকল মানুষের কাছে সময়ই পয়সা। সে এই আদর্শকেই অনুসরণ করতে দেখতে পায় বলেই তার অনুকরণ করে। তাই, তাকে দোষ দেওয়া কেন? মন থেকে মানসম্মানের লোভ তো দূর করা যাবে না। সে দেখতে পাচ্ছে যে সময়কে পয়সা বলে কখনও মনে করে নি, তার টাকা পয়সা নেই। আর তাই তাকে কেউ খাতির করে না, নিজ বৃত্তিতে সে দক্ষ হলেও তাকে কোথাও মর্যাদা দেওয়া হয় না। যে মানুষের মনে জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের কামনা আছে সে কখনই এই উপেক্ষার সম্ভাবনাকে সহ্য করতে পারে না। সহানুভূতি, বন্ধুপ্রীতি, শিষ্টাচার প্রভৃতি মানসিক আবেগ মন থেকে মুছে ফেলে তাকে পয়সার আরাধনায় মত্ত হতে হয়, তবেই তার আশীর্বাদ পাওয়া যায়। স্বেচ্ছায় সে যে একাজ করে তা নয়, তাকে এ কাজ করতে বাধ্য হতে হয়। মানুষের মানসিক অবস্থা আজ নিজে থেকেই এমন হয়ে গিয়েছে যে টাকা রোজগার ছাড়া আর কোন কাজে তার মন নেই। কোন সভায় বা বক্তৃতায় যোগ দেবার জন্য আধঘণ্টা কাটাতে হলে তার যেন বন্দিদশা উপস্থিত হয়। তার সমগ্র মানসিক, ভাবগত ও সাংস্কৃতিক চিন্তা আজ টাকাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। আর হবে নাই বা কেন? সে দেখতে পাচ্ছে যে পয়সা না থাকলে কেও তার পাশে এসে দাঁড়ায় না, তার বন্ধু, তার স্নেহভাজন মানুষেরাও টাকার লোভেই তার কাছে আসে, আত্মীয়-স্বজন তার টাকাকেই পূজা করে। সে জানে যে সে যদি দরিদ্র হয় তবে এখন তার কাছে যে বন্ধুরা ভীড় জমাচ্ছে তাদের কারো দেখা আর পাওয়া যাবে না, কোন আত্মীয়-স্বজন আর তার কাছে আসবে না। তাকে নিজের জন্য মর্যাদার স্থান বানাতে হবে সমাজে, বুড়ো বয়সের জন্য কিছু জমিয়ে রাখতে হবে, ছেলে মেয়েদের জন্য এমন ব্যবস্থা করে যেতে হবে যাতে তাদের 'হা-অন্ন' 'হা-অন্ন' করে ঘুরে বেড়াতে না হয়। এই নিষ্ঠুর, সহানুভূতিহীন দুনিয়ার চেহারা তার চেনা, তাই সে নিজের ছেলেমেয়েদের এমন কোন দুঃসহ অবস্থার ভেতর ফেলে যেতে চায় না যাতে তাদের সমস্ত আশা ফুৎকারে নিভে যায়, সমস্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা ধ্বংস হয়। জীবনের অত্যাবশ্যক অঙ্গ এ সমস্তকিছুই তাকে সম্পূর্ণ করে যেতে হবে এবং জীবন-ব্যবসায়ের নিয়মগুলো মেনে না চললে তার পক্ষে এতগুলো কর্তব্যের কোনটাই সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে না।

এই সভ্যতার দ্বিতীয় বিধান, "বিজ্‌নেস ইজ বিজ্‌নেস", অর্থাৎ জীবন এক বেচাকেনার হাট, এখানে ভাবুকতার স্থান নেই। প্রাচীন জীবনধারার বিধি-বিধানে এরকম নগ্ন স্বার্থপরতার প্রকাশ ছিল না,—একে এককথায় নির্লজ্জতাও বলা যেতে পারে। নির্লজ্জতাই মহাজনী সভ্যতার আত্মা, তার মূল ভিত্তি। এখানে দেনা-পাওনার দরকষাকষি আছে, পয়সাকড়ির হিসাব-নিকাশ আছে, কিন্তু বন্ধুত্ব, শিষ্টাচার, মনুষ্যত্বের কোন স্থান নেই। 'বিজনেস'-এ আবার দোস্তি কী? মানুষ যখন এই নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে চলতে আরম্ভ করে তখন ভাষা মূক হয়ে যায়, বলবার আর কিছু থাকে না। কোন ব্যক্তি দুর্দশায় পড়ে নিরুপায় হয়ে তার কোন মহাজন বন্ধুর কাছে গেলো আশায় যে সে তাকে কিছু সাহায্য করবে। তার আশা যে মহাজন বন্ধু তার জন্যে সুদের হার কিছু কম করবে। কিন্তু সে দেখতে পায় যে তার 'মহানুভব' বন্ধু তার বেলাতেও একই ধরণের ব্যবসায়ী কায়দা অনুসরণ করেছে। তখন সে কিছু সুবিধা পাবার প্রার্থনা জানায়,বন্ধুত্ব আর ঘনিষ্ঠতার দোহাই দিয়ে সজল চোখে, করুণ কণ্ঠে বলে, "মহাশয়, এখন আমার বড় কষ্ট যাচ্ছে, নইলে আপনার অসুবিধা সৃষ্টি করতাম না। ভগবানের দোহাই, আমার অবস্থা দেখে আমাকে দয়া করুন,—আমি তো আপনার অনেক দিনের বন্ধু…।" তার কাতর নিবেদন উপেক্ষা করে সেই মহাজন বন্ধু আদেশের ভঙ্গীতে জবাব দেয়, "মশাই আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে 'বিজ্‌নেস ইজ বিজ্‌নেস'।" তখন সেই কাতর প্রার্থীর মাথায় বজ্রাঘাত হয়,—আর কোন যুক্তি, কোন আবেদন জানাবার ভাষা তার থাকে না, চুপচাপ সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে, নয়তো ব্যবসায়ী নীতিতে অটল বন্ধুর সমস্ত শর্ত মেনে নেয়।

এই মহাজনী সভ্যতা দুনিয়া জুড়ে যে সব কানুন চালু করেছে তার ভেতর 'ব্যবসার জন্য ব্যবসা' নীতিই সবচেয়ে মারাত্মক, সবচেয়ে রক্তলোলুপ। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, বাপ-ছেলের সম্বন্ধ, গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ সবই ব্যবসা হয়ে উঠেছে, মানুষের সমস্ত আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সম্পর্কের ঘটেছে সমাপ্তি। মানুষের মধ্যে একমাত্র পারস্পরিক সম্পর্ক হল ব্যবসায়িক সম্পর্ক,—এই নীতি জাহান্নামে যাক্। মেয়ে দুর্ভাগ্যবশতঃ অবিবাহিত থেকে গেলে আর জীবিকার্জনের কোন ব্যবস্থা করতে না পারলে পিতৃগৃহে তাকে চাকরানী হয়ে থাকতে হয়। গেরস্ত-ঘরে ছেলেমেয়েরাই সংসারের কাজকর্ম করে, সেজন্যে তাদের কেউ দাসদাসী মনে করে না, কিন্তু এই মহাজনী সভ্যতায় এক বিশেষ বয়সের পর অনূঢ়া মেয়ে হয়ে দাঁড়ায় বাড়ির ঝি আর তার ভাই-ভাজেদের মজুরনী। শ্রদ্ধেয় বাপ-মা পর্যন্ত নিজের ছেলের দাসদাসীতে পরিণত হয়,—আত্মীয়-স্বজনের কথা আর কি বলবো। ভায়ের বাড়ীতে ভাই গেলে

অতিথি মনে করা হয়, এমন কি আতিথ্য গ্রহণের খেসারত হিসেবে খাওয়া-খ
পর্যন্ত বহন করতে হয় আগন্তুক ভাইকে। এই সভ্যতার একমাত্র লক্ষ্য ব্যক্তিস্বার্থ
কিন্তু এ জন্যে কাউকে তো দোষ দেওয়া যায় না। মানসম্মানের আকাঙ্ক্ষ
ভবিষ্যতের ভাবনা, মৃত্যুর পর স্ত্রীপুত্রের ভরণ-পোষণের চিন্তা, ঠাট-বাট রক্ষা
উৎকণ্ঠা প্রত্যেক মানুষের ঘাড়ে সিন্ধবাদের গল্পের বুড়োর মতো এমন জাকিয়ে
আছে যে ঘাড় ফেরাতেও দিচ্ছে না। মানুষ এই সভ্যতার আইন-কানুন মেনে
চললে নিজের ভবিষ্যতই অন্ধকার হয়ে যায়।

এতদিন এই মহাজনী সভ্যতার রীতিনীতি অনুসরণ করা ছাড়া দুনিয়ার মানুষে
আর কোন উপায় ছিল না। প্রত্যেককেই এই ব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করে
হত। তাই মহাজনেরা আনন্দ-উৎসাহে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। সারা দুনিয়া তাদে
পায়ে মাথা ঘষ্‌ছিল। তাদের সেবক স্বয়ং সম্রাট, মন্ত্রী তাদের ভৃত্য, যুদ্ধবিগ্রহে
চাবিকাঠি তাদের হাতের মুঠোয়, পৃথিবী তাদের প্রভুত্বগর্বের কাছে মাথা নত ক
আছে,—সব দেশে তাদের অপ্রতিহত প্রতাপ।

কিন্তু সম্প্রতি এক নূতন সভ্যতার অরুণোদয় ঘটেছে সুদূর পশ্চিম দিগন্তে—যে সভ্য
এই নারকীয় মহাজনবাদ বা পুঁজিবাদের শিকড় উপড়ে ফেলে দিয়েছে, যার মূ
নীতি হল এই যে যাদের কায়িক ও মানসিক শ্রমের ফলে সম্পদ উৎপন্ন হয় তারা
রাষ্ট্র ও সমাজের পরম সম্মানিত নাগরিক। আর যারা অন্যের শ্রমের ফল আত্মসা
করে অথবা বাপ-ঠাকুর্দার জমানো পয়সায় নবাবী করে বেড়ায় তারা সমাজে
হীনতম প্রাণী। রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করবার অধিকার তাদের থাকবে ন
তারা নাগরিক অধিকার লাভেরও যোগ্য হবে না। এই নবীন আদর্শের প্রব
জোয়ারে আজ মহাজনেরা বড় উদ্বিগ্ন হয়ে ক্ষেপে উঠেছে আর সারা দুনিয়া
মহাজনগোষ্ঠীর সম্মিলিত কণ্ঠ এই নবীন সভ্যতার নিন্দায় সোচ্চার হয়ে উঠেছে
একে অভিশাপ দিচ্ছে, বলছে যে এই নবসভ্যতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ধর্ম, চিন্তা
স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত ইচ্ছানুযায়ী জীবন যাপনের স্বাধীনতার হত্যাকারী
স্বাসরোধকারী। এই নবীন ভাবধারার বিরুদ্ধে নিত্য-নূতন অভিযোগ উত্থাপন ক
করা হচ্ছে, নিত্য নূতন কুৎসায় দুনিয়ার মানুষের কান ভারী করা হচ্ছে, এে
চিত্রিত করা হয়েছে গভীরতম মসিরেখায়, নানা কুত্রিমরূপে। ধনীকশ্রেণীর কা
সুলভ হাতিয়ারের সাহায্যে এর বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু এই অন্ধক
আবরণ ভেদ করে নবীন সভ্যতার প্রকৃত রূপটি সৌরতেজে দুনিয়াকে আলো
উদ্ভাসিত করে তুলছে।

এই নবীন সভ্যতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভেকধারী মহাজনী সভ্যতার দাঁত-নখ ভোঁ

করে দিয়েছে। সে দেশে এখন আর কোন পুঁজিবাদী লক্ষ শ্রমিকের রক্ত শুষে মোটা হতে পারে না, সেখানে তাদের এ স্বাধীনতা নেই যে মুনাফার জন্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ায়, গোলাবারুদ আর লড়াইয়ের হাতিয়ার বানিয়ে দুর্বল রাষ্ট্রকে পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখে। পুঁজিপতি মুনাফাখোরদের রক্তশোষণের সুযোগকে যদি স্বাধীনতা বলা হয় তবে অবশ্যই এই নূতন সভ্যতায় স্বাধীনতার চিহ্নমাত্র নেই কিন্তু স্বাধীনতা বলতে যদি জনসাধারণের জন্য খোলা-মেলা বাড়ীঘর, পুষ্টিকর খাদ্য স্বাস্থ্যকর গ্রাম, শরীরচর্চা আর অবসর বিনোদনের সুযোগ, বিজলী বাতি আর পাখা, স্বল্পব্যয়ে ন্যায়-বিচারের সুযোগ-সুবিধাকে বোঝায়, তাহলে এই নবীন সমাজব্যবস্থায় যে স্বাধীনতা আর মুক্তি আছে, দুনিয়াতে সবচেয়ে উন্নত বলে পরিচিত কোন রাষ্ট্রে তার দেখা পাওয়া যাবে না। ধর্মীয় স্বাধীনতার অর্থ যদি মোল্লা-পুরুত-পাদ্রি নামক পরাশ্রয়জীবিদের দাম্ভিক উপদেশ আর অন্ধবিশ্বাসজনিত আচার আচরণের অনুষ্ঠান হয় তবে নিশ্চয়ই এই নবীন সভ্যতায় তার অস্তিত্ব নেই। আর ধর্মীয় স্বাধীনতার অর্থ যদি লোকসেবা, সহিষ্ণুতা, সমাজের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিস্বার্থ বলিদান, সততা শরীর আর মনের পবিত্রতাকে বোঝায় তবে এই সভ্যতায় ধর্মাচরণের যে অবাধ স্বাধীনতা বর্তমান, অন্য কোন দেশে তার চিহ্নমাত্র পাওয়া যাবে না।

যেখানে ধনবৈষম্যের ফলে সামাজিক অসাম্যের প্রাধান্য আছে সেখানেই দ্বেষ-হিংসা বলপ্রয়োগ, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাচার, নালিস-ফরিয়াদ, বেশ্যাবৃত্তি, ব্যভিচার প্রভৃতি দুনিয়ার সমস্ত গ্লানি-পঙ্কিলতার উপস্থিতি অনিবার্য। যেখানে ধনবৈষম্য নেই, অধিকাংশ মানুষের আর্থিক অবস্থা সমান, সেখানে প্রবঞ্চনা আর জুলুমবাজি কেন থাকবে, কেন ঘটবে সতীত্ব বিক্রয় আর ব্যভিচার? এই সব গ্লানি-পঙ্কিলতা তো মহাজনী সভ্যতার অবদান, অর্থলোভের পরিণাম। মহাজনী সভ্যতাই এসবের স্রষ্টা, জন্মদাতা। এই সভ্যতাই সকল সামাজিক গ্লানি-পঙ্কিলতাকে পালন-পোষণ করে আর তার উদ্দেশ্য হল যে দলিত, উৎপীড়িত ও বিজিত জনসমাজ যেন এই ব্যবস্থাকেই ঐশ্বরিক বিধান মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। তাদের পক্ষ থেকে সামান্যতম বিদ্রোহ-বিরোধের লক্ষণ দেখা গেলে তাদের মাথা কেটে দেবার জন্যে পুলিশ, আদালত, দ্বীপান্তরের ঢালাও বন্দোবস্তও করে রাখা হয়েছে মহাজনী সভ্যতার তরফ থেকে। মদ খেলে যেমন মাতাল না হয়ে কেউ পারে না, আগুন লাগাবার পর তাতে যেমন দগ্ধ হতেই হয়, তেমনি ব্যক্তিগত ধনলোভও সকল গ্লানি-পঙ্কিলতার সৃষ্টি করবেই, পৃথিবীকে নরকে পরিণত করবেই,—আর তাই করেছে। এই পয়সাপূজার রীতি মুছে ফেলতে পারলেই দুনিয়ার সমস্ত কলঙ্ক, সকল অমঙ্গল দূর হয়ে যাবে,—বিষবৃক্ষের শিকড় উপড়ে না ফেলে কেবলমাত্র ডালপালা কেটে

তাকে ধ্বংস করা যায় না। নবীন সভ্যতা বিত্তশালী হওয়াকে হেয়, লজ্জাজনক আর ক্ষতিকারক বিষ বলে মনে করে। সেখানে কেউ বড়মানুষি দেখালে তাকে ঈর্ষা-সম্ভ্রমের পাত্র বলে মনে করা হয় না, বরং ক্ষুদ্র আর হেয় মনে করা হয়। অলংকারে সারা শরীরে-ঢাকা স্ত্রীলোক সেখানে সুন্দরী বলে বিবেচিত হয় না, ঘৃণার পাত্র বলে গণ্য হয়, সমগ্র জনসাধারণের জীবনযাত্রার চেয়ে উচ্চস্তরের জীবনযাপনকে কুরুচির পরিচায়ক বলে মনে করা হয়। এখানে মদ খেয়ে মাতলামি নিষিদ্ধ কারণ অধিক মদ্যপান পাপ বলে চিহ্নিত,—ধর্মীয় দৃষ্টিতে নয়, বিশুদ্ধ সামাজিক দৃষ্টিতে,—কারণ অতিরিক্ত মদ খাওয়ার ফলে মানুষের ধৈর্য, কর্মসহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় আর শ্রমশীলতা নষ্ট হয়ে যায়।

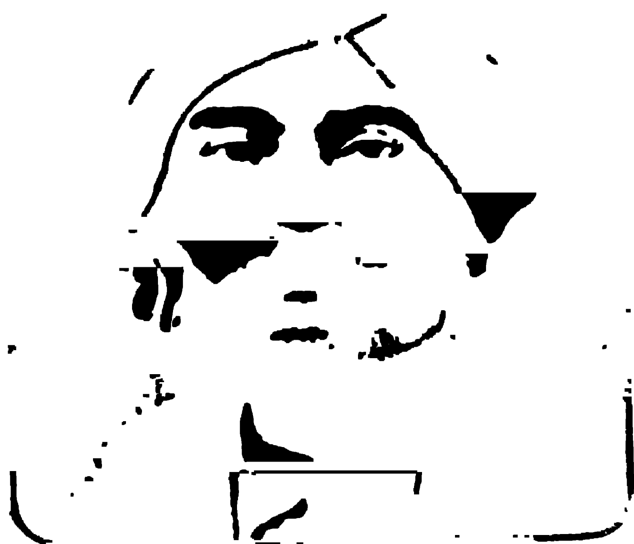
এই সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিবিশেষের এমন স্বাধীনতা নেই যে কোন মানুষ নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্য জনসাধারণকে ব্যবহার করবে, নানা ছুতোয় তাদের শ্রম থেকে মুনাফা লুটবে কিংবা উচ্চ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হয়ে দু'হাতে পয়সা ওড়াবে আর গোঁফে তা' দিয়ে বেড়াবে। এখানে উচ্চতম সরকারী পদাধিকারীর বেতন দক্ষ কারিগরের বেতনের সমান। আকাশ-ছোঁয়া প্রাসাদে সে থাকতে পারে না, তিন-চার কামরা ঘরেই তাকে বাস করতে হয়। তার স্ত্রী রানীসাহেবা কি বেগম সাহেবা নামধারিণী হয়ে বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিলিয়ে বেড়াতে পায় না. হয় তাকে শ্রমিকের মত মেহনত করতে হয়, নয় তো কোন সংবাদপত্রের দফ্‌তরে কর্মী হতে হয়। সরকারী পদাধিকারী ব্যক্তি নিজেকে লাটসাহেব মনে করে না, জনতার সেবক মনে করে। মহাজনী সভ্যতার অন্তর্গত মানুষও এই সভ্যতাকে কেন পছন্দ করছে যেখানে অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য সোনারূপার পাহাড় তৈরী করার সুবিধা নেই? পুঁজিপতি আর জমিদারশ্রেণী তো এই সভ্যতার কল্পনা করতেও ভয়ে কাঁপে। ওদের ভয়ের কারণ বুঝতে অবশ্য অসুবিধা হয় না। কিন্তু যারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে মহাজনী সভ্যতার ভিত্তি রক্ষা করে চলেছে, তারা যখন এই নবীন সভ্যতার নিন্দা-কুৎসায় মুখর হয়ে ওঠে তখন আর না হেসে পারা যায় না। যার ভেতর মনুষ্যত্ব, আধ্যাত্মিকতা, মহত্ব আর সৌন্দর্যবোধ আছে সে কখনই ঘৃণ্য লোলুপতা, স্বার্থপরতা আর পশু-মনোবৃত্তির ওপর গড়ে ওঠা এ সমাজ-ব্যবস্থাকে সমর্থন করতে পারে না। ঈশ্বর মানুষকে যে বিদ্যা আর শিল্পচেতনা দিয়েছেন তার সর্বশ্রেষ্ঠ উপযোগ হল জনগণের সেবা করা, জনসমাজের ওপর আধিপত্য চালানো, জনতার রক্তশোষণ আর সমাজকে প্রবঞ্চনা করা নয়।

যে সভ্যতা বিত্তসঞ্চয় আর ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান ঘটিয়ে চলেছে সে ধন্য। অবিলম্বেই হোক আর দেরিতেই হোক সারা দুনিয়া তাকে অনুসরণ করবেই। এই

সভ্যতা দেশবিদেশের সমাজ ব্যবস্থা বা ধর্মসংস্কৃতির সঙ্গে বা তার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খায় না, এই বিতর্ক নিতান্ত অসঙ্গত। খ্রীষ্টধর্মের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল জেরুজালেম-এ, কিন্তু দুনিয়া জুড়ে আজ তা সম্প্রসারিত। বৌদ্ধ দর্শন জন্ম নিয়েছিল উত্তর ভারতে, কিন্তু আজ অর্ধেক পৃথিবী এই ধর্মের কাছে মাথা নোয়ায়। সারা দুনিয়ার মানুষের প্রকৃতি এক, ছোটখাটো ব্যাপারে পার্থক্য থাকলেও সামগ্রিক দৃষ্টিতে মানবজাতির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যে শাসনরীতি আর সমাজব্যবস্থা এক দেশের ক্ষেত্রে কল্যাণকর হয়েছে, অন্য দেশের ক্ষেত্রেও তা হিতকর হতে বাধ্য। এটা অবশ্য অবধারিত যে মহাজনী সভ্যতা আর তার স্তাবকেরা নিজেদের সমস্ত শক্তি দিয়ে এই নবীন সমাজব্যবস্থার বিরোধিতা করবে, এর সম্বন্ধে নানা মিথ্যাপ্রচার চালিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করবে, তাদের চোখে ধুলো দেবে, কিন্তু যা সত্য একদিন তার জয় হবেই হবে।

....

মূল হিন্দী প্রবন্ধ 'মহাজনী সভ্যতা' থেকে অনুবাদ : বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়



প্রেমচন্দ

সংক্ষিপ্ত উপন্যাস

গোদান

প্রেমচন্দের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১৯৩৬, জুন, অর্থাৎ মৃত্যুর মাত্র কয়েকমাস পূর্বে। ধারাবাহিকভাবে 'হংস' ও পরে 'জাগরণে' ১৯৩২ সাল থেকে প্রকাশ শুরু হয়। অসুস্থতা ও নানা কারণে প্রকাশ বিঘ্নিত হয়। বর্তমান সংক্ষিপ্তরূপটি মূল উপন্যাসের এক পঞ্চমাংশ। মূলে ৩৬টি অধ্যায় আছে। এখানে আমাদের সুবিধামত অধ্যায় ভাগ করেছি, কিন্তু এর কাঠামো, বর্ণনা, সংলাপ ও বাগভঙ্গি মূলানুগ। সংক্ষিপ্তকরণের প্রয়োজনে এখানে ওখানে কিছু সংযোজক বাক্য ভিন্ন আর সবই মূলের। মূল কাহিনী এবং তার অজস্র ধারা উপধারার প্রায় সমস্তটাই তুলে ধরায় চেষ্টা করা হয়েছে, বলা বাহুল্য এত স্বল্প পরিসরে তা পুরাপুরি সম্ভব নয়। প্রিয়রঞ্জন সেন ও স্বর্ণপ্রভা সেনের অনুদিত "গোদান"কে আমরা ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছি, এবং মূল হিন্দী ও তার ইংরেজী অনুবাদ "Thc gift of a cow" এর সাহায্য নিয়েছি।

হরিরাম বলদদুটিকে দানাপানি দিয়ে এসে বৌ ধনিয়াকে বললে, গোবরকে আখের ক্ষেতে পাঠিও। আমার ফিরতে কত বেলা হবে কে জানে। আর শোন, আমার লাঠিখানা দাওতো।

ধনিয়ার দু'হাত গোবর মাখা। সে ঘুঁটে দিচ্ছিল। বললে, আরে আগে জলটল তো খাও। এত তাড়া কিসের।

রুক্ষ চুল ভরা মাথাটিতে ঝাঁকুনি দিয়ে হরি বললে, তোমার তো জলখাবারের চিন্তা। এদিকে দেরী হলে মালিকের সাথে শেষে দেখাই হবেনা। স্নান আহ্নিকে চলে গেলে তো এক ঘণ্টার ধাক্কা।

আরে, সেজন্যই তো বলি, জলটল খেয়ে যাও। আর না গেলেই বা কি ক্ষতি। এই তো পরশুই গেলে।

তুই যা বুঝিস না, তাতে ঠোকর মারিস কেন বলত ? দে আমার লাঠিখানা দে আর নিজের কাজ কর। এই যে যাওয়া আসা করি, এই জন্যই না আজ প্রাণে বেঁচে আছি। গ্রামে এত লোক তো আছে, কার না জমি বেদখল হয়েছে, কার ওপর না সমন আসেনি !

ধনিয়া এসব মারপ্যাঁচ বোঝেনা। আমরা খেতে চাষ দেব। মালিক ফসল পাবে। এই হল নিয়ম।! তা মালিকের খোসামুদি করা কেন বাপু। তবে

তার বিশ বৎসরের বিবাহিত জীবনে ধনিয়া দেখেছে যে যত কিছুই কর, পুরো ফসল কিছুতেই পাওয়া সম্ভব নয়। তবু ও হার মানতে চায় না। এ নিয়ে স্বামীর সঙ্গে ওর চিরদিনের বিবাদ। ধনিয়ার ছয়টি সন্তানের মধ্যে মাত্র তিনটি জীবিত। বছর ষোল বয়সের ছেলে গোবর, দুই মেয়ে সোনা ও রূপা। প্রথমটির বয়স বারো, দ্বিতীয়টির আট। বাকীগুলি ওষুধপত্রের অভাবে মারা গেছে। ধনিয়ার নিজের বয়সও তো মাত্র ছত্রিশ—কিন্তু এরই মধ্যে চুলে পাক ধরেছে, চামড়া ঝুলে পড়েছে, সুন্দর ফর্সা রং কালি হয়ে গেছে, চোখেও কম দেখতে সুরু করেছে। পেটের চিন্তাই তো এর কারণ জীবনে সুখ কখনও দেখেনি। এই চিরস্থায়ী দারিদ্র্য ওর আত্মসম্মানকে বৈরাগ্যমণ্ডিত করেছে। ওর মন সর্বদাই বিদ্রোহ করত। আর দু'একবার ধমক খেয়ে তবে থামত।

যথারীতি স্বামীর কাছে ওকে হার মানতে হল। ধনিয়া হরির লাঠি মেরজাই, পাগড়ি, জুতা, তামাকের থলি এনে হাজির করল। হরি ঠাট্টা করে বললে: কি গো শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছি নাকি? আর শ্বশুর বাড়ীতেও তো কোনও শালী শালাজ নেই যে দেখবে?

ধনিয়া সলজ্জ হেসে বললে, আহা, নিজেই যেন কত জোয়ান আছ, যে শালী শালাজরা মজবে!

হরি তড়াক করে উঠে বললে, কী, তুমি ভাবছ আমি বুড়ো হয়ে গেছি? এখনও তো চল্লিশই হয় নাই। মরদ তো ষাট বছরেও তাগড়া থাকে।

যাও না, গিয়ে আয়নায় মুখটা দেখে এস। তোমার মত পুরুষ "ষাটে পাঁঠা" থাকে না। কতই না দুধ ঘি খাচ্ছ, তার আবার চেহারা।

হরির মুখের ক্ষনিকের কোমলতা বাস্তবের আঁচে গলে গেল। লাঠি সামলাতে সামলাতে বললে, ষাট পর্যন্ত টেঁকার ভাগ্য আমার হবে না রে, ধনিয়া। তার আগেই টেঁসে যাব।

ধনিয়া রাগ করে বললে, রাখ, রাখ ওসব অলুক্ষণের কথা।

লাঠি কাঁধে হরি যখন ঘরের বার হল, তখন দরজার কাছে এসে ধনিয়া অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। হরিব এই ভয়ানক কথাগুলি ধনিয়ার শোকতপ্ত বুকে দোলা দিতে লাগল। ও যেন নিজের নারীত্বের আর নিয়ম নিষ্ঠার তেজে স্বামীকে অভয় দিতে লাগল। অন্তরের প্রার্থনা আর শুভকামনার ব্যূহ রচনা করে স্বামীকে সে তার মধ্যে নিরাপদে লুকিয়ে রাখতে চায়। আর তার আশঙ্কা অমূলক নয় বলেই ধনিয়া আজ অধিক বিচলিত।

কাণাকে কাণা বললে তার যে কি আঘাত লাগে, চক্ষুষ্মান লোক তা কিভাবে বুঝবে?

হরি পা চালাল। আর দুধারে ঢেউ খেলান আখের সবুজ ক্ষেতের দিকে চেয়ে তার আবার গরুর চিন্তা মনে এল। ভগবান যদি চোখ তুলে চান আর জরিমানা যদি ঘাড়ে না চাপে তবে ও পশ্চিমী গরু কিনবে। খুব সেবা যত্ন করবে। খুব কম করেও চার পাঁচ সের দুধ দেবে। গোবর দুধ খেতে পেল না, এ ওর চিরকালের দুঃখ। কতবার ভেবেছে দুধ খেলে গোবরের চেহারা পালটে যাবে। এদিকে বাছুরটা বেশ ভাল বলদ হবে। আর দরজার কাছে গরু বাঁধা থাকলে সে কি শোভা! ভোরে উঠেই গরুর মুখ দেখা যাবে। হা ভগবান, কবে আমার এ সাধ পূর্ণ হবে।

জ্যৈষ্ঠের সূর্য আকাশকে লালিমায় ভরিয়ে দিল। ক্রমে আম গাছের পাতার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে মাথার উপর উঠে মধ্যাহ্ন দীপ্তিতে রূপোর বর্ণ ধারণ করল। বাতাস গরম হয়ে উঠল। দু'পাশের চাষীরা হরিকে "নমস্কার" বলে সম্ভাষণ করল এবং হাতের হুঁকা বাড়িয়ে দিল। হরির এই গর্ব। মনিবের কাছে খাতির আছে বলেই না এই সম্মান। নয়তো ওর মত পাঁচ বিঘের কিষাণকে কে পোছে। হ্যাঁ, রায় সাহেবও দরদী জমিদার। এখন পর্যন্ত তিনি প্রাচীন মর্যাদা রক্ষা করে আসছেন। মালিক যদি প্রজাকে না রাখে তবে সেকি মানুষ?

হঠাৎ হরি দেখে ভোলা গরু নিয়ে এই দিকেই আসছে। ভোলা এই গাঁয়ের গোয়ালা। দুধ মাখন বেচে। সুবিধামত দাম পেলে কিষাণের কাছে গরুও বেচে যায়। ভোলার গরুগুলির ওপর হরির লোভ হল। আহা ভোলা যদি সামনের গরুটি হরিকে দেয় তো ক্রমে সে টাকাটা শোধ করে ফেলে। হরি জানে ঘরে টাকা নেই, এখনো হাজার দেনা। কিন্তু, দারিদ্র্যের এক প্রকার অদূরদর্শিতা আছে, যার জন্য সে অগ্রপশ্চাৎ ভাবেনা, লজ্জা ভুলে যায়, গালাগালি মারামারিতে ভয় পায় না। এই অদূরদর্শিতাই হরিকে গরু কিনতে উদ্বুদ্ধ করে। ভোলাকে সে কিঞ্চিৎ খেলাতে সুরু করে দেয়, একথা সে কথায় গরুটি হস্তগত করার চেষ্টা করে।

ভোলাও গরু বেচতে অনাগ্রহী ছিল না। তার কারণ ছিল। গত বৎসরই লু লেগে তার স্ত্রীটি মারা গেছে। হরি যদি একটি উপযুক্ত কন্যা দেখে দেয়, তবে ভোলার বৃদ্ধ বয়সে একটা গতি হয়। হরি তাতে খুবই রাজী। অতএব, আশি টাকাতেই ভোলা গরুটি দিতে প্রস্তুত এবং নগদ নয়, ধারে। হরি তো হাতে স্বর্গ পেল। বিয়ের সম্বন্ধটা ঠিক করে দিতে পারলে দু'এক বছর নির্ঘাৎ দামের কথা আর ভোলা পারবে না। আর যদি সম্বন্ধটা নাও হয়, তাহলেই বা কি? ভোলা তাগাদা দেবে, গালাগালি দেবে, তা বৈ ত নয়। হরি অবশ্য এই প্রতারণার মধ্যে ঈশ্বরের রুদ্ররূপের কথাটা ভেবে নেয়। তবে এরকম

ছলনা তো তাকে নিয়তই করতে হয়। ঘরে যখন তোমার দু টাকা রয়েছে, তখন হামেশাই মহাজনকে হলফ করে বলতে হয় টাকা নেই। পাট জলে ভিজিয়ে ভারি করা কিম্বা তুলোর বীজ ভরে দেওয়ায় তো কোন অন্যায় নেই। কিন্তু হরি যদি যায় ডালে ডালে, ভোলা চলে পাতায় পাতায়। সেও খেলাতে জানে। ভোলা তার সংসারের দুঃখের কথাটা তুলল ঃ ভাই, টাকাই তো সব নয়, ধর্ম বলেও একটা জিনিষ আছে। তুমি গরুর সেবা করবে, যত্ন করবে, আদর করবে, গরু আমাদের আশীর্বাদ করবে। ভাই, তোমাকে কি বলি, ঘরে এক মুঠো ভূষিও ছিল না। সব টাকা বাজারে বেরিয়ে গিয়েছিল।···

ভোলার দূরবস্থার কথা শুনতে শুনতে হরির ভাব বদলে গেল। ভূষির জন্য ভোলা গরু বেচবে আর হরি তা কিনবে, তাতে ওর হাত কাটা যাবে না ?

হরির যদি চুলচেবা বিচারের শক্তি থাকত, তবে সে খুশীমনে গরুটি নিয়ে বাড়ী রওনা দিত। দেখা যেত, ভোলা যদি নগদ টাকা না চাইত, তবে বোঝাই যেত ভোলা ভূষির জন্য গরু বেচছে না, অন্য মতলব আছে। কিন্তু যেমন পাতার খসখসানি শব্দে ঘোড়া অকারণ থমকে দাঁড়ায়, মারলেও আর এগোয় না, হরির অবস্থা হল সেইরকম। বিপদে পড়ে বিক্রী করা জিনিষ কিনতে নেই—জন্ম-জন্মান্তরের এই সংস্কার তার মনে বদ্ধমূল।

ভোলাকে ভূষির জন্য ওর বাড়ীতে লোক পাঠাতে বলে হরি রায় সাহেবের বাড়ীর দিকে পা বাড়াল। একবার পিছন ফিরে চাইল। ল্যাজের মাছি তাড়াতে তাড়াতে মাথা দুলিয়ে গরুটি ধীরে ধীরে চলেছে। দাসী পরিবৃত কোন রানী যেন ! হরি ভাবতে লাগল, কবে এই সুলক্ষণা কামধেনুটি তার দ্বারে বাঁধা থাকবে।

পাঁচ মাইল অতিক্রম করে হরি যখন রায় সাহেবের দেউড়ীতে এসে পৌছাল তখন ধনুর্যজ্ঞের জন্য জোর আয়োজন সুরু হয়ে গেছে। রায় সাহেব অমর পাল সিংহের খ্যাতি গত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে খুব বেড়ে গিয়েছিল। কাউন্সিলের সদস্যপদ ছেড়ে তিনি জেলে গিয়েছিলেন। ফলে ওঁর প্রতি কৃষকদের খুব শ্রদ্ধা ছিল। স্থানীয় কৃষকদের ওপর কড়াকড়ির যে কোন কমতি ছিল তা নয়। তবে বেচারাকেও তো নিয়ম মেনেই চলতে হয়। অতএব, তাঁর কীর্তিতে কেউ কলঙ্ক লেপন করতে পারেনি। রায় সাহেব চাষীদের সঙ্গে হেসে কথা কইতেন। এতবিধ রাজকার্যের মধ্যেও রাজ-কর্মচারীদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতেন। তাঁদের ভেট ও ডালি এবং অধঃস্তন কর্মচারীদের দস্তুরি গ্রহণ করতেন। সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটকের অনুরাগী ও

সুবক্তা ছিলেন। পত্নীর মৃত্যুর পর গত দশ বৎসর যাবৎ তিনি বিপত্নীকই রয়ে গেছেন।

অভিনয় হবে জ্যৈষ্ঠে, দশহরার সময়। রায় সাহেব হরিকে বললেন, ওরে তুই এসেছিস, আমি তো তোকে ডাকবার জন্য লোক পাঠাচ্ছিলুম। দেখ তোকে জনক রাজার মালী সাজতে হবে, বুঝেছিস তো! ভুল না হয় যেন। সব চাষীদের বুঝিয়ে বলিস যেন সকলে প্রণামী নিয়ে আসে। কুঠিতে আয়, তোর সঙ্গে কথা আছে।

ঘনপত্রসুশোভিত এক গাছের ছায়ায় চেয়ারে বসে রায়সাহেব হরিকে মাটিতে বসতে ইশারা করে সব বুঝিয়ে বললেন; গোমস্তা তো যা বলার বলবে। কিন্তু এক চাষী যত অন্য চাষীর কথা শুনবে, গোমস্তার কথা তত শুনবে না। আমাকে এই পাঁচ সাত দিনে কুড়ি হাজার টাকার ব্যবস্থা করতে হবে। এতগুলো টাকা সংগ্রহ কেমন করে হবে কে জানে। ভাবছিল, তোকে এসব বলছি কেন? আসলে কি জানিস, তুই আমার অবস্থা দেখে হাসবি না। আমাদের নিজেদের মধ্যে রয়েছে শুধু পরস্পর শত্রুতা। আমাদের মধ্যে যদি কারুর উপর ডিগ্রী হয়, কারো জোয়ান ছেলে মরে যায়, কি পুত্রবধূ বেরিয়ে যায়, কি বেশ্যার হাতে কেউ উল্লুক বনে, তো ভাই বেরাদর বগল বাজাবে, যেন সারা সংসারের সম্পদ লাভ করেছে। কিন্তু, বাইরে কি ভালবাসা। যেন প্রাণপাত করতে প্রস্তুত।

রায়সাহেব অনর্গল বলছিলেন। ক্লান্তি দূর করার জন্য তিনি দুই খিলি পান খেলেন। আর হরির মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু যেন মনের কথা পড়তে চাইলেন।

হরি সাহস সঞ্চয় করে বললে; আমি ভাবতাম এসব আমাদের মধ্যে হয়। কিন্তু, দেখছি, বড় বড় লোকের মধ্যেও এর কমতি নেই।

গালভরা পান খেয়ে রায় সাহেব বললেন, তুই আমাদের বড়লোক মনে করিস? আমাদের নামই বড়, কিন্তু নজর ছোট। আমরা এত বড় হয়ে গেছি যে নীচতা ও কুটিলতাতেই নিঃস্বার্থ ও পরম আনন্দ লাভ করি। অন্যের কান্নায় আমাদের হাসি পায়। আমাদের রোগ অনেক বড় বড়। মামুলি ঘামাচি বের হলে ছোট সার্জন, বড় সার্জন, ভিষগাচার্য, মসীহুলমুল্‌ক্ দৌড়ে আসে। ডাক্তার কবিরাজ ফিরতে থাকে কবে এর মাথা ধরবে, আর নিজেদের বাড়ীতে স্বর্ণবৃষ্টি হবে। আর এ টাকা আদায় হয় তোর আর তোর ভাইদের কাছ থেকে বল্লমের খোঁচায়।

রায় সাহেব আবার মুখে কয়েকটা পানের খিলি পুরলেন। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় একজন চাপরাসী এসে বললে, হুজুর বেগারেরা কাজ

করতে চাইছে না। আমাদের ধমকে ওরা কাজ ছেড়ে দাঁড়াল।
রায় সাহেবের মাথায় রাগ চাপল। গালাগাল দিতে দিতে ছুটলেন, আর যাবার সময় হরিকে গাঁয়ের প্রণামীর টাকাটার কথা বলতে ভুললেন না।
হরি লাঠিখানা তুলে ঘরে চলল। ভাবল, রায় সাহেবের হঠাৎ কি হল? দিব্যি ভাল ভাল কথা বলছিলেন। হঠাৎ, এমন রেগে গেলেন কেন? সূর্য মাথার উপরে উঠে এসেছেন। তাঁর তেজে অভিভূত বৃক্ষরা নিজ প্রভাব সঙ্কুচিত করে নিয়েছে। আকাশে ধূলামাটি ছেয়েছিল, আর পৃথিবী যেন মনে হচ্ছিল কম্পমান। প্রণামীর চিন্তাটা হরির মাথায় চড়েছিল।

হরি গাঁয় পৌঁছে দেখে গোবর, সঙ্গে দুই বোন রূপা ও সোনা তখনো আখ লাগাচ্ছে। তাকে দেখে তিনজনেই কাছে এসে দাঁড়াল। গোবরের শ্যামবর্ণ, লম্বা, দোহারা চেহারা। মনে হয়না কাজে কিছুমাত্র রুচি আছে। আনন্দের পরিবর্তে মুখে বিদ্রোহ আর অসন্তোষের ছাপ। ওর খাওয়া পরার জন্য কারো চিন্তার প্রয়োজন নেই—এটা দেখাবার জন্যই ওব ক্ষেতে কাজ। বড় মেয়ে সোনা, শ্যামলী, হাসিখুসি, চঞ্চল, সুঠাম শরীর। লাল মোটা শাড়ীটা এমনভাবে জড়িয়েছে যে দেখায় একটু মোটা আর বয়স্ক। ছোট রূপা অষ্ট-বর্ষীয়া। হাতে-পায়ে ময়লা। মাথার উপর ঝুটি। কোমরে একখানা ত্যানা। চঞ্চল। কাঁদুনে।
রূপা হরির পা-দুটি জড়িয়ে ধরে বললে, দেখ বাবা আমি এক ঢেলা মাটিও আস্ত রাখিনি। দিদি বলে, গাছতলায় বসগে। কিন্তু, মাটি ভেঙ্গে গুঁড়ো না করলে জমিন কি করে সমান হবে বাবা?
হরি ওকে কোলে নিয়ে আদর করে বললে, ভাল মেয়ে তুমি। চল, এখন ঘরে যাই।
সোনা একটু হিংসা করেই বললে; হ্যাঁরে রূপা। তোর কি পা ভেঙ্গেছে যে কোলে কোলে চললি? নেমে হাঁট না।
রূপা বাপের গলা জড়িয়ে বললে, আমি নামবনা, বেশ। জান বাবা, দিদি আমাকে রোজ খেপায়। আমি রূপা আর ও সোনা। বাবা, তুমি আমার নামটা পালটে দাও।
হরি রাগের ভান করে বললে, সোনা, তুই ওকে খেপাস কেন? সোনা তো দেখতেই সুন্দর। কাজের জিনিষ তো রূপো। রূপো না থাকলে টাকা আসত কোত্থেকে, বল?
সোনা বললে, বারে। সোনা না থাকলে মোহর কি করে আসত? নাকের নথ, গলার কণ্ঠী, এসব কোথায় মিলত?

গোবরও এই ঝগড়ায় যোগ দিয়ে বললে, তুই বলনা রূপা, সোনা তো শুকনো পাতার মত হলদে। আর রূপা—কেমন স্বর্গের মত উজ্জ্বল।

সোনা বলে, বিয়ে-সাদীতে লোকে হলুদ রং-এর কাপড়ই পরে। কেউ কি সাদা শাড়ী পরে?

এবার রূপা হেরে গিয়ে কাতর চোখে হরির দিকে তাকাল।

হরি একটা নূতন যুক্তি জুটাল, সোনা বড় লোকের জন্য, আর আমাদের মত গরীব মানুষের হল রূপা। যেমন যবকে বলে রাজা, কেন? না, আমরা খাই। আর গম তো হল চামার, ও খায় বড় লোকেরা।

এই প্রবল যুক্তিতে সোনার আর না হেরে উপায় ছিল না। ও রাগ করে বললে, তোমরা সবাই একদিকে, নইলে আমি রূপাকে কাঁদিয়ে ছাড়তাম।

রূপার এত আহ্লাদ হল যে কোল থেকে আঙ্গুল মটকাতে মটকাতে ও মাটিতে লাফিয়ে পড়ল ও উচ্ছল হাসিতে চেঁচাতে লাগল, রূপা রা-জা, সোনা চা-মার।

এরা যখন বাড়ী এসে পেঁাছাল, তখন ধনিয়া দরজায় পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে। দরজার কাছেই কূয়ো। হরি আর গোবর এক এক কলসী জল মাথায় ঢালল, রূপাকে স্নান করাল, তারপর খেতে বসল। যবের রুটি, কিন্তু ঠিক গমের মত পরিস্কার আর মিহি আটা। সঙ্গে কাঁচা আম দিয়ে অড়হড় ডাল। রূপা বাবার সঙ্গে এক থালায় বসল দেখে সোনা তার দিকে হিংসা-ভরে চাইল।

ধনিয়া বললে, কর্তাবাবুর সঙ্গে কি কথা হল?

হরি ঘটিতে জল ঢালতে ঢালতে বললে, এইসব আদায়পত্রের কথা আর কি। আমরা ভাবি বড় লোকেরা খুব সুখী। কিন্তু, সত্যি বলতে কি ওদের দুঃখ আরও বেশী। আমরা শুধু পেটের ধান্ধায় ঘুরি। আর ওদের কত হাজারো চিন্তা।

রায়সাহেবের কথাগুলি হরির ঠিক মনে নেই। কিন্তু, কথার সারাংশটুকু ওর মনে লেগে আছে।

গোবর ঠাট্টা করে বলে, খুব দুঃখ বটে ওদের। তা নিকনা আমাদের সাথে সব বদলা বদলি করে।

হরি রেগে গিয়ে বললে, তোর সঙ্গে তর্ক করে কি লাভ। এটা কি হয় নাকি। আমাদের যে ক্ষেত রয়েছে, তা থেকে তো একটা চাকরের আয়ও হয় না। তাই বলে এই ক্ষেতি কি আমি ছাড়তে পারি? মর্যাদা বলে কথা আছে না?

গোবর বলে, এসব কথার কথা। আমরা সব দিতে দিতে ফতুর হয়ে

গেলাম। আর ওরা? আরামে গদীর উপর বসে হাজার লোকের ওপর কর্তালি করছে।
তবে কি তুমি বলতে চাও, আমরা ওরা সমান হব?
তা ঈশ্বর তো সবাইকে সমান করেই পাঠিয়েছেন।
না বেটা, এটা ঠিক কথা নয়। ঈশ্বরের কোল থেকেই ছোট বড় জন্মায়। এসব আরজন্মের সুকৃতি দুষ্কৃতির ফল। জান কর্তামশাই এখন পর্যন্ত রোজ চারঘণ্টা ভজনপূজন করেন।
এসব ভজনপূজন দান খয়রাত কাদের দৌলতে শুনি? চাষী আর জন-মজুরের গতর খাটিয়ে এসব হচ্ছে। তাই এই পাপ ঢাকার জন্য দান ধ্যান পূজা আর্চা। আমাকে দিক না কেউ দু'বেলা খেতে, অষ্টপ্রহর রামনাম করব। একদিন ক্ষেতে এসে আখ লাগাতে দাও, সব ভক্তি উপে যাবে।
হরি হেরে গিয়ে এবার ক্রুদ্ধ হল, তোমাদের মুখে কিছুই আটকায় না। ঈশ্বরের লীলা নিয়েও তোমাদের মস্করা।
তিনপ্রহর বেলায় গোবর কোদাল নিয়ে চলল দেখে হরি সকালবেলার ভোলার কথাটা পারল। ওকে কিছু ভূষি পৌছে দিতে হবে। ভোলা ওর পশ্চিমী গাইটাই দিতে চেয়েছিল। আমি ভাবলাম বিপদে পড়ে গাই দিতে চায়, এটা কি নেওয়া উচিত? এখন কিছু ভূষি দিই। পরে টাকা কিছু জমলে গরুটা আনব।
হরির মূর্খামিতে গোবর এবং ধনিয়া দু'জনেই ভর্ৎসনা করল। হরি বললে, ভোলার গরু আমার কাছে অমনি আসবে। ওর একটা সম্বন্ধ দেখে দিতে পারলেই হয়।
গোবর চলে যেতে যেতে বললে, তুমি কি এখন ঘটকালিতে লাগবে?
ধনিয়া তীব্র কটাক্ষ করে বললে, ঐ কর্মই বাকী আছে। আমি ভোলা টোলার ধার ধারিনা। আমি ভূষি দেব না। ও বুড়োকে যে সম্বন্ধ দেখে দেবে সে তোমার মত আশি টাকায় চুপ করবে না। একথলি টাকা সে খসাবে, তবে ছাড়বে, এটা জানো?
হরি বললেঃ তা ঠিক। কিন্তু লোকটা ভাল। যখনই দেখা হয় তোমার খুব সুখ্যাতি করে। তুমি কেমন লক্ষ্মী, কেমন সোন্দর···
ধনিয়ার মুখে লজ্জার আভা খেলে গেল। মনোহর ভঙ্গীতে মাথা দুলিয়ে বালিকার মত বললে, আমি ওর সুখ্যাতির কাঙাল নই।
হরি রঙ্গ করে বললে, আমি ওকে বলে দিয়েছি ওর ঝ্যামটা তো জাননা। ওর নথ নাড়ার চোটে নাকে মাছি বসতে পারেনা। তা আসলে ওর বউটা ছিল দজ্জাল। ও বলে তোমার মুখ দেখলে নাকি ওর দিন ভাল যায়। আমি

বলি, কৈ, আমি তো রোজই দেখি। দুটো একটা পয়সাও কেউ দেয় না।

ধনিয়া বলে, তোমার কপাল ফুটো, আমি কি করব?

এমন সময় গোবর এদিকে এসে বললে, ভোলা জ্যেঠা এসে গেছে। মন দু'আড়াই ভূষি আছে। দাও, ওকে দিয়ে দাও। আর সম্বন্ধ খুঁজতে বেরোও।

ধনিয়া বুঝিয়ে বললে, আরে লোকটা বাড়িতে এসেছে। ওকে ডেকে বসা। একটু ভদ্রতা তো শিখতে হয়। এটা কি প্যানপ্যানানির সময়?

ভোলার খুবই যত্ন আত্তি হল। গোবর খাটিয়া এনে দিল। সোনা সরবত দিল। রূপা নিয়ে এল তামাক। ধনিয়া দরজার আড়ালে নিজের সুখ্যাতি শোনার জন্য দাঁড়িয়ে রইল।

হুঁকো হাতে নিয়ে ভোলা বললে, উপযুক্ত বউ জানবে লক্ষ্মী। সে ঠিক জানে কিভাবে কাকে অভ্যর্থনা করতে হয়।

ধনিয়ার হৃদয় উল্লাসে নেচে উঠল। অভাব, নিরাশা, ভাবনায়, চিন্তায় পীড়িত অন্তর এইসব কথা শুনে কেমন স্নিগ্ধ ও কোমল হয়ে উঠল।

ধনিয়াই বলে কয়ে এক খাঁচার জায়গায় তিন খাঁচা ভূষি দিতে হরিকে রাজী করাল। ও যুক্তি খাড়া করে বললে; হয় কাউকে নেমন্তন্ন কোরো না, আর যদি করো তো পেট পুরে খাওয়াও। ডেকেছ যখন, এক মুঠো ভিক্ষে দিয়ে বিদায় করা ভাল নয়। হরির মনে ছিল স্বার্থ আর ধর্মের দ্বন্দ্ব। তাই ধনিয়ারই জিত হল। হরি এসে ভোলাকে বললে, তোমার খাঁচি তুমি ভরে নাও। আরও দু' খাঁচি ভূষি, চলো, আমি আর গোবর পৌঁছে দিয়ে আসি।

ভোলা স্তম্ভিত হয়ে গেল। হরি যেন নিজের ভাই-এর চেয়েও আপন। তার মনে একটা তৃপ্তির ভাব এল।

তিনজনে ভূষি নিয়ে পথে চলল। কথাবার্তাও চলতে থাকল। খাজনার চিন্তা। জমিদার একজন, মহাজন তিন—সাহুয়াইন, মংগরু, দাতাদীন পণ্ডিত। বড়লোকের সুখ সম্পদ, গরীবের কপাল পোড়া, কারণ, গরীব মানুষ নয়। বলদ হয়ে ঘানিতে জুততে তাদের জন্ম। তাদের একতা নেই। প্রেম জিনিষটা সংসার থেকে উঠেই গেছে। ইত্যাদি।

অতীতের সুখ, বর্তমানের দুঃখ-দুর্দশা, আর ভবিষ্যতের সর্বনাশ—বুড়ো বয়সে এসব চিন্তায় লোকে যত সুখ পায়, এমন আর কিছুতে নয়। দুই বন্ধু নিজের দুঃখের কাহিনী শোনাতে থাকল। ভোলা তার ছেলের কীর্তি শোনাল, হরিও তার ভাইদের দুর্ব্যবহারের কথা বলে কাঁদুনি গাইল। ক্রমে পথ শেষ হয়ে এল। ভোলার পাড়া বড় নয়, তবে ঘন বসতি। কিষাণের তুলনায় অবস্থা ভালই।

ভোলা গ্রামের মাতব্বর। বাড়ির দরজায় গরুর খাওয়ার যে প্রকাণ্ড গামলা, তাতে দশ বারটি গরু একত্রে দানা খাচ্ছে। তুই বউ বাড়ির সম্মুখে বসে ঘুঁটের জন্য গোবর ছানছে। চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে ভোলার বিধবা মেয়ে ঝুনিয়া। ওর চোখ তুটি লাল, নাকের ডগার কাছটা যেন জখম। দেখলে মনে হয় এখনি কাঁদছিল। ওর সুঠাম, সুডৌল দেহে যৌবন ঝলমল করছে। মুখখানি গোলগাল, কপাল একটু উঁচু, চোখ তুটি একটু ছোট আর ভিতরে ঢোকা, মাথাটি হালকা। ওর পরিপূর্ণ বক্ষ আর সুপুষ্ট দেহ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছাপান গোলাপী রং-এর শাড়ীখানি ওর দেহের শোভা আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

ভোলাকে দেখবামাত্র ছুটে এসে ঝুনিয়া ওর মাথা থেকে খাঁচিটা নামিয়ে নিল। ভোলা হরি আর গোবরের মাথার খাঁচি তুটি নামিয়ে বললে, ঝুনিয়া, আগে এক ছিলিম তামাক দে। তারপর একটু সরবত আন। জল না থাকে তো কলসি নিয়ে আয়, তুলে দিচ্ছি। হরিভাইকে চিনতে পারছিস তো?

তারপর হরির দিকে চেয়ে বললে, গিন্নী না থাকলে কিসের ঘর? কথায় বলে এঁড়ে গরুর চাষ, আর বৌদের গেরস্থালি। যেদিন থেকে ওদের মা মারা গেছে, সেদিন থেকে ঘরের লক্ষ্মী বিদেয় হয়েছে। বৌরা আটা চটকাতে পারে বটে, কিন্তু গেরস্থালিব কি জানে? অবশ্য মুখ চালাতে জানে খুব। সবকটা কুঁড়ে, ফাঁকিবাজ। আর ঝুনিয়াও হয়েছে তেমনি। সামান্য কিছু ত্রুটি হবে তো মুখ খিঁচিয়ে উঠবে।

ঝুনিয়া অল্প সময়ের মধ্যে এক হাতে তামাক ভরা কলকে, অন্য হাতে একঘটি সরবৎ নিয়ে এল। তারপব দড়ি আব কলসী নিয়ে চলল জল আনতে। গোবর তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে বলল, থাক, তোমায় তুলতে হবে না, আমি তুলে দিচ্ছি।

ঝুনিয়া কলসী দিল না। হেসে হেসে কূয়োর পারে গিয়ে বললে, তোমরা অতিথি, শেষে বলবে, একঘটি জল পর্যন্ত দিলে না।

বাঃ, অতিথি কি করে-হলাম। আমরা হলুম পাড়াপড়সী।

পড়সী যদি বছরে একবার উঁকি মেরে না দেখে তো অতিথি ছাড়া আর কি? আবার রোজ রোজ এলেও তো মান থাকে না।

ঝুনিয়া হেসে, কটাক্ষ হেনে বললে, তাই তো মান দিচ্ছি। মাসে একবার এলে ঠাণ্ডা জল দেব, পনের দিন পরে এলে তামাক দেব। সাত দিন পর পর যদি আস, তবে পাবে শুধু বসার পিঁড়ি। আর রোজ এলে একদম কিচ্ছু না।

দেখা তো দেবে?

দর্শনের জন্য কিন্তু আরাধনা করতে হবে। বলতে বলতে যেন কোন এক বিস্মৃত কথা ওর মনে পড়ে গেল। মুখটি শুকিয়ে গেল। ও যে বিধবা! এতদিন ওর স্বামী ছিল ওর মান-মর্যাদার রক্ষাকর্তা। ও নিশ্চিন্তে ছিল। এখন রক্ষক নাই, তাই সর্বদা শঙ্কিত। অতি সাবধানে সতীত্বের দরজার আগল বন্ধ করে রাখে। কখনো কখনো ঘর খালি বলে দরজা ফাঁক করে; আবার কাউকে আসতে দেখলে কপাট বন্ধ করে দেয়।

গোবর ভরা কলসী নিয়ে চলে গেল। সরবত খাওয়া হয়েছিল। আর একবার তামাক খেয়ে সবাই উঠে পড়ল। ভোলা বললে, গোবর, কাল এসে গাইটা নিয়ে যেও, এখন তো খাবার খাচ্ছে।

গোবরের চোখ দুটি গাই-এর ওপরেই পড়ে ছিল। গাই যে এত সুন্দর হয়, গোবরের জানা ছিল না।

হরি লোভ সম্বরণ করে বললে, তা নেব'খনে, এত তাডা কি?

তা, তোমার না থাক, আমার তাড়া আছে। তারপর থেমে ইঙ্গিতে বললে, এটাকে চোখের সামনে দেখলে তোমার ঐ কথাটা মনে থাকবে।

ও আমার খুব খেয়াল আছে।

ঠিক আছে, ঠিক আছে, গোবরকে কাল অবশ্য পাঠিয়ে দিও।

বাপ বেটা খাঁচি মাথায় ফিবে চলল। দুজনেই এমন খুশী যেন নূতন বিয়ে হয়েছে। হরির এতদিনের অভিলাষ পূর্ণ হতে চলেছে—তাও প্রায় মুফতে। আর গোবরেব লাভ হয়েছে এর বহুগুণ। ওব মনে এক বাসনা জেগে উঠেছে।

একটু ফাঁক পেয়েই ও পিছন ফিরে তাকাল। দেখে ঝুনিয়া দরজায় দাঁড়িয়ে। মত্ত আশার মত চঞ্চল ঝুনিয়া।

সে রাত্রিতে হরির চোখে আর ঘুম এল না।

॥ দুই ॥

গোবর সকালেই গিয়েছিল ভোলার বাড়ী গরু আনার জন্য। হীরা তার বৌকে পেটাচ্ছিল। হীরার বৌ নিজের ঘরে প্রভু। ওরই বেঁকে বসায় ভাইয়ে ভাইয়ে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। ধনিয়াকে হারিয়ে ও হয়েছিল বাঘিনী। হীরা কখনো কখনো রাগের চোটে ওকে মারত বটে, কিন্তু চলত ওরই ইসারায়। ঠিক সেই ঘোড়ার মত, যে রাগের বশে প্রভুকে কখনো লাথি মেরেও বহন করে। হীরার

বৌ-এর নাম পুন্নী। মোটে দুই ছেলে। কিন্তু শরীর হয়েছিল ভগ্ন। অভাব আর অস্থিরতায় ওর প্রকৃতির সমস্ত সরসতা শুকিয়ে এমন কাঠ হয়েছিল যে কোদালেরও দাগ বুঝি বসেনা।

হীরা বৌকে পেটাচ্ছিল। আর হরি ওকে থামাচ্ছিল। হীরা এখনও বড়ভাইকে সম্মান করে। সোজাসুজি ঝগড়া করতে পারে না। পুনিয়া এ যাত্রা বেঁচে গেল। হরি বলে, আর মারধোর করো না যেন, ওতে মেয়েদের আর লজ্জা সরম থাকে না।

ধনিয়ার এসব আদিখ্যেতায় হাড়পিত্তি জ্বলে যায়। দরজার কাছ থেকেই হাঁক দিল ; তুমি কি দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছ। কেউ কি তোমার কথা শুনছে যে তুমি শিক্ষা দিচ্ছ। ঐ বৌই একদিন ঘোমটার আড়ালে তোমাকে গাড়োয়ান বলেছিল, মনে নেই। ঘরের বৌ পুরুষমানুষের সঙ্গে লড়লে ধমক তো খাবেই।

হরি ঘরে এসে দুষ্টামি করে বলে ; আর আমি যদি তোকে মারি ?

কখনো কি মারো নাই যে মারার সাধ হয়েছে ?

এরকম পাষণ্ডের মত যদি মারতাম তো তুই পালিয়ে যেতি। পুনিয়ার খুব ধৈর্য।

ওঃ বড় দরদ যে ! ও যেমন মারে, তেমনি আহ্লাদও দেয়। তুমি তো শুধু মারতেই শিখেছ ; আহ্লাদ দিতে শেখনি। আমার মত মেয়ে বলে তোমার সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছি।

আচ্ছা, থাক, নিজের গুণগান বেশী করিস না। তুই তো চটে মটে বাপের বাড়ি পালাতিস। মাসের পর মাস খোসামদ করলে তবে আসতিস।

আঃ নিজের গরজেই যেতে বাপু, আমাকে ভালবাস বলে যেতে না।

এইজন্যই তো তোকে ভালবাসি।

বৈবাহিক জীবনের প্রভাতে বাসনা তার গোলাপী মাদকতা নিয়ে উদিত হয় আর হৃদয়ের সমস্ত আকাশখানা মাধুর্যের সোনালী কিরণে উদ্ভাসিত করে দেয়। আবার মধ্যাহ্নের প্রখর তাপ আসে, ক্ষণে ক্ষণে ঝড় ওঠে, পৃথিবী কাঁপতে থাকে! বাসনার সোনালী আবরণ দূর হয়ে যায়, নগ্ন বাস্তব সামনে এসে দাঁড়ায়। তার পরে আসে সন্ধ্যা, সঙ্গে আনে পরিপূর্ণ বিশ্রাম। শীতল শান্ত তার রূপ। তখন আমরা ক্লান্ত পথিকের মত সারাদিনের বৃত্তান্ত বলি এবং শুনি। তদগত ভাব আমাদের, যেন কোন গিরিশৃঙ্গের উপর বসে আছি। নীচের কল কোলাহল আমাদের কাছে পৌছায় না।

ধনিয়া চোখের কোলে রস ভরে বললে, যাও, যাও, ভারি সুখ্যাত করার লোক। পান থেকে চূণ খসলেই তো ঘাড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়।

হরি বলে, দেখ, এসব মিথ্যে কথা বলিস না। ভোলাকে জিজ্ঞেস করিস, তোর কথা কি বলেছিলাম ওকে।

ধনিয়া কথা বদলিয়ে হঠাৎ তাড়া দিয়ে বলে, দেখ গিয়ে গোবর গরু নিয়ে আসছে না খালি হাতে। আমার সঙ্গে বক বক করলে হবে?

এদিকে রূপা কাঁদতে কাঁদতে এল। উলঙ্গ দেহে এক নেংটি পরা। ঝাকড়া চুল এদিক ওদিক এসে পড়েছে। এসেই হরির বুকে শুয়ে পড়ল। ওর আরজি সোনা এমন কি বড় রানী যে গরুর গোবর একাই পাবে? সোনা রুটি সেঁকে বটে, রূপা কি বাসন মাজে না? সোনা জল আনে, কিন্তু কুয়োয় রসি নিয়ে যায় কে? সোনা তো কলসী ভরে আড়চোখে চাইতে চাইতে চলে আসে। রসি জড় করে নিয়ে আসে রূপাই। সোনা একা গোবর চটকাবে—এ অন্যায় তাহলে কি করে সহ্য করা যায়? হরি রায় দেয় না, গরুর গোবর তুই চটকাবি। সোনা গরুর কাছে গেলে ওকে তাড়িয়ে দিস্।

রূপা বাবার গলা জড়িয়ে বললে, দুধও আমিই দুইব।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই না দুইলে, আর কে দুইবে!

ও গোরু আমার হবে।

হ্যাঁ, ষোল আনা তোর।

রূপা খুশি হয়ে এই বিজয়বার্তা সোনাকে শোনাবার জন্য চলে গেল। গোরু হবে আমার, দুধ দুইব আমি, গোবর চটকাব আমি। তোর কিছু নয়।

দেহের গড়নে সোনা যুবতী, বয়সে কিশোরী, বুদ্ধিতে বালিকা। যেন তার যৌবন তাকে সামনে টানছে, শৈশব টানছে পেছনে। দীর্ঘকায় রুক্ষ, কিন্তু প্রসন্ন মুখ, মাথাটা নীচের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, চোখে একপ্রকার তৃপ্তি, চুলে তেল নেই, চোখে কাজল নেই, দেহে কোনরকম গহনা নেই। সংসারের ভার যেন তার যৌবনকে চেপে খর্ব করে রেখেছে।

মাথায় এক ঝটকা দিয়ে সে বললে, যা তুই গোবর চটকা গিয়ে। যখন তুই দুধ দুয়ে রাখবি আমি খেয়ে নেব।

আমি দুধের হাঁড়ি তালা চাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখব।

আমি তালা ভেঙ্গে দুধ বাইরে নিয়ে আসব।

এই বলতে বলতে দুই বোন বাগানের দিকে ছুটল। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। হরিকে আলস্য এত পেয়ে বসেছে যে আখের গোড়া কুঁড়তে যেতে পারেনি। বলদগুলিকে নাদে লাগিয়ে, জাব দিয়ে নিজে এক ছিলিম তামাক টানতে লাগল। ফসলের সমস্ত কিছু খামার বাড়িতে ওজন করলেও এখনও তার তিনশ টাকা ধার। তার ওপর সুদ একশ টাকা। পাঁচ বছর হয়, মংরু

শা'র কাছে ষাট টাকা বলদের জন্য নিয়েছিল,—তার মধ্যে ষাট টাকা সুদ শোধ করেছে, কিন্তু, আগেকার ষাট টাকাটা তেমনি আছে। দাতাদীন পণ্ডিতের কাছে ত্রিশ টাকা নিয়ে আলু লাগাচ্ছিল। আলু তো নিয়ে গেল চোরে, কিন্তু ঐ ত্রিশ টাকাই এতদিনে তিনশ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে। দুলারী বিধবা, সাউকারের স্ত্রী ছিল, গাঁয়ে তার ছিল এক নুন-তেলের-তামাকের দোকান। তার কাছ থেকে চল্লিশ টাকা নিয়ে ভাগাভাগির সময়ে ভাইদের দিতে হয়েছিল। ওখানে জমেছে একশ টাকা, কারণ, টাকার ব্যাজ ছিল এক আনা। খাজনার দরুণও পঁচিশ টাকা বাকি আছে, আর দশহরার দিন পার্বনীর টাকারও কিছু চেষ্টা করতে হয়। বাঁশ বেচা কিছু টাকা থেকে এটা যা হোক মেটাতে হবে। কিন্তু, এখনও জীবনের দু'টো বড় কাজ মাথার উপরে এসে পড়েছে—গোবর আর সোনার বিবাহ। খুব টেনেটুনেও তিনশ টাকার কমে কুলোবেনা। এই তিনশ টাকা কার ঘর থেকে আসবে? কত চেষ্টা করি কারো কাছে এক পয়সা কর্জ করবনা, যার যার ধারি তাদের সকলেরই কর্জ মিটিয়ে দিই—কিন্তু সব রকম কষ্ট স্বীকার করতেও প্রবৃত্তি হয়না। এইভাবে সুদ বেড়ে চলবে, আর একদিন ওর ঘর দোর সব নীলাম হয়ে যাবে,—ওর পুত্র কন্যা সব নিরাশ্রয় ভিক্ষুক হয়ে ঘুরে বেড়াবে—হরি যখন কাজকর্ম থেকে ছুটি পেয়ে ছিলিম টানতে থাকে—তখন এইসব চিন্তা কালো দেয়ালের মত তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে, তা থেকে বের হওয়ার কোন পথ ওর চোখে পড়ে না। তবে সান্ত্বনা এই, সকল কৃষকেরই তো এই অবস্থা। শোভা হীরা আলাদা হয়ে কি সুখে আছে? এখানে কে বেঁচে আছে?

সহসা সোনা রূপা দুজনেই দৌড়াতে দৌড়াতে এসে খবর দিল, ভাই গরু নিয়ে আসছে। কে আগে দেখেছে তাই নিয়ে ওরা কলহ করছিল। কলহ করতেই করতেই আবার বাগিচার দিকে ছুট লাগাল, গরুকে স্বাগত জানাবার জন্য।

ধনিয়া আর হরি দুজনেই গরু বাঁধার ব্যবস্থা করতে লাগল। হরি বলল, চল, তাড়াতাড়ি নাদটা গেড়ে দিই।

ধনিয়ার মুখে হঠাৎ উত্তর এল, না, প্রথমে থালায় অল্প একটু আটা আর গুড় মেখে দিই। বেচারি রোদের মধ্যে এসেছে, তেষ্টা পেয়েছে নিশ্চয়। তুমি গিয়ে গর্ত কর, আমি মাখিগে যাই।

হরি বললে, আজ আমার মনের খুব একটা বড় আশা পূর্ণ হল।

ধনিয়া নিজের উল্লাস চেপে রাখতে চাইছিল। এত বড় সম্পদ কোন নূতন বাধা নিয়ে আসে, তাইতে তার বুক কাঁপছিল। আকাশের দিকে তাকিয়ে

বলল ঃ গরু কি কপাল নিয়ে এসেছে আগে দেখো, পরে আনন্দ করো। ভগবানের মনে কি আছে, কে জানে!

ও যেন ভগবানকে ঠকাতে চায়। ভগবানকে দেখাতে চায় যে এই গরু এনে আমার এত আনন্দ হয় নাই যে, হিংসুক ভগবান সুখের পাল্লা উঁচু হয়েছে বলে নূতন বিপদ পাঠিয়ে দেবেন।

গোবর যখন গরু নিয়ে বালকের উৎসাহে দরজায় এসে পৌছাল তখনও ধনিয়া আটা মাখছিল। হরি ছুটে গিয়ে গরুর গলা জড়িয়ে ধরল। ধনিয়া আটা ছেড়ে তাড়াতাড়ি একটা পুরানো শাড়ীর কালো পাড় ছিঁড়ে এনে গরুর গলায় বেঁধে দিল। গর্ভবতী গরু। কার না নজর লাগে।

হরি শ্রদ্ধা-বিহ্বল চোখে গরুকে দেখছিল, যেন সাক্ষাৎ ভগবতী তার গৃহে পদার্পণ করেছেন। ধনিয়া ভীত হয়ে বলল—দাঁড়িয়ে কেন, আঙ্গিনায় নাদ খুঁড়ে দাও।

আঙ্গিনায়? জায়গা কই?

অনেক জায়গা আছে।

আমি তো বাইরে খুঁড়েছি।

পাগল হয়ো না। গরুর অবস্থা জেনেও ন্যাকা হচ্ছ?

আরে, এক বিঘতের আঙ্গিনা, গরু বাঁধব কোথায় গো?

যে কথা জান না, তারমধ্যে সর্দারি করো না। সমস্ত সংসারেব শাস্ত্র তুমি পড়নি।

হরির সত্যই মাথা ঠিক ছিল না। গরু ওর কাছে শুধু শ্রদ্ধার বস্তু নয়, সজীব সম্পত্তিও বটে। সে চেয়েছিল গরু দিয়ে দ্বারের শোভা ও গৃহের গৌরব বাড়ুক। সে চেয়েছিল, লোকে দরজায় গরু বাঁধা দেখে জিজ্ঞাসা করুক, এ কার ঘর, আর লোকে বলুক, হরি মোড়লের। যাতে মেয়ের বাপেরাও ঐশ্বর্য দেখে অভিভূত হয়। আঙ্গিনায় বাঁধলে কে দেখবে? কিন্তু, ধনিয়ার মন ছিল তার বিপরীত, ওর মধ্যে ছিল শঙ্কা। এ ধরণের ঝগড়ায় সাধারণত হরিরই জয় হয়। কিন্তু আজ ধনিয়ার সামনে হরির একটা কথাও টিঁকল না। গোবর, সোনা, রূপা সবাই হরির পক্ষে হওয়া সত্বেও, ধনিয়া একাই সবাইকে হারিয়ে দিল। আজ তার মধ্যে দেখা দিল এক বিচিত্র আত্মবিশ্বাস, আর হরির মধ্যে বিচিত্র এক বিনয়।

কিন্তু, তামাসা কি বন্ধ রাখা যায়? গরুতো আর ডুলিতে চেপে আসেনি। একি আর সম্ভব যে এতবড় একটা ব্যাপারে সারা গ্রাম ছুটে আসবে না? দর্শক ও আলোচনাকারীদের ভীড় লেগে গিয়েছিল, আর হরি ছুটে ছুটে সবাইকে অভ্যর্থনা করছিল। এতখানি নম্র, এত প্রসন্নচিত্ত ওকে কখনো

দেখা যায় নি।

সত্তর বছরের বুড়ো পণ্ডিত দাতাদীনও যখন লাঠি ঠুকতে ঠুকতে কুঞ্চিত চোখে এসে পৌঁছল, হরি দৌড়ে এসে প্রণাম করলে, আর দাতাদীনের মুখে গরুর প্রশংসা শুনে অভিমানভরা উল্লাসে বললে যে এসব তাঁরই আশীর্বাদে হয়েছে। হরির মনে বেপরোয়া ভাব এমন ছিল যে দাতাদীনকে অনায়াসে সে একথাও বললে যে, গরু সে নগদেই কিনেছে। নিজের মহাজনের কাছে সমৃদ্ধি প্রদর্শনের সুযোগ সে আজ ছাড়তে রাজী নয়। দাতাদীন সব দেখে শুনে রহস্যভরা কণ্ঠে বললেন, বাইরে বেঁধো না। এটুকু বলে রাখছি।

ধনিয়া বিজয়ীর দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকাল। ও যেন বলছিল—নাও, এখন তো মানবে?

সারা গ্রাম দেখতে এল। এল না শুধু সোদর দুই ভাই—শোভা আর হীরা। সন্ধ্যায় হরি ভয়ে ভয়ে ধনিয়াকে জিজ্ঞাসা করলে, না শোভা এল, না হীরা। শোনে নি কি?

ধনিয়া জ্বলে উঠে বললে, তা ওদের ডাকতে যাবে কে?

হরি ধনিয়াকে বোঝাবার চেষ্টা করে, হাজার হোক ভাই তো। হিংসা ভাগাভাগি হয়, রক্ত তো হয় না। দুজনকে না দেখালে বলবে, গরু আনল আমাদের বললও না।

ধনিয়া নাক সিঁটকে বললে, আমি তোমায় হাজার বার বলে দিয়েছি, আমার সামনে ভাইদের ব্যাখ্যান করো না। শুনলে আমার গা জ্বলে যায়। সমস্ত গাঁ দেখতে এল আর ওদেরই পায়ে মেহেদি লেগেছিল? আসবে কি করে? হিংসায় বুক ফেটে যাচ্ছে যে।

কথাটার ওখানেই ইতি হলেও হরি মন থেকে প্রসঙ্গটাকে সরাতে পারল না। রাত তখন এক প্রহরের বেশি হয়েছিল। গরু নূতন বধূর মত মনমরা। খাবারে মুখ দিচ্ছিল না। গোবর আর হরি খাওয়া দাওয়া শেষ করে আধা-আধা রুটি রেখেছিল ওর জন্য, তাতে ওর রুচি নেই। হরি খাটিয়ায় বসে ছিলিম টানছিল, আর ভাইদের কথা ভাবছিল। ভাইরা মন্দ হলে সেও কি মন্দ হতে পারে? নিজের নিজের কর্মফল তো নিজের নিজের সঙ্গেই থাকে। হরি নারকেলের দড়ির খাটিয়া পা দিয়ে সরিয়ে হীরার ঘরের দিকে চলল। শোভার ঘরও ঐদিকেই। দুজনেই নিজের নিজের দরজায় শুয়ে ছিল। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। দু'জনের মধ্যে কিছু কথাবার্তা হচ্ছিল। হরি থমকে গেল। হীরার হৃদয়বিদারক কথাগুলি ও স্পষ্ট শুনতে পেল। শুনে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল আর একপাও সরল না। সে ফিরে এল, আর এক ছিলিম তামাক খেল। কিন্তু তাও বিষবৎ বোধ হল। নেশায় যেমন চেতনা একমুখী

হয়, প্রক্ষিপ্ত জল যেমন একদিকে বেগবান হয়, ওর মনের অবস্থাও তেমনি। সে উন্মত্ত অবস্থায় ঘরের বাইরে গেল আর গরুর দড়ি খুলে দেখল। তখনও দরজা খোলা ছিল। আঙ্গিনার এককোণে ধনিয়া সোনাকে দিয়ে পা টিপিয়ে নিচ্ছিল। আর রূপা, যে নাকি রোজ সন্ধ্যা হতে না হতেই ঘুমিয়ে পড়ে, সে তখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গরুকে সোহাগ করছিল। হরির কাণ্ড দেখে ধনীয়া বললে, এই রাত্রে গরুকে কোথায় নিয়ে চল্লে ?

হরি একপা সামনে গিয়ে বললে, নিয়ে যাই ভোলার বাড়ী, ফেরৎ দেব। ধনিয়া অবাক হল। উঠে সামনে এসে বলল ঃ ফেরাবে কেন ? ফেরৎ দেবার জন্য এনেছি নাকি ?

হাঁ, ওটাকে ফেরালেই আমার মঙ্গল।

ধনিয়ার কিছুই বুঝতে দেরী হল না। হরির হাত থেকে গরুর দড়িটা সে কেড়ে নিল। তার চপল বুদ্ধি যেন উড়ন্ত পাখীকেও ধরে নিয়েছে। মুখে বলল, তোমার ভাইদের ভয় থাকে তো ওদের পায়ে পড়ো গে। আমি কাউকে পরোয়া করি না।

হরি বিনীত স্বরে বলল, আস্তে আস্তে, মহারানী। কেউ শুনলে বলবে যে এরা এত রাত্তির ধরে মারামারি করছে। আমি নিজের কানে কি শুনেছি জানিস ? এই নিয়ে কথা হচ্ছে যে আমি আলাদা হবার সময় টাকা চেপে রেখেছিলাম, আর তাই দিয়ে এখন গরু কিনেছি।

হীরা বলছে তো ?

সারা গাঁই বলছে, হীরার কি বদনাম দেব ?

সারা গাঁ নয়, তোমার হীরাই বলছে ওকথা। আমি এখুনি গিয়ে জিজ্ঞাসা করে আসি, তোমাদের বাবা কত টাকা রেখে মারা গেছল। দাড়ি-গোঁফ ওয়ালা হুমদো হুমদো মিনসে, ওদের পেছনে আমার সর্বস্ব গেল। সারা জীবন মাটিতে মিশিয়ে দিলাম, মানুষ করে এত বড় করলাম, আর আমি হলাম অধার্মিক ? আমরা টাকা রেখেছি, ক্ষেতের মাঝে পুঁতে রেখেছি, বেশ করেছি। দু দুটো ষণ্ডামার্কের বিয়ে দিই নাই ? গাঁয়ে ভোজ দিই নাই ?

হরি এসব কথায় জ্বলে উঠল। ধনিয়া তার হাত থেকে গরুর রসি কেড়ে নিয়ে খুঁটোয় বেঁধে দরজার দিকে চলে গেল। খানিকক্ষণের মধ্যে ধনিয়ার কর্কশ স্বর কানে এল। হীরার গর্জনও শোনা গেল। আবার পুন্নীর কর্ণভেদী চীৎকারও কানে এসে বাজতে লাগল। হরি মাথায় হাত দিয়েই বসে ছিল। ওর বোকামিতেই এই কাণ্ডটা হল। নিজের ওপরই ওর নিজের রাগ হচ্ছিল। হঠাৎ তার মনে হল গোবরের কথা। লাফিয়ে বাইরে এসে তার খাটিয়া দেখল। গোবরও নাই। বিপদ হল। গোবরও

এই ঝগড়ায় হাজির। টাটকা রক্ত, কি করতে কি করে বসে। কিন্তু, হরিই বা যায় কিভাবে। হীরা বলবে, নিজে কিছু বলনা, এই ডাইনীকে পাঠিয়েছ লড়াই করতে। ক্রমে কোলাহল প্রচণ্ড হতে থাকে। সারা গাঁই জেগে পড়ে। যেন কোথাও আগুন লেগেছে, আর লোকেরা বিছানা ছেড়ে ছুটেছে ব্যাপার দেখার জন্য।

ধনিয়ার ওপর হরির রাগ হল। হরির চাষাড়ে বুদ্ধি ঝগড়াকে বড় ভয় করত। দু'চার কথা শুনে চুপ করে থাকা—এর চেয়ে ভাল আর কি আছে? কোথাও মারপিট হলেই থানাপুলিশ, ধরপাকড়। সকলের খোশামুদি কর, আদালতের ধূলা খাও, ক্ষেত খামার জাহান্নামে দাও। হীরার ওপর তার কোন জোর নেই, কিন্তু, ধনিয়াকে তো টেনে আনতে পারে। অনেক কিছু হবে, দু'একদিন না খেয়ে থাকবে, কিন্তু, থানা পুলিশের নবৎ ত বসবে না। হীরা দরজার কাছে গিয়ে সব চেয়ে দূরের দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে গেল। সেনাপতির মত যুদ্ধক্ষেত্রে আসার আগে অবস্থাটা ভাল করে বুঝে নিতে চায়, যদি জয়ই হতে থাকে, বলার কিছু প্রয়োজন নাই, হার হতে থাকলে তখনই লাফিয়ে পড়বে। দেখতে পেল জনা পঞ্চাশ লোক ভীড় করে আছে। পণ্ডিত দাতাদীন, লালা পটেশ্বরী, যে দু'জন ঠাকুর গাঁয়ের হর্তা কর্তা, সকলেই এসে পৌঁছেছে। ধনিয়ার পাল্লা হাল্কা হচ্ছিল। তার উগ্রতা জনমতকে তার বিরুদ্ধে ঠেলে দিচ্ছিল। সে রণনীতিতে কুশল ছিল না। ক্রোধ তার এত বেশি ছিল যে তার প্রতি সকলের সহানুভূতি কমে যাচ্ছিল।

হীরা বলছিল—তোর বাড়ীতে কুকুরের মত এক টুকরা খেতাম, আর সারাদিন কাজ করতাম। ছেলেবেলা কি আর জোয়ান বয়স কি তা জানতে পারি নাই। সারাদিন ধরে শুধু শুকনো গোবর জল দিয়ে মাখতাম। তারপরও দশটা গালি না দিয়ে রুটি দিস নাই। তোর মত রাক্ষসীর হাতে পড়ে প্রাণ শুকিয়ে গেল।

ধনিয়া ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, কথা সামাল, না হলে জিভ টেনে বের করব। তোর বৌ রাক্ষসী, তুই কোন ফেরে লোকের গলা কাটবি, চুকলিখোর নেমক হারাম।

দাতাদীন টিপ্পনী কাটল, এত কটু কথা বলছ কেন ধনিয়া? নারীর ধরম হল চুপ করে সহ্য করা। ও ত একটা গুণ্ডা, ওর কথার জবাব দাও কেন?

পাটোয়ারী লালা পটেশ্বরী বলল, কথার জবাব কথা, গাল নয়। তুই শিশুকালে ওদের মানুষ করেছিস। কিন্তু, একথা ভুলে যাস কেন যে ওদের জমিজমা তোর হাতেই ছিল?

ধনিয়া বুঝল সবাই পরামর্শ করে ওকে ছোট দেখাতে চায়। একা চারমুখী

লড়াইএর জন্য তৈরী হয়ে বলল, আচ্ছা তুমি থাকতে দাও লালা, আমি সকলকে চিনি। এই গাঁয়ে কুড়ি বছর কাটালাম। আমি গাল দিচ্ছি, আর ও ফুলবৃষ্টি করছে, না?

দুলারী সাহুয়াইন আগুনে ঘৃতাহুতি দিল—কি ভয়ানক গালবাজ মেয়েরে ভাই। পুরুষ মানুষের মুখে মুখে জবাব দেয়। হরির মত মরদ বলেই এর চলে, আর কোন মরদ হলে একদিনও পটত না।

হীরা যদি এসময়ে একটু নরম কাটিত, তবে ওরই জয় হ'ত। কিন্তু, নিজের পক্ষে সবাইকে দেখে ও একটু বাঘের মত হল। বাইরে এসে গলা ছেড়ে বলল—চলে যা আমার দরজা থেকে নইলে জুতো পেটা করব। ঝুঁটি ধরে ওপড়াব। গাল দিচ্ছিস ডাইন? ছেলের দেমাক হয়েছে? রক্ত···

পাশা উল্টে গেল। হরির রক্ত উছলে পড়ল। সামনে এসে বলল, বাস্, চুপ কর, হীরা, আর শোনা যায় না। এই মেয়েটাকে কি বলব? এরই জন্য আমার পিঠে ধূলো লাগে। জানি নে একে দেখে চুপ করে থাকা যায় না কেন।

চার দিক থেকে হীরার ওপরই গালি বর্ষণ হতে লাগল। একটা অসংযত বাক্য হীরাকে ফেলে দিল গর্তের মধ্যে। আর হরির সংযত-বাক্য আর যা বাকী ছিল তা পূর্ণ করে দিল। হীরা সামলে নিল। সারা গাঁ তার বিরুদ্ধে গেছে। এখন চুপ করে থাকাই মঙ্গল। ক্রোধের নেশায়ও তার এটুকু জ্ঞান বাকি ছিল।

ধনিয়ার কলিজা দুই টুকরা হয়ে গেল। হরিকে বলল, শুনে নাও কান দিয়ে ভাইদের জন্য মরছিলে। এই তো ভাই। ও আমাকে জুতো পেটা করবে। খাইয়ে দাইয়ে···

হরি ধমক দিল, আবার তুই বকবক শুরু করেছিস? ঘরে যাস না কেন?

ধনিয়া মাটির ওপর বসে আর্তস্বরে বলতে লাগল, এখন তো এর জুতো খেয়ে তবে যাব। গোবর কই। তুই দেখ বেটা, দেখছিস তো তোর মাকে জুতো পেটা করছে।

বিলাপ করতে করতে নিজের ক্রোধের সঙ্গে ও হরির ক্রোধকেও উদ্দীপ্ত করে তুলছিল। হীরা যেন পরাজিত হয়ে পিছু হটে গেল। পুন্নী তার হাত ধরে ঘরের দিকে টানছিল। সহসা ধনিয়া সিংহিনীর মত লাফিয়ে হীরাকে এত জোরে ধাক্কা দিল যে সে সামলাতে না পেরে পড়ে গেল, আর ধনিয়া বলতে লাগল,—কোথায় যাস, জুতা মার, মার জুতা, দেখি তোর মরদানি।

হরি দৌড়ে এসে তার হাত ধরে হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে ঘরে নিয়ে চলল।

গোয়ালপল্লী থেকে গোবর যখন গরু আনতে গিয়েছিল, তখন ঝুনিয়ার সঙ্গে অনেক কথা হল। ও গরু নিয়ে রওনা হলে ঝুনিয়াও অর্ধেক পথ সঙ্গে সঙ্গে এল। গোবর একা কিভাবে গরু নিয়ে যাবে! অপরিচিত লোকের সঙ্গে একলা যেতে গরুর আপত্তি করারই কথা। খানিক দূর গিয়ে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঝুনিয়া গোবরকে বলল: এখন কি আর তুমি এদিকে আসবে?

একদিন আগেও গোবর ছিল বালক। গ্রামের যুবতী মেয়েরা কেউ ছিল দিদি, কেউ বৌদিদি। বোনদের সঙ্গে হাস্য পরিহাস তো তেমন চলে না। অবশ্য বৌদিরা কখনো ঠাট্টা তামাসা করত, কিন্তু সে সব লঘু আমোদ মাত্র। ওদের মতে গোবরের যৌবনের ফুল সবে ফুটতে সুরু করেছে। যতদিন ফল না ধরে, ততদিন গাছে ঢিল ছোঁড়া নিরর্থক। কারু কাছে উৎসাহ না পেয়ে গোবর কৌমার্যকে গলার হার করে রেখেছে। ঝুনিয়ার বঞ্চিত অন্তর ভ্রাতৃবধূদের ব্যঙ্গবিদ্রূপের খোঁচায় জেগে উঠে আজ যেন ঐ বালকের প্রতি লুব্ধ হয়ে উঠল। আর ঘুমন্ত শিকারী যেমন পাতার খস্‌খসানি শব্দে জেগে ওঠে, তরুণ গোবরের সুপ্ত যৌবনও তেমনি জেগে উঠল।

গোবর এবার খোলাখুলি রসিকতা করে বলল, ভিক্ষা পাবে আশা থাকলে ভিক্ষুক দিনরাত দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে।

ঝুনিয়া কটাক্ষ হেনে বলল; তাহলে বল তোমারও কিছু মতলব আছে?

গোবরের ধমনীতে রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠছিল। বলল, ক্ষুধার জ্বালায় হাত যদি বেশী বাড়িয়ে থাকি তো মাপ করতে হবে।

ঝুনিয়া আরও গভীর জলে ডুবে বলল; তা ভিক্ষুকের আরও দশ বাড়ি ঘুরতে হয়। এক বাড়িতে দাঁড়িয়ে থাকলে কি পেট ভরে? আমি এরকম ভিখারী দেখতে চাইনা। এ রকম তো অলিতে গলিতে কতই মেলে। তা ছাড়া, ভিখারী কি দেয়? আশীষ! আশীষে কি পেট ভরে?

স্থূলবুদ্ধি গোবর ধনিয়ার কথার অর্থ ধরতে পারল না। ছোটবেলায়, শ্বশুরবাড়ীতে দুধ দই বেচে, মানুষের সংস্পর্শে এসে ঝুনিয়ার লোকচরিত্র সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। দু'চারটে টাকা, খানিক আমোদ, এসব হয়েছে। কিন্তু এ সব তো ভিক্ষা বৈ নয়। কামনাদীপ্ত মুখে গোবর বলল; ভিখারীর

যদি এক দুয়ারেই পেট ভরে তবে সে কি আর বারো দরজায় ঘোরে ?

ঝুনিয়া স্নিগ্ধ চোখে চাইল। বলল ; এক বাড়ীর দরজায়ই বা ভিখারীর পেট ভরে কবে ? পাবে তো এক মুঠো। সর্বস্ব তো তখনই পাওয়া যায়, যখন সর্বস্ব দেওয়া হয়।

আমার কি আছে ঝুনিয়া ?

ইস্ তোমার কিছুই নেই ? আমার তো মনে হয় তুমি আমাকে কিনে নিতে পার।

গোবর চকিতে ঝুনিয়ায় দিকে চাইল। ঝুনিয়া আরও বলল ; কি দাম দিতে হবে জান ? আমার হয়ে থাকতে হবে। যদি দেখি আর কারু কাছে হাত পেতেছ, ঘরের বার করে দেব।

অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে ঠিক জিনিসটি খুঁজে পেলে যেমন হয়, গোবরের মনের ভাব সেই রকম। এক বিচিত্র ভয় মিশ্রিত আনন্দে ওর প্রতিটি রোম পুলকিত হয়ে উঠল। কিন্তু, কিভাবে তা সম্ভব ? ঝুনিয়াকে যদি রাখতেই হয় তবে ওকে নিয়ে বাড়িতে ওঠা সম্ভব নয়। রক্ষিতাকে ঘরে নিয়ে গেলে বাপ, মা তো বটেই আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সারা গাঁ বিরুদ্ধে যাবে। তবে মেয়ে হয়ে ঝুনিয়া যদি ভয় না পায় তবে আমি পুরুষ মানুষ হয়ে ভয় করি কেন ? এই ঝুনিয়ার মত মেয়ে গাঁয়ে আর আছে কি ? কেমন বুদ্ধিমতির মত কথাবার্তা। গাঁ আমাকে বার করে দিলে আর কি গ্রাম নেই। আর গ্রামই বা ছাড়ব কেন ? এই তো দাতাদীনের ছেলে মাতাদীন চামারণী নিয়ে আছে। হ্যা, ও ওর ধর্ম বজায় রেখেছে, চামারণীর হাতে খায় না। আর ঐ যে ঝিঙ্গুরী সিংহ ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে আছে, তারই বা কে কি করে ? বরং ওর প্রতিপত্তি গেছে বেড়ে। পুরুতগিরি তো ছিলই, এখন ব্রাহ্মণীর পয়সায় রীতিমত মহাজন।···কিন্তু, ঝুনিয়া ঠাট্টা করছে না তো ?

আচ্ছা ঝুনা, সত্যি বলছ, না আমায় উসকাচ্ছ ? আমি তো তোমারই হয়ে গেছি, কিন্তু, তুমি যাবে তো ?

তুমি আমার হয়ে গেছ ? ওরকম মুখের কথা দেনেওয়ালা লোক অনেক দেখেছি। ভ্রমরের মত ফুলে ফুলে মধু খেয়ে চলে যায়। তুমিও ওই রকম উড়ে যাবে না তো ?

গোবরের এক হাতে গরুর দড়ি, অন্য হাতে সে ঝুনিয়ার হাত ধরল। তার মনে হল যেন বিদ্যুতের তারে হাত লেগেছে। কি কোমল, মাংসল হাতখানি ! ঝুনিয়া হাত ছাড়িয়ে নিল না। অবশ্য এ স্পর্শে ওর কাছে ততটা গুরুত্ব নেই। কিন্তু খানিক পরে গম্ভীর হয়ে বললে ; আজ তুমি আমার হাত ধরেছ মনে থাকে যেন।

খুব মনে থাকবে ঝুনা, যতদিন নিঃশ্বাস পড়বে, তোমার সঙ্গে থাকব।

ঝুনিয়া অবিশ্বাসের হাসি হাসল। কত বাবু, মহাজন, উকিল, ব্রাহ্মণ ওকে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছে। সবাই নানাভাবে তাকে পটাতে চেয়েছে। ও-ও ওদের খেলিয়েছে। জব্দ করেছে। ঝুনিয়া কত রকমের মানুষ দেখেছে। বড়লোকদের দেখেছে, যারা তোমার আমার মত পঞ্চায়েত জ্ঞাতি-কুটুম্বের ভয় করে না। কিন্তু, ঝুনিয়ার কথা হল, আমি যার হব, সারাজীবন তারই থাকব, সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে তারই সঙ্গে চলব। সকলের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করি, তাতে কিছু যায় আসে না। না টাকার কাঙ্গাল, না গয়নার। আমি চাই একটি ভাল লোককে ভালবাসতে, যে আমাকে আপনার মনে করবে, আমিও যাকে আপন ভাবব। গয়না গাটি, শাড়ী, মেঠাই, মণ্ডা আমারও কম ভাল লাগে না; কিন্তু, তাই বলে তার জন্য নিজের লজ্জা সরম খোয়াতে হবে, ভগবান যেন এমন মতি না দেন। বেশী লোভ করতে গিয়ে পুরুষ বল স্ত্রী বল সবাই নষ্ট হয়ে যায়। পুরুষ মানুষ যদি এর ওর দিকে দৃষ্টি দেয়, তবে মেয়েরাও চোখ নাচাবে। তুমি জ্বালাও দেবে, আবার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যও থাকবে তা হয় না।

ঝুনিয়া অনর্গল ওর জীবনের অভিজ্ঞতার গল্প আর এইসব কথা বলে যাচ্ছিল। গোবরের কাছে এসব এক নূতন জগতের বার্তা। তন্ময় হয়ে শুনতে শুনতে কখনো কখনো ওর পা থেমে যাচ্ছিল। ঝুনিয়া আগে ওকে মুগ্ধ করেছিল, আজ বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিমতীর মত কথাবার্তা, অনুভূতি আর ওর নিজের সতীত্বের ব্যাখ্যানা তাকে অভিভূত করে ফেলল। ঝুনিয়ার এত রূপগুণ, এত জ্ঞান, ওকে পেলে গোবর ধন্য হয়ে যাবে। এব কাছে কিসের ভয় ভাই বন্ধু আর পঞ্চায়েতের?

ঝুনিয়া যখন দেখল যে এর গভীর অনুরাগ জন্মেছে, তখন বুকে হাত রেখে জিভে কামড় দিয়ে বললে: আরে এ যে তোমাদের গাঁয়ে এসে পড়েছি। তুমিও আচ্ছা বোকা, আমায় ফিরে যেতে বললে না তো?

এবার ঝুনিয়া ফিরে চলল। যাবার আগে বলল; আচ্ছা, তুমি বল, আবার কবে আসবে? আজ আমাদের বাড়ীর কাছে গান বাজনা হবে, আমি থাকবো, তুমিও এসো, কেমন?

আর যদি তুমি না আসতে পার?

তবে ফিরে যেও।

তাহলে আমি যাব না।

আমি জানি, না বললেও তুমি ঠিক আসবে।

তুমিও আসবে, কথা দাও।

আমি কারুকে কথা দিই না।
তবে আমিও যাই না।
ইস্ আমার বয়েই গেল।
ঝুনিয়া বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ফিরে চলল। ঝুনিয়া জানে গোবর আসবেই; কেন আসবে না? গোবর ভাবল, ঝুনিয়া নিশ্চয়ই আসবে। না এসে থাকতে পারবে কেন?
গোবর যখন একা একা গরুটিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল, তখন তাকে দেখলে মনে হত যেন সন্ত স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে এসেছে।

॥ চার ॥

যেদিন থেকে হরির ঘরে গাই এসেছে, সেদিন থেকেই ঘরের শ্রী ফিরে গেছে। ধনিয়া তো দর্প চেপে রাখতে পারে না। যখনই যাও, দেখবে সে গরুর সেবায় লেগে আছে।
ভূষি ফুরিয়ে গিয়েছিল, আখে অল্প অল্প কটু গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। তাই-ই কুচি কুচি করে কেটে গরু ছাগলকে খাওয়াতে হচ্ছে। কবে বৃষ্টি পড়বে, নূতন ঘাস গজাবে, সে আশায় সবাই বসেছিল। কিন্তু, আষাঢ়ের মাঝামাঝি হয়ে এল, তাও বর্ষা নামল না। এমন সময় একদিন ধারাবর্ষণ সুরু হল। কিন্তু, রায়সাহেবের পেয়াদা এসে বললে, আগেকার বাকী শোধ না হলে জমিতে চাষ চলবে না। পেয়াদা পণ্ডিত নোখেরাম। লোকটি মন্দ নয়। কিন্তু, হুজুরের হুকুম। ওর হাতে পায়ে ধরেও কাজ হলনা। কিংকর্তব্য বিমূঢ় কিষাণরা মহাজনদের শরণাপন্ন হল। অন্য সব মহাজনের টাকা শোধ হয় নাই, তাই হরিকে যেতে হল ঝিংগুরী সিংহের কাছে। লোকটা কাগজ লেখায় পাকা, নজরানা আলাদা লেখে, দস্তুরি আলাদা, স্ট্যাম্পের দাম আলাদা ধরে। তা ছাড়া এক বছরের সুদ কেটে রেখে ধার দেয়। পঁচিশ টাকার কাগজ লিখিয়ে সতের টাকা মেলে।
ঝিংগুরী সিংহ বসে দাঁতন করছিল। বেঁটে, মোটা, টাকপড়া, কালো, মস্ত একটা নাক, আর প্রকাণ্ড এক জোড়া গোঁফ, লোকটা যেন ভাঁড়। আর সত্যিই খুব রসিক। এ গাঁয়ের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী পাতিয়ে ছেলেমেয়েদের শালা শালী সাজিয়ে খুব রঙ্গ করত। ছেলেরা পথে দেখা হলেই চিৎকার করে বলত, পণ্ডিতজী, নমস্কার। আর সেও চটপট আশীর্বাদ করত—চোখ কানা হোক, তোর ঘরে আগুন লাগুক, মৃগী হোক ইত্যাদি। রসিকতা সবাই

বুঝত আর হাসিতে লুটিয়ে পড়ত। কিন্তু, টাকা লেনদেনের ব্যাপারে লোকটা বড়ই কড়া।

এ হেন লোককে নমস্কার করে হরি নিজের বিপত্তির কথা বলল। ঝিংগুরী সিংহ রসিকতা করে বললে, কি হে তোমার মাটিতে লুকোনো সব টাকা গেল কোথায়?

ঠাকুর হাতে যদি আগেকার টাকা থাকত, তবে কি মহাজনের হাত থেকে মাথাটা ছাড়িয়ে আনতাম না। কেউ কি সখ করে অপরের কাছে সুদ গুণতে যায়?

যেদিন ঝিংগুরী সিংহ হরির বাড়িতে গরু বাঁধা দেখেছে, সেদিনই তার উপর নজর দিয়েছে। আজ সে সুযোগ উপস্থিত। আস্তে আস্তে এ কথা সে কথার পর কথাটা পড়ল। দলিল লেখা পড়া করতে গেলে সুদও বেশী পড়ে, নানান ঝামেলা। তার চেয়ে বরং হরি কিছু বাঁধা রেখে যত খুশি টাকা নিয়ে যাক। গয়নাগাটি না থাকে তো গরুটাই বন্ধক রাখুক। পরে টাকা হলেই আবার তা ছাড়িয়ে নেবে। গরু থেকেই যাচ্ছে। সুদও কম লাগছে। টাকাও পাচ্ছে বেশী।

হরি কিন্তু ঘরে এসে যেই কথাটি বলল অমনি সমস্বরে সকলে প্রতিবাদ করে উঠল। ধনিয়ার গলা কমই, দুই মেয়ে চীৎকারে দুনিয়া মাথায় তুললে। সোনা এমন কথা পর্যন্ত বলল যে, আমাকে বেচে টাকা আন, গাইটার চাইতে কিছু বেশীই আসবে।

মেয়ে দুটি গাই-অন্ত প্রাণ। শীঘ্রই তার একটি সুন্দর বাছুর হবে, এখনই তার নামকরণ হয়ে গেছে 'মটরু'। তবে ভালমন্দ পাঁচ রকম বুঝিয়ে হরি ধনিয়াকে রাজী করে আনে। বিপদে পড়লে ধর্মই বেচতে হয়, এ আর কি? অবশেষে ঠিক হয় মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়লে চুপি চুপি গরুটা ঝিংগুরী সিংহকে দিয়ে আসা হবে।

দিন কোনক্রমে কাটল। সন্ধ্যা হয়েছে। দুই বোন ঘুমিয়ে পড়েছে। গোবর এই দৃশ্য দেখতে চায়না, সে কোথায় বেরিয়েছে। হরির মনও বাইরে কঠিন হলেও ভিতরে চঞ্চল। গরুটির সামনে দাঁড়িয়ে ওর মনে হলো গরুটি যেন বলছে, এই তোমার কথার দাম? আমি তো তোমার কাছে কথার খেলাপ করি নাই। শুকনো শাকনা যা দিয়েছ, তাই খেয়ে সন্তুষ্ট ছিলাম।

ধনিয়া বলল: মেয়েরা ঘুমিয়েছে, এই বেলা তাড়াতাড়ি কর। বেচবেই যদি, এখনই নিয়ে যাও।

হরি ধরা গলায় বলল, আমার যে হাত সরে না ধনিয়া। থাক, সুদেই ধার করব। ভগবান দিন দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। এবারে আখটা ভাল

উঠলেই হয়।

ধনিয়া গর্ব আর অনুরাগে ভরা দৃষ্টি মেলে বলল, তা নয় তো কি?

ঘরের ভিতর গুমোট ছিল। আকাশে মেঘ, কিন্তু বৃষ্টি নেই। গাছের পাতাও নড়ে না। হরি গরুটাকে একটু বাইরে ঠাণ্ডায় বেঁধে দিয়ে শোভার সঙ্গে দেখা করতে গেল। এগারোটা বাজতেই হরি ঘরে ফিরল। ভিতরে যাবার সময় মনে হল কে যেন গরুটার কাছে দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞাসা করল, কে রে ওখানে দাঁড়িয়ে?

হীরা বলল, দাদা আমি, তোমার উনান থেকে আগুন নিতে এসেছি।

হীরা যে আর কোথাও না গিয়ে ওর কাছেই আগুন নিতে এসেছে তাতেই হরি গলে গেল। স্নেহমাখা স্বরে বলল, তামাক আছে? না, দেব?

না, তামাক আছে দাদা।

শোভার আজ বড় বাড়াবাড়ি।

কোন ওষুধ খাবে না তো কি করা যাবে।

হরি বলল, এইটেই ওর খারাপ। কারো কথা শোনে না। অবশ্য অসুখের সময় সবাই খিটখিটে হয়ে যায়। মনে আছে, যেবার তোর ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল, ওষুধ নিয়ে বাইরে ফেলে দিতিস? আমি তোর হাত দুটো ধরে রাখতাম আর তোর বৌদি জোর করে মুখের মধ্যে ওষুধ ঢেলে দিত। ওকে তুই কত গালাগালি করতিস।

হাঁ দাদা, নিশ্চয় মনে আছে সে কথা কি ভুলতে পারি? তোমরা যদি অত করে না বাঁচাতে তবে সেদিন তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া করত কে?

হরির মনে হল হীরার গলাটা যেন ভারী-ভারী, ধরা-ধরা। বলল, আর, ভাই, ঘরের লোকের মধ্যেই তো ঝগড়া বিবাদ, যার একার ঘর, তার সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ কে করে।

দুই ভাই একসঙ্গে তামাক খেতে লাগল। হীরা ফিরে গেল আর হরি অন্দরে প্রবেশ করল।

ধনিয়া রাগত স্বরে বলল, দেখ তোমার উপযুক্ত পুত্রের কীর্তি দেখ। এতখানি রাত হয়েছে তা বাবুর সাঁঝ বেড়ান হলনা। ভোলার ঐ বিধবা মেয়েটার খপ্পরে পড়েছে তোমার ছেলে।

হরি কথাটা শুনেছিল, কিন্তু বিশ্বাস করে নাই। বলল, কে বলেছে?

ধনিয়া রণচণ্ডী মূর্তি ধরে বললে, তোমার কাছেই শুধু লুকোনো আছে, আর সবাই জানে। তোমার ছেলেটা বোকা। ওদিকে সে তো সাতঘাটে জল খাওয়া মেয়ে।

গরুর ব্যাপারে হরির মনটা ছিল প্রসন্ন। সে পরিহাস করে বলে, ঝুনিয়া

তো দেখতে শুনতে ভালই। ওকেই বিয়ে করুক না, এরকম সস্তায় বৌ কোথায় পাবে?

ধনিয়া তীক্ষ্ণ গলায় বললে, এ ঘরে আসবে ঝুনিয়া? বিধবা ছুঁড়ির মুখ পুড়িয়ে দেব না?

এমন সময় গোবর হঠাৎ ঘরে ঢুকে ভয় চকিত স্বরে বললে, বাবা সুন্দরিয়ার কি হয়েছে? ও তো পড়ে আছে আর বুক ধরফর করছে। হরি দৌড়ে বাইরে এল, আর বলতে থাকল, কি অলুক্ষণে কথা মুখ দিয়ে বার করছিস? এই তো দেখে এলাম, দিব্যি শুয়ে ছিল।

তিনজনে তাড়াতাড়ি প্রদীপ নিয়ে এসে দেখল, সুন্দরীর মুখ দিয়ে ফেনা বার হচ্ছে, চক্ষু পাথরের মত নিশ্চল, পেট ফুলে উঠেছে আর পা চারটি একদম মেলে দিয়েছে।

গাইকে কেউ বিষ খাইয়েছে!

পরদিন সকালে হরির ঘরে মহা বিভ্রাট। হরি ধনিয়াকে মারছে আর ধনিয়া হরিকে গালি দিচ্ছে। সে কি মার! মেয়ে দুটি বাবার পা জড়িয়ে ধরছে, আর গোবর বার বার হরিকে পেছনে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু হরির প্রচণ্ড ক্রোধ যেন ওর কোন গোপন শক্তিকে জাগিয়ে তুলেছে। সারা গাঁ তামাশা দেখার জন্য ছুটে এসেছে। হাতের লাঠি ঠক ঠক করতে করতে শোভাও এসে হাজির। দাতাদীন ধমক দিয়ে বললে; কি ব্যাপার হরি, তুমি কি পাগল হলে? হীরার ছোঁওয়া লাগল নাকি তোমার?

হরি তাকে প্রণাম করে বললে, আপনি এ নিয়ে কিছু বলবেন না। ও মাথায় চড়ে বসেছে। ওর বদ্ অভ্যেস ছাড়িয়ে আমি থামব।

ধনিয়া রাগে দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বললে, মহারাজ, আপনি সাক্ষী রইলেন। আমি আজ এর খুনে ভাইকে জেলে পাঠিয়ে ছাড়ব। এর ভাই বিষ খাইয়ে আমার গরুকে মেরেছে .....

দাঁতে দাঁতে ঘসে রক্ত চক্ষু হরি বললে, আবার ঐ কথা মুখে আনছিস? তুই কি দেখেছিস হীরা আমার গরুকে বিষ খাইয়েছে?

আচ্ছা, তুই দিব্যি করে বল তো, কাল হীরাকে অন্ধকারে গরুর নাদের কাছে দাঁড়াতে দেখেছিলি কিনা?

হ্যাঁ, আমি শপথ করছি, দেখি নি।

ছেলের মাথায় হাত রেখে বলতে হবে।

গোবরের মাথার ওপর কম্পিত হাতখানা রেখে খিক্কারের স্বরে হরি বললে, ছেলের মাথার দিব্যি, আমি হীরাকে নাদের কাছে দেখিনি।

হরির এই মিথ্যে কথায় ধনিয়ার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। সত্যি কথা বলতে কি, হীরার ব্যাপারে ধনিয়ার মনে কোন সন্দেহই ছিল না। কিন্তু কাল সারা গ্রামের লোক শোক করতে করতে চলে যাবার এবং মেয়ে দুটি কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ার পর, হরি নিজের মুখে ধনিয়াকে এই সংবাদ জানিয়েছে। আর আজ সে ভাইয়ের পক্ষ নিয়ে মিছে কথা বলছে? দুঃখে, ঘৃণায় ধনিয়া অভিসম্পাত দিতে লাগল, বিলাপ করতে লাগল। ওর বেটার মাথার একটি চুলও যদি খসে যায়, ধনিয়া এই ঘরে আগুন লাগাবে। এই ঘরে এসে ধনিয়া কত দুঃখ সহ্য করেছে। সবাইকে ভরপেট খাইয়ে নিজে শুধু জল খেয়ে কাটিয়েছে। একটি একটি করে পয়সা ক্রিয়াকর্মের জন্য সঞ্চয় করেছে, কত অভাব, কত ক্লেশে দিন কাটিয়েছে। সে সব ত্যাগের এই পুরস্কার? ভগবান আজ কেন চুপ করে আছেন? গজের আর দ্রৌপদীর দুঃখে তিনি বৈকুণ্ঠ থেকে ছুটে গিয়েছিলেন, আর, আজ কেন তিনি এমন গভীর ঘুমে অচেতন?

ধীরে ধীরে কারুর আর সন্দেহ রইল না যে হীরাই গরুটিকে বিষ দিয়েছে। বাপের মিথ্যা শপথে গোবরও বিরূপ হয়ে উঠল। এর পর দাতাদীনও যখন হরিকে তিরস্কার করল, তখন ওকে হার মানতে হল। সে চুপচাপ বাইরে চলে গেল। সত্যের জয় হল।

এদিকে, আবার হীরাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পুনিয়া বলছে, সে লোটা, কম্বল, লাঠি সব সঙ্গে নিয়ে গেছে। পুনিয়া জিজ্ঞাসা করেছিল, কোথায় যাচ্ছ, সে কোন জবাব দেয়নি। ও একটা কৌটোয় পাঁচটা টাকা রেখেছিল। এখন সেই টাকাটাও নেই। সম্ভবতঃ হীরাই টাকাটা নিয়েছে। ধনিয়া শান্ত ভাবে বলল, মুখে চুন কালি মেখে কোথাও পালিয়েছে। শোভা বলল, পালাবে কোথায়? গঙ্গাস্নানে যায়নি তো? ধনিয়া বলল, গঙ্গা নাইতে গেলে টাকা সঙ্গে নেওয়া কেন? এখন তো কোন পরব নেই।

সন্দেহের নিরসন হল না—ধারণা আরও দৃঢ় হল।

আজ হরির ঘরে হাঁড়ি চড়েনি। বলদ দুটিকেও কেউ দানাপানি দেয়নি। সমস্ত গাঁয়ে ঐ এক কথা। পুনিয়া সারা দিন বসে কেঁদেছে। যেটুকু দুর্ভোগ বাকী ছিল, সন্ধ্যার সময় দারোগা এসে সেটি পুরিয়ে দিল। খবর পাওয়া মাত্র সারা গাঁ ভেঙ্গে পড়ল। দাতাদীন, ঝিংগুরী সিংহ, নোখেরাম, তার চার পেয়াদা, লালা পটেশ্বরী সবাই এসে দারোগার কাছে হাত জোড় করে দাঁড়াল। হরিও কাছে এসে দাঁড়াল। ও তো এমন ভয় পেয়েছে যেন ফাঁসী কাঠের আসামী। ধনিয়াকে মারবার সময় ওর কি তেজ, আর এখন যেন কচ্ছপের মত ওর হাত পা ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিল। দারোগার পাকা বুদ্ধি ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে সব স্পষ্ট হয়ে উঠল, বুঝে নিল, এই হরিকে শায়েস্তা করতে

একটি ভ্রূকুটির ওয়াস্তা। তার আর সন্দেহ রইল না যে আজ বেশ ভাল লোকের মুখ দেখেই সকালে উঠেছে।

দারোগা প্রশ্ন করলে, তোর কাকে সন্দেহ হয়?

হরি প্রায় মাটিতে লুটিয়ে জোড়হাতে বললে, হুজুর, গরু বুড়ো হয়ে গিয়েছিল। ওর স্বাভাবিক মরণ হয়েছে।

ধনিয়া পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। একথায় তাড়াতাড়ি বললে, না। তোমার ভাই হীরা গরুকে মেরেছে।

দারোগা জিজ্ঞেস করল, এটি কে? তখন ভীড়ের মধ্য থেকে কলরব উঠল, ধনিয়া, হুজুর, হরির বৌ। দারোগা সব শুনে জবান বন্দী নিতে চাইল, হীরার খোঁজ করল, এবং তার বাড়ী খানাতল্লাসী করতে চাইল। তাতে হরির বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল। আজ যখন হীরা ঘরে নেই তখন হীরার ঘরে তল্লাসী হবে। আর হরি তাই সইবে? ও বেঁচে থাকতে তা হতে দেবে না। ধনিয়া যখন আজ ওর বংশের ইজ্জত নষ্ট করতে বদ্ধ পরিকর, তখন, ও যেখানে খুশী চলে যাক সে তাব পরোয়া করে না।

গায়ের উপস্থিত বিশিষ্ট লোকেরা এই বিপত্তিকে ঠেকাবার চেষ্টা করতে লাগল। দাতাদীন, পাটেশ্বরীলাল, সকলেই বললে, দারোগার এ কেবল টাকা আদায়ের ফন্দী! ঝিংগুরী সিংহ হরিকে কানে কানে বললে, যা পাবো, দিয়ে বিদায় কর, নইলে ছাড়ান নাই। কিন্তু এখন হরি টাকা কোথায় পাবে? ধনিয়ার কাছে হয়তো দু'চার টাকা আছে, কিন্তু ও শয়তানী কি তা দেবে? অতএব, গাঁয়ের মোড়লরাই সঙ্কট ত্রাণে এগিয়ে এল। পটেশ্বরী খুব ধুরন্ধর। সেই দারোগার সঙ্গে তিশ টাকার একটা রফা করল, তবে বখরা আধাআধি। দারোগার পনেরো, চার প্রধানের পনেরো। ঝিংগুরী ইসারায় হরিকে ডেকে নিয়ে, ত্রিশটা টাকা তাকে হাওলাত দিয়ে বলল, আজই কাগজ লিখিয়ে নিও। তোমার মুখ দেখে দয়া হল, তাই তোমার ভালমানষির ওপর বিশ্বাস রেখে এই টাকাটা দিচ্ছি।

হরি টাকা কটি গামছায় বেঁধে প্রসন্ন মুখে দারোগার দিকে চলল। এমন সময় সহসা ঝড়ের বেগে ধনিয়া ওর হাত থেকে গামছাখানা ছিনিয়ে নিল। আলগা গেরো খুলে টাকাগুলি মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল। ক্রুদ্ধ সাপিনীর মত সে ফোঁস করে উঠে বললে, এই টাকা কোথায় নিয়ে চলেছিস, বল। ঘরের লোক না খেতে পেয়ে বাঁচেনা, আমার পরণে একখানা কাপড় জোটে না, আর উনি চলেছেন আজলা ভরা টাকা নিয়ে ইজ্জত বাঁচাতে। যার ঘরে ইঁদুরও খেতে পায় না, তার আবার ইজ্জত।

হরি কোন মতে রাগ চেপে রাখল। তার সর্বশরীর ঠক ঠক করে কেঁপে

উঠল। নেতাদের মাথা নিচু হয়ে গেল, আর দারোগার মুখও একটু শুকিয়ে গেল। এ রকম লাঞ্ছনা সে জীবনে কখনো দেখেনি।

হরি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। এই প্রথম এতগুলি লোকের সামনে ধনিয়া ওর মাথাকে ধুলোয় লুটিয়ে দিল। দারোগা খোঁচা দিয়ে বললে, আমার তো মনে হচ্ছে এই শয়তানীই হীরাকে ফাঁসাবার জন্য গাইকে বিষ দিয়েছে।

ধনিয়া হাত কচলাতে কচলাতে বললে, হ্যাঁ দিয়েছি তো। আমার নিজের গরু নিজে মেরেছি, তাই তো? তোমার যদি তাই বিচার হয়, দাও, আমার হাতে হাতকড়া। তোমাদের ন্যায় বিচার আমার জানা আছে। দুধকে দুধ, জলকে জল বলা এক কথা, আর গরীবের গলায় ছুরি দেওয়া আর এক কথা।

হরির চোখে আগুন ঝরছিল। ও ধনিয়ার দিকে ছুটে যেতেই গোবর দুজনের মাঝখানে এসে বললে, থাম বাবা, ঢের হয়েছে। শীগগির পেছনে সরে যাও, নইলে আমি গলায় দড়ি দেব।

হরি সরে গেল। আর ধনিয়া বাঘিনীর মত এসে বললে, তুই সর তো দেখি, ও আমার কি করতে পারে? দেখি এর কেরামতিটা। ভাবে যে আমাকে ভাত কাপড় দিয়ে কিনে রেখেছে। বেশ, আজ থেকে নিজের ঘর সামলে নিক। দেখিয়ে দেব, এই গাঁয়ে বসেই জাতা পিশে ওর চেয়ে ভাল দিন কাটাব। ইচ্ছে হলে ও যেন দেখে আসে।

হরিকে হার মানতে হল। ও বুঝল, স্ত্রীর কাছে পুরুষ কত দুর্বল, কত নিরুপায়।

নেতারা ইতিমধ্যে টাকাগুলি কুড়িয়ে নিয়েছিল। ধনিয়া চীৎকার করে বললে, যার টাকা নিয়েছ, তাকে দিয়ে দাও। আমরা কারো কাছে ধার ধারব না। এরজন্য হাকিমের কাছে যেতে হয়, তাও রাজী। জমিদারের বাকি শুধবার জন্য পঁচিশটা টাকা চেয়েছিলাম, তা কেউ দেয় নাই। আর আজ ঠন ঠন করে আজলা ভরা টাকা বার করে দিচ্ছে। জানি, আমি সব জানি। এখানেই সব ভাগ বাঁটোয়ারা হচ্ছিল। সব ডাকাত। এরাই নাকি আবার গায়ের মুখ্য। সুদ, আসল, আধা, সওয়া, নজর-নজরানা, ঘুস-ঘাস, যা কিছু নিতে হবে, অমনি গরীবদের লুটতে হবে। ওদের আবার স্বরাজ মিলবে! জেলে গেলে স্বরাজ মেলে না। স্বরাজ মেলে ধর্ম আর ন্যায় দিয়ে।

নেতাদের মুখ কালি হয়ে গেল। দারোগার মুখে যেন ঝাঁটা পড়ল। মান বাঁচাবার জন্য সকলে মিলে হীরার ঘরের দিকে গেল।

দারোগা স্বীকার করল, হ্যাঁ বাহাদুর মেয়ে বটে!

পটেশ্বরী বলল, একে কি সাহস বলে হুজুর? মেয়ে ভারী ক্যাটক্যাটে। এমন মেয়েকে গুলি করে মারতে হয়।

একা তোমাদের আচ্ছা নাকাল করেছে তো! তোমরা তো ছিলে চারজন।
তা হুজুরের পনেরোটা টাকা খসে গেল।
আমার কি খসে? ও না দেয়, গাঁয়ের মাতব্বররা দিয়ে দেবে। পনেরোর বদলে পুরো পঞ্চাশ পেয়ে যাবো।
পটেশ্বরীলাল হেসে বললে, বড়লোকের লক্ষণই এই। এমন সব ভাগ্যবানের দর্শন কোথায় গেল?
দারোগাজী কঠোর স্বরে বললে, এ সব খোসামোদ পরে করো। এখন টাকাটা বার কর। না হলে তোমাদের ঘর খানাতল্লাসী করব। খুব সম্ভব, হীরা আর হরিকে ফাঁসাবার জন্য তোমরাই এই ধোঁকাটি সৃষ্টি করেছ।
নেতারা বেকুব বনে গেল। আপত্তি, বাদ, প্রতিবাদে কোন কাজ হল না। দারোগা বুঝে নিয়েছিল, যা অবস্থা, হীরার ঘর থেকেও কিছু পাবার উপায় নেই। অতএব সে মাতব্বরদের কাছেই টাকা আদায়ে বদ্ধপরিকর হল। টাকা ছাড়া ফিরে যাবে, তেমন বান্দা সে নয়। খুব কড়া করে বলল, গণ্ডা সিং এর হাতে যে মার খায় তাকে জল পর্যন্ত চাইতে হয় না। আমি পঁচিশ বছর দারোগাগিরি করছি। এক একজনকে পাঁচ-পাঁচ বছর ঘুরিয়ে আনব।
তখন প্রধানেরা পরামর্শে বসল। কি হল, ঠিক বোঝা গেল না। তবে হ্যাঁ, দারোগার মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল, আর চার সাধুর মুখে যেন চাবুক পড়ল।
দারোগা ঘোড়ায় চড়ে চলল দেখে, চার নেতা পেছন পেছন ছুটতে আরম্ভ করল। ঘোড়া বহুদূর গেলে, বেচারাদের ফিরতে হল। মুখ দেখে মনে হয় যেন প্রিয়জনের সৎকার করে শ্মশান থেকে ফিরছে।
দাতাদীন সহসা বললে, আমার শাপ ওর না লাগে তো, আর এ মুখ দেখাব না।
নোখেরাম বললে, এ রকম ধন কখনো টেঁকে না।
পটেশ্বরী বললে, পাপের ধন গোবিন্দে খায়।
ঝিংগুরী সিংহের আজ ঈশ্বরের ন্যায় পরায়নতায়ই সন্দেহ জেগেছিল। ভগবান কি সত্যিই আছে?
এই সময় এদের মুখগুলি হয়েছিল ঠিক ছবি তুলে রাখার মত।

হীরার কোন খোঁজ নেই। হরি কিছুদিন দৌড়ঝাপ করল, তারপর চুপ হয়ে গেল। এখন হীরার খামারের দেখা শোনা ওকেই করতে হয়। একলা পড়ে পুনিয়া আরও প্রচণ্ড হয়েছে। হরির ভাল মানুষির সুযোগ ও পুরোদমেই নিচ্ছিল। তা, হরি কি মেয়েমানুষের সঙ্গে বিরোধ করবে? হরি আর হীরার জমি একত্র। শ্রাবণ মাসে ধান রোপার এমন ধুম যে হরি আর লোক পায় না, তাও পুনিয়ার জমিতে ধান না বুনলে চলে না। হরি রাত জেগে ওর ক্ষেতে ধান বুনল। ফল হল এই যে, হরির ক্ষেতে ধান কম হল, আর পুনিয়ার ফসল রাখতে ঘরে কুলোয় না।

সেই বিপদের দিন থেকে হরি আর ধনিয়ার মন কষাকষি চলছিল। গোবরের সঙ্গেও বাক্যালাপ বন্ধ। আপনার ঘরেই ও পরবাসী। তুই নৌকায় পা দিলে যা হয়, হরির তাই হয়েছে। গাঁয়েও তার সেই প্রতিপত্তি নেই। এদিকে ধনিয়ার খ্যাতি খুব বেড়ে গেছে। এক মাস পর্যন্ত আশপাশের সকল গাঁয়েই এই নিয়ে চর্চা চলল। পুরুষ রমণী সকলেই খুব মুগ্ধ। কোথাও কোথাও ধনিয়াকে অলৌকিক রমণী বলে বলা হতে লাগল। "জান? মেয়েটার নাম ধনিয়া। ওর ওপর মা ভবানীর বিশেষ কৃপা। দারোগা যেদিন ওর স্বামীর হাতে হাতকড়া লাগাল, ও মা ভবানীকে স্মরণ করল। ভবানী ওর শরীরে ভর করলেন। ও এক ঝটকায় হাতকড়া খুলে ফেলল, আর দারোগার গোঁফ ধরে টেনে ওকে মাটিতে ফেলে ওর বুকের ওপর চেপে বসল।" কতদিন পর্যন্ত তো দলে দলে লোক ধনিয়াকে দেখতে এসেছে।

ধীরে ধীরে ধনিয়ার মধ্যেও একটা পরিবর্তন এসেছে। হরিকে দিনরাত পুনিয়ার ক্ষেতে লেগে থাকতে দেখেও কিছু বলে না। হীরার গৃহত্যাগেই ওর প্রতিশোধ স্পৃহা চুকে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে হরি জ্বরে পড়ল। ঋতু পরিবর্তনের জ্বর। পুরো একমাস সে খাটিয়ায় পড়ে রইল। মন্দ ভাগ্য, অনেক আশা ছিল এতদিনকার দেনাগুলি শোধ হবে। কিন্তু তা আর হল না। তবে একটা লাভ হল এই যে হরির অসুখে ধনিয়ার মন গলে গেল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলন হয়ে গেল। ধীরে ধীরে একদিন হরি সেরে উঠল।

সেদিন মাঘ মাসের রাত্রি। একে শীত, তায় মাঘের বর্ষা। ভাড়াভাড়ি খাওয়া

দাওয়া সেরে এই ঘোর অন্ধকারে হরি পুনিয়ার মটর ক্ষেতের ধারে নিজের ঝুপড়িতে এসে শুল। কিন্তু, হরির বাপ ঠাকুরর্দার আমলের শতচ্ছিদ্র মেরজাই আর বাইরে বন্দুকের গুলির মত শীতের বৃষ্টির ফোটা—এই দুই প্রবল শত্রুর সামনে ঘুম আসে, তার সাধ্য কি! ফাটা ফাটা পা দুটি পেটের কাছে গুঁজে হাত দুখানা জাঙ্গিয়ার মধ্যে ঢুকিয়ে, ছেঁড়া কম্বলে মুখ গুঁজে নিজের গরম নিশ্বাসে হরি শরীরটাকে গরম করার চেষ্টা করছিল। সে তার নিজের দুর্ভাগ্যের কথা, পুনিয়ার কৃতঘ্নতার কথা, ধনিয়ার প্রতি তার নিজের এতদিন-কার অকারণ কাঠিন্যের কথা ভাবছিল, আর নিজেকেই বৃদ্ধ বয়সের বুদ্ধি-হীনতার জন্য দোষারোপ করছিল। হঠাৎ বাইরে চুড়ির ঝংকার শোনা গেল। হরি নির্ঘাত জানে, হয় পাটায়ারীর মেয়ে, নয় পণ্ডিতজীর বৌ। গরীবের ক্ষেতের দুটি মটর চুরি করার জন্য এরা আসে। হরি চুপচাপ ঘাপটি মেরে শুয়ে রইল। নে, যত খুশি পারিস। মনে কর, আমি ধারে কাছেও নেই। বড় হয়ে ওরা যদি নিজের লজ্জা না বাচায়, তবে ছোটকে তো তার মান বাঁচাতেই হবে।

কিন্তু, না, এতো দেখি ধনিয়া চীৎকার করছে। ঘরে ঢুকে সে যা খবর দিলে তাতে হরি তো স্তম্ভিত হয়ে গেল। গোবরের বারবার গোয়ালা পল্লীতে যাওয়ায় তার খটকা লেগেছিল বটে। কিন্তু, তা যে এতদূর গড়াতে পারে, তা সে ভাবে নাই। নীল আকাশের গায়ে তুলোর গোলা উড়তে দেখে সে একদিন মনে মনে হেসেছিল। কিন্তু, তাই যে সারা আকাশ ছেয়ে অন্ধকারে ঢেকে দেবে, তা কে জানত? গোবর এত লম্পট! কিন্তু, হরির মনে খাওয়ার চিন্তা, পঞ্চায়েতের ভয়, ঝুনিয়া কি করে ঘরে থাকবে, এসব কোন কথাই এল না, তার ভয় হল গোবরের জন্য। ছেলেটা লাজুক, আনাড়ী, তায় অভিমানী, —না জানি কি অনর্থ করে বসে। ছেলেটার কোন খবর নেই। সে কোথায় পালিয়েছে। এদিকে মেয়ে তো পাঁচ মাসের পোয়াতি।

হরি বললে, ঝুনিয়া কিছু বলেনি গোবর কোথায় গেছে? ওকে খুব সম্ভব বলে গেছে।

ধনিয়া ঝাঁজের সঙ্গে বললে, তুমি কি আক্কেলের মাথা খেয়েছো? ওর মন পড়ে আছে এখানে, ও যাবে কোথায়? নিশ্চয় লুকিয়ে আছে। কিন্তু, ঐ লক্ষ্মীছাড়ি আমার ছেলেকে নষ্ট করেছে। আমি তোমায় বলে দিচ্ছে, ওকে আমি ঘরে থাকতে দেব না। আমার ঘরে এসব লম্পটের জায়গা নেই তুমি যদি এর মধ্যে কথা বল, তবে হয় তুমি ঘরে থাকবে, নয় আমি থাকব।

হরি বলল, তুই তবে ওকে ঘরে ঢুকতে দিলি কেন?

আমি কি সাধ করে ডেকেছি? এখন এত যে বলছি, মেয়ে কিছুতে উঠবে না

হতো দিয়ে পড়ে আছে।

চল দেখি কেমন না ওঠে, গলা ধাকা দিয়ে বের করব না।

ওই দাড়িওলা ভোলা সব দেখেও চুপ করে ছিল। এমন বেহায়া বাপও হয়!

ও কি করে জানবে, এদের পেটে এত জিলিপির প্যাঁচ।

জানে না আবার কি? গোবর রাত দিন ঘুরছে। কানা নাকি?

পথে নেমেই কিন্তু ধনিয়া হরিকে সাবধান করে দিল, বেশী সোরগোল যেন না করে, তবে গাঁ শুদ্ধু জেগে যাবে। হরি যত রাগে, ধনিয়া ততই তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত গভীর চিন্তা করে ধনিয়া বলল, দেখ, কালি যা লাগার লেগেই গেছে। যতদিন বেঁচে আছি, এ মুছবে না। গোবর নৌকা ডুবিয়ে দিয়েছে।

গোবর কেন ডোবাবে। ঐ মেয়েই ডুবিয়েছে। গোবর তো ছেলেমানুষ—যে-ই ডোবাক, ডুবে তো গেছে।

দুজনে কথা বলতে বলতে ঘরের দরজায় এসে পড়ল। দুই জনেরই হৃদয়ে যেন বিগত যৌবনের ভাবটি জেগে উঠল। এই বিগত যৌবনের অন্তরাল থেকে বালিকা ধনিয়া যেন হরির চোখের সামনে ফুটে উঠল—আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে যে ধনিয়া ওর জীবন-মন্দিরে প্রবেশ করেছিল। তার আলিঙ্গনে কি বাৎসল্য—যা সব কলঙ্ক, সব বাধাবিপত্তি দূরে ঠেলে হৃদয়কে কাছে টেনে নেয়।

কপাট ঠেলে ওরা ভেতরে প্রবেশ করল। পীলসুজের ওপর তেলের কুপিটি জ্বলছিল। তার ঈষৎ উজ্জ্বল আলোয় ঝুনিয়া হাঁটুর ওপর মাথা রেখে দরজার দিকে মুখ করে অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে। সে যেন আনন্দের সেই জ্যোতি রেখাটি খুঁজছে যা অল্পকালের জন্য মোহিনী মূর্তিতে ওর চোখ ভুলিয়েছিল। নিজের অদৃষ্ট প্রতিকুল, লোকের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ বানে জর্জরিত হয়ে ওর হৃদয় আশ্রয় তরু খুঁজে ফিরছিল। গোবরকে পেয়ে মনে হয়েছিল, নীড় পাওয়া গেছে—এখানে সুখ আছে শান্তি আছে। কিন্তু, আজ ও দেখছে, সেই সুখের আবাস ক্ষণিকের জন্য চোখ ঝলসিয়ে আলাদীনের রাজপ্রাসাদের মত অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। এতদিন গোবর ওকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। আজ আত্মহত্যার ভয় দেখানোতে, গোবর ওকে নিয়ে এই বাড়ীতেই আসছিল। বলেছিল মাকে বলে কয়ে রাজী করাবে। কিন্তু, বাড়ীর কাছাকাছি এসে অন্ধকারে কোথায় কেটে পড়েছে। ভবিষ্যৎ এক ঘোর দানবের মত ওর সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে।

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে হরিকে ঢুকতে দেখে ও কাঁপতে কাঁপতে হরির পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, বাবা, আমার আর কেউ

নেই, তোমরাই আছ। মারো, কাটো, যাই করো, তাড়িও না।
হরি নীচু হয়ে স্নেহভরে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বললে, ভয় নেই মা, ভয় নেই। এটা তোর ঘর, তোর বাড়ি। আমরাও সব তোর, এখানেই থাক তুই।
এদিকে পক্ষী যেমন তার শাবককে আগলায়, ধনিয়াও তেমনি ঝুনিয়াকে বুকে টেনে নিল। শ্বাশুড়ী বৌ ঘরে গেল। হরি দাওয়ায় শুয়ে রইল। আর গোবর কোথায় গেল এই চিন্তা ব্যাকুল পক্ষীর মত ওর হৃদয়াকাশকে আলোড়িত করতে থাকল।

গাঁয়ে এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেলে চতুর্দিকে যতটা ঘোঁট পাকান সম্ভব, সবই হল। একমাস পর্যন্ত ঝুনিয়ার দুই ভাই লাঠি হাতে গোবরকে খুঁজে বেড়াল। ভোলা ঘোষণা করেছে, হরির কাছে গাইয়ের দাম না পেলে সে আদালতে যাবে। গাঁয়ের লোকেরা হরিকে জাতিচ্যুত করেছে। তবে ধনিয়ার চণ্ডিমূর্তির ভয়ে হুক্কা বন্ধ করতে পারেনি। দুঃখ ঝুনিয়ারই সব চেয়ে বেশী। ভয়ে দুঃখে বেচারী বন্ধ ঘরে পড়ে থাকে। সারাদিন ঘরের কাজকর্ম করে, আর ফাঁক পেলেই একটু কেঁদে নেয়। অষ্টপ্রহর ভয়ে বুক কাঁপে, এই বুঝি ধনিয়া কিছু বলে। গাঁয়ের যেখানে তিন চারজন স্ত্রী পুরুষ একত্র হয় সেখানেই ওদের কুৎসা।
ধনিয়া ও হরির যুক্তি-ধারা কিন্তু অন্য রকম। গ্রামের মাতব্বরদের দেখো। এই যে পণ্ডিত দাতাদীন, ন্যায়াধীশ, ধর্মের অবতার। তারই পুত্র মাতাদীন এক চামারণীর সঙ্গে ফেঁসেছে। গাঁয়ের সবাই জানে। কিন্তু, তাদের প্রতিপত্তি তো তিলমাত্র কমেনি। লালা পটেশ্বরীও পরম ধার্মিক বলে পরিচিত। প্রতি পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণের কথা শোনে—এদিকে চাষীদের বেগার খাটিয়ে, চাষীদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে, পাঁচ-দশ টাকা সুদে ধার দিয়ে কয়েক হাজার টাকার সম্পত্তি করেছে! আর ঐ ঝিংগুরী সিং। প্রথম স্ত্রী পাঁচটি ছেলে মেয়ে রেখে মারা গেছে। তারপর আবার দুটি বিবাহ করেছে। নিজের বয়স পঞ্চাশ। ঘরে দুটি যুবতী বউ। ঠাকুরসাহেব স্ত্রীদের কঠোর শাসনে রাখে আর বড়াই করে বলে ওদের ঘোমটা পর্যন্ত কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু, ঘোমটার আড়ালে কত যে খেমটা চলে, সে কথা মুখের ওপর কে বলে?
ধনিয়া এ সব কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে স্পষ্ট করেই বলে, হরিও বিনীত ভাবে জানায় যে জ্ঞাতিকুটুম্বের ভয়ে খুনের কাজ সে করতে পারবে না। সেদিন যদি ধনিয়ার মন নরম না হত, তবে আজ এই বিপত্তি হত না ঠিকই, কিন্তু, ঝুনিয়া তাহ'লে আত্মঘাতী হত—দুটি প্রাণের হত্যার বিনিময়ে কি ওদের সম্ভ্রম রক্ষা পেত? এসব কথা সমাজের পছন্দসই নয়। স্বামী-স্ত্রী যেন স্পর্ধাভরে

সমাজকে বলছে, দেখি কতদূর যেতে পার। সমাজও দেখিয়ে দেবে, সমাজের মর্যাদা লঙ্ঘন করে কেউ সুখে নিদ্রা যেতে পারে না।

গ্রামবিধাতাদের বৈঠক বসল। দাতাদীন, পটেশ্বরী, ঝিংগুরী সিংহ, সকলেই একমত যে ছোট জাতকে বেশী বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। ভ্রষ্টা এবং কুলটার যদি শাস্তি বিধান না হয়, তবে সমাজে তো অনর্থ হবে। ঝিংগুরী সিংহ বলল, রায়সাহেবকে ব্যাপারটা জানাতে হবে।

কারকুন পণ্ডিত নোখেরাম বিশিষ্ট কুলীন ব্রাহ্মণ। ভোরবেলায় সে পূজায় বসে ; বেলা দশটা পর্যন্ত রাম নাম লেখে, কিন্তু ভগবানের কাছ থেকে ওঠামাত্র তার মানবতা উগ্ররূপে ফুটে ওঠে এবং তার কথাবার্তা কাজকর্ম সব বিষাক্ত করে তোলে। রায় সাহেবকে জানাবার প্রস্তাবে ওর অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়। ফোলা ফোলা গালের মধ্যে ঢুকে যাওয়া দুটি চোখ বড় বড় করে সে বললে, এর মধ্যে রায়সাহেবকে আবার কেন? বলে দাও একশ' টাকা জরিমানা,—এখনই গ্রাম ছেড়ে পালাবে, আর আমি জমি বেদখল করার ব্যবস্থাও করে দিচ্ছি।

পটেশ্বরী বলল, কিন্তু, খাজনা তো সব চুকিয়ে দিয়েছে।

ঝিংগুরী সিংহও সমর্থন করলে, হ্যাঁ, খাজনার টাকা আমার কাছ থেকেই ও নিয়েছে।

নোখেরাম সগর্বে বললে, কিন্তু, রসিদ তো তাকে দিই নাই।

যাই হোক সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল, হরিকে নগদ একশ টাকা আর ত্রিশ মণ ফসল জরিমানা দিতে হবে। হরি আর ধনিয়া দুজনকে ডাকা হল। ধনিয়া প্রবল প্রতিবাদ করল। কিন্তু, হরি সে মানুষ নয়। সে বলল, পঞ্চায়েতের মধ্যে ঈশ্বর আছেন, তাঁদের বিচারে যা ন্যায়-ধর্ম তা মাথা পেতে নিতে হবে। ধনিয়া আর কি করে। হরির নির্বুদ্ধিতার কাছে তার মেনেই ও ফিরে গেল। আর হরি এক প্রহর রাত পর্যন্ত আটি আটি ফসল তুলে দিয়ে ঝিংগুরী সিংহের গাড়ি বোঝাই করে দিল। পঞ্চায়েতের আতঙ্কেই হরি এ সব করছিল। জমিদার, মহাজন, সরকার—কার এত প্রভাব? ছেলেপুলের খাওয়ার চিন্তায় প্রাণ শুকিয়ে যায় ঠিকই, তবু সমাজের ভয় পিশাচের মত মাথায় গুঁতো দিতে থাকে। বিবাহ, অন্নপ্রাশন, চূড়া, কর্ণভেদ, জন্ম, মৃত্যু—সব নিয়েই সমাজ। সমাজের ভয়, বৃক্ষের মত জীবনের পরতে পরতে শিকড় গেড়ে বসে রয়েছে।

হরি যখন রাত এগারটায় ঘরে এল, তখন ধনিয়া বললে, এত রাত পর্যন্ত তোমার কি কাজ ছিল?

হরির সমস্ত রাগ গিয়ে গোবরের উপর পড়ল,—আর কি কাজ বল। কুপুত্রের

কর্মের ফল ভোগ করছিলাম। আশি টাকায় ঘরখানা লিখে দিতে হল। কি করি বল? জরিমানা দিয়ে দিলাম! এখন হুঁকো তো চল হল।
ঠোঁট কামড়ে ধনিয়া বললে, ভারী হল! আমি ভাবি তুমি এত বোকা হলে কি করে? আমাদের কাছে তো খুব কথা ফোটে। বাপ দাদার চিহ্ন এই ঘরখানা লিখে দিলে, এরপর যে তিনচার বিঘে জমি আছে তাও লিখিয়ে দিও, তোমার মুখে জিভ ছিল না? পঞ্চকে জিজ্ঞাসা করতে পারনি, তোমরা কোথাকার সাধু সজ্জন··
ধনিয়া উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকল, মানুষের এত ভাল মানযেমি ভাল নয়। কুকুরেও লাথি মারে। আমার ভাঙ্গা কপাল, তাই তোমার মত পুরুষের হাতে পড়েছি। কখনো সুখের ভাত জুটল না।
আমি কি তোমার বাবার পায়ে ধরে সেধেছিলাম? সেই তো আমার গলায় তোমাকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল।
ওঁর বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। জানিনা কি দেখে বাবা ভুলেছিল, এমন কিছু রূপও তোমার তো ছিল না।
বিরাগ অনুরাগের ভূমিতে এসে ঠেকল। আশি টাকা না হয় গেছে। কিন্তু, লাখ টাকার ধন মাণিক তো ঘরে এসেছে। ঝ নিয়া আজই একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছে। একে তো কেউ ছিনিয়ে নেবে না। গোবর যদি ঘরে ফিরে আসে তবে ধনিয়া নূতন করে কুঁড়ে বেঁধেও সুখে থাকবে।
হরি প্রশ্ন করল, ছেলে কার মত হয়েছে?
ধনিয়া হাসিমুখে বললে, একেবারে গোবরের মতন। সত্যি বলছি।
বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে তো?
হাঁ। বেশ সুন্দর হয়েছে।

পঞ্চায়েতের সাজার কড়ি চুকাতেই হরির প্রায় সমস্ত ফসল হাতছাড়া হল। বৈশাখ কোন মতে গেল, কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাস পড়তে না পড়তেই ঘরে এক দানা খাবারও রইল না। বহু ঋণে জর্জরিত হরিকে ধারও কেউ দেয় না। এ অবস্থায় পুণিয়াই ওদের একমাত্র ভরসা হয়ে দাঁড়াল। যে সর্বনাশা গরু এনে ওদের ঘর জ্বলে গেল, ধনিয়া মাঝে মাঝেই তাকে গাল দেয়।
গোবর যেদিন থেকে নিরুদ্দেশ সেদিন থেকেই ধনিয়া পুণিয়া আবার কথাবার্তা শুরু করেছে। হরির কাছে পুণিয়া একটু কৃতজ্ঞও রয়েছে। এখন পুনিয়াও হীরাকে গাল দেয়। বলে, খুনে, গরু মেরে পালিয়েছে, এখন ফিরবে কোন মুখে। পুণিয়াই ওদের গম, যব, অড়হড় ডাল যোগাচ্ছিল। কিন্তু, যখন চতুর্মাস্য এসে গেল, তবু বৃষ্টি এলনা, তখন সমস্যা গুরুতর হয়ে উঠল। কুয়ার

জল শুকিয়ে কাঠ, নদীতে গেলে কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু, তাও দেরীতে গেলে পাওয়া ভার। এরপর নদীও জবাব দিল। চুরি ডাকাতি সুরু হল। সারা দেশে হাহাকার পড়ে গেল। শেষপর্যন্ত ভাদ্র মাসে বৃষ্টি এল, আর কৃষকদের মধ্যে আনন্দ-উচ্ছাসের ধূম পড়ে গেল। ধূ-ধূ শুকনো ক্ষেতে এখন হাল পড়ল। ছেলেরা সবাই মিলে, যেখানে যত পুকুর. গড়াই, গর্ত, ডোবা আছে, সব দেখে বেড়াতে লাগল। কিন্তু, এখন যতই বৃষ্টি আসুক, আখের কর্ম সারা। এক এক হাতের বেশি লম্বা হবে না। মকাই, জোয়ার আর কেদো ধান থেকে খাজনার কতটুকুই বা শোধ হবে, মহাজনের পেট তো আদ্ধেকও ভরবে না। তবে হ্যাঁ, এবার হাল চাষ করা যাবে, আর লোকে অন্ততঃ প্রাণে বাঁচবে।

এদিকে মাঘ মাস পার হলেও ভোলা যখন গরুর টাকা পেল না, তখন একদিন রাগের মাথায় হরির বাড়ি এসে খুব ঝগড়া করল। বললে, এই তোমার কথার দাম? বলেছিলে আখ উঠলে দাম দেবে। আখ তো উঠেছে, এবার আমার টাকা দাও।

হরির যখন কিছুই দেবার ক্ষমতা নেই, তখন তার বলদ দুটিকে নিয়েই ভোলা রওনা দিল। সে গ্রামের বাহির হতে না হতেই পেছন থেকে দাতাদীন, পটেশ্বরী, শোভা, এমন আরও দশ পঁচিশ জন লোক এসে জুটল। ভোলার রক্ত হিম হয়ে গেল, তবু সে কোমর বেঁধে দাঁড়াল।

হরি যেদিন আশী টাকার জন্য ঘর বাঁধা দেয়, সেদিন নোখেরামের ইচ্ছে ছিল বলদ দুটিও হরি বিকিয়ে দেয়। সেদিন দাতাদীন আর পটেশ্বরীই বাধা দিয়েছিল। বলেছিল, বলদই যদি দিয়ে দেয়, তবে চাষ করবে কি দিয়ে! ওরাই আজ ভোলার পথ রোধ করে দাঁড়াল। বললে, ভোলা, এ তো তুমি অনর্থ বাধালে। এহ'ল হরির সরলতার ফল। তোমার কাছে ওর ধার আছে, তা তুমি আদালতে নালিশ কর। তার জন্য এই বলদ খুলে নেবার কি অধিকার আছে তোমার! আমরা বলদ নিয়ে চললাম। তুমি কি ওকে নগদ টাকা দিয়েছিলে? এক অলক্ষুণে গাই ওর ঘাড়ে চাপিয়ে, এখন এই বলদ দুটি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে!

পাটোয়ারীর কোন কথার জবাব না দিয়ে ভোলা গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বলদের সম্মুখ থেকে নড়ল না। দাতাদীন এক-পা এগিয়ে এসে বেঁকে পড়া কোমর সোজা করে বললে, তোমরা সব দাঁড়িয়ে দেখছ কেন, মেরে তাড়িয়ে দাও, আমাদের গাঁ থেকে বলদ খুলে নিয়ে যাবে?

যুবক বংশী বেশ বলিষ্ঠ পুরুষ। ভোলাকে এক ধাক্কায় কাৎ করে দিলে। উঠতে যাবে আবার এক ঘুষি। এমন সময় দৌড়াতে দৌড়াতে সেখানে

হরি এসে উপস্থিত হল। ভোলা ওকেই সাক্ষী মেনে বললে, মাহাতো. তোমাকে ধর্ম সাক্ষী করে বলতে হবে, আমি কি জোর করে বলদ নিয়ে যাচ্ছি ? সঙ্কুচিত হয়ে হরি বললে, ও আমায় বলেছিল, হয় ঝুনিয়াকে ঘর থেকে বার করে দাও, নয়তো আমার টাকার বদলে গরু দাও। আমি বলেছি, আমার হাতে টাকাও নেই, আর ঘরের বৌও আমি বার করে দেব না। তোমার ধর্ম যদি বলে, বলদ দু'টি নিয়ে যাও। আমি ওর ধর্মের ওপর ছেড়ে দিলাম, আর ও গরু দুটো খুঁটি থেকে খুলে নিয়ে গেল।

পটেশ্বরী মুখ বাঁকিয়ে বললে, তুমি যখন ওর ধর্মবুদ্ধিরই ওপর ছেড়ে দিলে, তবে কেন এই জবরদস্তি। নিয়ে যাও ভাই ভোলা, বলদ তোমারই।

সকলে তিরস্কারের চোখে হরির দিকে চাইল। আর ভোলা সগর্বে বলদ দুটিকে নিয়ে রওনা দিল।

রায়সাহেবের কাছে যখন খবর পৌঁছাল যে মহালে একটা কাণ্ড ঘটে গেছে, আর হরির কাছ থেকে গ্রামের পঞ্চায়েত জরিমানা আদায় করে নিয়েছে, অথচ তাকে এর এত্তেলা দেয় নাই, তখনই তিনি নোখেরামকে ডেকে খুব ধমকালেন! নোখেরাম আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললে, সে তো এ ব্যাপারে একা ছিল না। রায়সাহেব তার ভুঁড়ির দিকে বর্ষার মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে বললেন, বাজে বোকো না। তোমার সে সময় বলা উচিত ছিল, 'যতক্ষণ সরকারের এত্তেলা না হয়, পঞ্চায়েতের জরিমানা আমি দিতে দেব না। আমার আর আমার প্রজাদের মধ্যে কথা বলার অধিকার পঞ্চায়েতের আছে কি? তাহলে আমার আমদানীর পথটা কি থাকে? বছরে এই যে লাখ টাকা খরচ হয়, তা আসে কোত্থেকে? দুই পুরুষ ধরে মাতব্বরি করেও এই কথাটা তোমাকে আজ শেখাতে হয়? হরির কাছ থেকে কত টাকা পেলে?

নোখেরাম আমতা আমতা করে বললে, আশী টাকা!

নগদ?

নগদ ও কোথায় পাবে হুজুর? কিছু ধান দিল, আর বাড়ীখানা লিখে দিল। আচ্ছা, তাহলে নিজে আর বকধার্মিক পঞ্চায়েতে মিলে আমার এক মাতব্বর প্রজাকে উৎখাত করে দিলে? তোমরা ভেবেছ যে তোমরাই বাদশা? আমি বলে দিচ্ছি, আজ সন্ধ্যের মধ্যে টাকাটা আমার কাছে পৌঁছান চাই। নইলে আমি এক একজনকে যাঁতা পিষিয়ে ছাড়ব। যাও, আর হ্যাঁ, হরিকে আর তার ছেলেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

পঞ্চায়েত যখন এই মীমাংসার কথা শুনল, তখন তাদের নেশা ছুটে গেল। ধান যেমন কে তেমন পড়ে আছে। কিন্তু, টাকা তো কবে উড়ে গেছে।

হরির বাড়ী রেহান লেখা হয়েছিল। কিন্তু সে বাড়ী পোছে কে। হিন্দু স্ত্রী যেমন স্বামীর সঙ্গে ঘরের মালিক হয়, কিন্তু পতি ছেড়ে দিলে সে মালিকানা আর থাকেনা, তেমনি এই হরির কাছে ওর ঘরের দাম লাখ টাকা, অথচ তার আসল দাম কিছুই নয়। এদিকে রায় সাহেবও টাকা না নিয়ে মানবেন না। সেবারেও হরির গরুর মামলায় কিছু দণ্ড গেল, এখন আবার এই বিপদ। চারজনে অনেক আলোচনা, অনেক দোষারোপ, অনেক ঝগড়া হল। শেষে একটা পথ পাওয়া গেল। পটেশ্বরী কখনো কখনো কাছারিতে দৈনিক "বিজলী" দেখতে পেত। যদি এক গুপ্ত নামে সম্পাদকের কাছে পত্র দেওয়া যায় যে রায়সাহেব প্রজাদের কাছে কেমন করে জরিমানা আদায় করেন তাহলে বাছাকে নেওয়ার পরিবর্তে দিতে হবে। নোখেরামেরও তাই মত। অবশেষে দুজনে মিলে এক বেনামী পত্র রেজিস্ট্রি ডাক যোগে পাঠিয়ে দিল। "বিজলী"র সম্পাদক ওঙ্কারনাথ যশস্বী ব্যক্তি। দেশচিন্তা তাঁকে একেবারে জল করে দিয়েছিল। রায়সাহেব তাঁর বিলক্ষণ বন্ধু। কিন্তু এই ধরণের পত্রের সন্ধানেই তিনি থাকতেন। চিঠি পেয়েই তাড়াতাড়ি তিনি রায়সাহেবকে জানালেন। ওঙ্কারনাথের পত্র পেয়ে রায়সাহেব শিরে করাঘাত করলেন। প্রথমটায় মনে হল, তাকে গুণে গুণে পঞ্চাশটা হাণ্টারের ঘা দিয়ে বলে আসেন, "বিজলী"তে সংবাদদাতার পত্র ছাপার পাশে যেন এই সংবাদটাও ছাপা হয়। তবে তার পরিণামের কথা ভেবে মনকে শান্ত করলেন। তাড়াতাড়ি সম্পাদকের কাছে চলে গেলেন, কারণ, যদি সংবাদটা ছেপে দেয়, তো তাঁর যশে কালিমা পড়ে যাবে।

ওঙ্কারনাথ তখন তাঁর ভ্রমণ থেকে ফিরে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বিষয়ে চিন্তা করছিলেন। পক্ষীর মত তাঁর মনটা উড় উড় করছিল। তাঁর ধর্ম-পত্নী রাত্রে তাকে এমন অনেককিছু বলেছে যা এখনো কাঁটার মত বিঁধছে। কেউ তাঁকে দরিদ্র বলে, হতভাগা বলে, বেকুফ বলে দুঃখ নাই, তাঁর "পুরুষত্ব নাই" এ কথা তিনি সহ্য করেন কেমন করে? তিনি নিজে যে এত সাবধানে চলেন, বিপদ বাঁচিয়ে পত্র লেখেন, সে তো ঘরের লোকের কথা ভেবেই। সে লোকই যদি সামান্য বেনারসী শাড়ীওয়ালীদের দেখে বিচলিত হয় তবে কেমন করে চলে! ওর তো বোঝা উচিত যে ও এক দেশভক্তের পত্নী।

হঠাৎ মোটর কারের আওয়াজ শোনা গেল। তাড়াতাড়ি তিনি কাগজ নিয়ে নিজের লেখাটা আরম্ভ করে দিলেন। তিনি রায়সাহেবকে না করলেন অভ্যর্থনা, না করলেন কুশল প্রশ্ন, না দিলেন চেয়ার। এমন ভাবে তাকালেন যেন কোন বাদী আদালতে এসে হাজির হয়েছে। কিছু কর্তৃত্ব মেশান সুরে প্রশ্ন করলেন, আমার চিঠি পেয়েছিলেন তো? আমি নিজেই এটা যাচাই

করতে পারতাম। কিন্তু, ভদ্রতার খাতিরে মতকে কিছু না কিছু হত্যা করতেই হয়।···ঘটনায় কিছু সত্য আছে কি ?

রায়সাহেব সত্যতা অস্বীকার করতে পারলেন না। এ পর্যন্ত তিনি অবশ্য জরিমানার টাকা পাননি। পেলে সোজাসুজি অস্বীকার করতে পারতেন। তবে, আজ তিনি দেখতে চাইছিলেন, এ লোকটির কতটা দৌড়।

ওঙ্কারনাথ যখন দুঃখের সাথে কর্তব্যপালনের উল্লেখ করে বললেন যে সংবাদ-পত্রে বিষয়টি প্রকাশ করা ভিন্ন তাঁর আর কোন গত্যন্তর নাই, তখন রায়সাহেব চেয়ারে বসে পানের খিলি মুখে দিয়ে বললেন, আপনার কিন্তু সত্যি এতে ভাল হবে না। আপনি যদি বন্ধুদের গ্রাহ্য না করেন, তবে আমিও আপনাকে গ্রাহ্য না করতে পারি।

শহীদের ভাব দেখিয়ে ওঙ্কারনাথ বললেন, ও ভয় আমাকে দেখিয়ে লাভ নেই। যেদিন থেকে সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছি, সেদিন থেকে সত্য ও ন্যায় কথার জন্য আমি অঙ্গীকারবদ্ধ।

উত্তম কথা। কিন্তু আমিও তো আপনাকে টাকা দিই। কেন? না, যাতে ওই পত্রিকা আমার গোলাম হয়ে থাকে। আপনি আমায় ধনী বানান নি, ভগবান বানিয়েছেন। দেওয়ালী, হোলী, দশহরাতে আপনাকে উপহার পাঠাই, আর বছরে পঁচিশ বার পার্টিতে নেমন্তন্ন করি—কেন? ঘুষ নেওয়া আর কর্তব্য করা, দুই-ই আপনি এক সাথে চালাতে পারেন না।

ওঙ্কারনাথ উত্তেজিত হয়ে বললেন, আমি কখনো ঘুষ নিই না।

এ যদি ঘুষ না হয় তো কী? বের করুন আপনার খাতা। আমার বিশ্বাস আমার জমিদারী থেকে আপনি এ পর্যন্ত হাজার হাজার টাকা নিয়েছেন। আপনি যদি স্বদেশী স্বদেশী চিৎকার করতে করতে বিদেশী ওষুধ আর জিনিষ-পত্রের বিজ্ঞাপন ছাপতে পারেন, তবে আমি কেন নিজের প্রজাদের কাছ থেকে দণ্ড, ক্ষতিপূরণ আর জরিমানা নিতে লজ্জা পাব? আমার খরচ কোথা থেকে চলবে? বড় অফিসার আর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নেমন্তন্ন আর প্রয়োজন মেটাবো কোথা থেকে? টাকাটা কি আমার গাছে ধরে? গরীবের গলা টেপা কোন আনন্দের কাজ না। কিন্তু আপনি যেমন আমার জমিদারীর লাভ ভোগ করতে চান, তেমনি আর সকলে মনে করে আমি বুঝি সোনার মুরগী। আজ যদি হাকিমকে ডালি না দিই তো মনে করবে আমি বিদ্রোহী। আপনি বলবেন এই আড়ম্বর বজায় রাখি কেন? দেখুন, সাতপুরুষ যে আব-হাওয়ায় গড়ে উঠেছি, এখন ঘাস কাটা আমার কম্ম নয়। আপনার জমি নেই, জায়গীর নেই, আপনি নির্ভীক হতে পারেন। তবু আপনিও মশাই চুপ হয়ে থাকেন। আপনি খবর রাখেন কি আদালতে কত ঘুষ চলে? কত

গরীব খুন হচ্ছে, কত মেয়ে ভ্রষ্টা হচ্ছে ? লিখবার সামর্থ্য আছে কি ? লেখার জিনিষ আমি আপনাকে প্রমাণ শুদ্ধ দেবো।

ওঙ্কারনাথ নরম হয়ে বললেন, যদি প্রয়োজন হয় আমি পিছ পা হব না।

রায়সাহেব ও কিছু নরম হয়ে বললেন, হ্যাঁ, আমি স্বীকার করি দু'এক ক্ষেত্রে আপনি সাহস দেখিয়েছেন ; কিন্তু আপনার দৃষ্টি রয়েছে সর্বদা আপনার নিজের লাভের দিকে, প্রজার হিতের দিকে নয়। রাগ করবেন না, কিন্তু আপনি যখনই আসরে নেমেছেন, তখনই আপনার সম্মান, আয় সবই বেড়েছে। আমার ওপরও যদি এই চাল চেলে থাকেন, তবে আমি আপনার খাতির করতে প্রস্তুত। টাকা দেবনা কারণ, সেটা হবে ঘুষ। আমি আপনার স্ত্রীর গহনা গড়িয়ে দেব। এখন আমি আপনাকে সত্য করে বলি, আপনি যে সংবাদ পেয়েছেন সেটি ভুল। কিন্তু এটাও ঠিক, অন্যদের মতই আমিও প্রজাদের কাছ থেকে জরিমানা নিয়ে থাকি। আপনি যদি আমার মুখের এই গ্রাস কেড়ে নিতে চান, তবে আপনি নিজেও জেরবার হবেন, তাতে লাভ কি ? জানি, আপনার অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ। এখন, আপনি যদি হরিশ্চন্দ্র হবেন বলে দিব্যি কেটে থাকেন, তো সে আপনার খুশি ! চললাম।

রায়সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ওঙ্কারনাথ তার হাত ধরে সন্ধির সুরে বললেন, না, না, আপনাকে বসতে হবে। আমার পোজিশানটা একটু পরিষ্কার করতে দিন। আমি আপনার ব্যবহারের জন্য ঋণী। কিন্তু, এখানে মতবাদের কথা এসে গেছে। আর মতবাদ, আপনি জানেন, মানুষের প্রাণাধিক প্রিয়।

রায়সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে মিষ্টি হেসে বললেন, আচ্ছা ভাই, যা ইচ্ছে লিখুন। কি আর করব, বদনাম হবে। এমন কে তালুকদার আছে যে অল্প বিস্তর প্রজাদের ওপর অত্যাচার করে না। কুকুর যদি মাংস রক্ষাই করবে, তো খাবে কি ? তবে হ্যাঁ, আমি আপনাকে কথা দিতে পারি, ভবিষ্যতে যেন আপনি আর এরকম সুযোগ না পান। আমার ওপর বিশ্বাস থাকে তো এবারের মত মাপ করে দিন। নেহাৎই আপনি আমার বন্ধু। অন্য কোন সম্পাদক হলে তাকে সমস্ত বাজারের মধ্যে মার খাওয়াতাম। এটা হল সংবাদপত্রের যুগ। সরকার পর্যন্ত তাদের ভয় করে, আমি তো কোন ছার ! আপনি যা ইচ্ছে করুন, এই ঝগড়া তো শেষ করে দিন। বলুন, আজকাল কাগজের অবস্থা কি ? কিছু গ্রাহক বাড়ল ?

ওঙ্কারনাথ অনিচ্ছার ভাবে বললেন, কোন মতে কাজ চলে যাচ্ছে। বর্তমান অবস্থায় এর চেয়ে বেশি আশা রাখি না। আদর্শের জন্য পত্রিকা সুরু করেছিলাম। তাকে ছোট করতে চাই না। সিনেমা স্টারদের ছবি ও জীবনী

যদি ছাপি, অন্য নানা ফন্দিফিকির করি তো গ্রাহক সংখ্যা বাড়তে পারে; কিন্তু, এগুলি আমি গর্হিত মনে করি।

রায়সাহেব সহৃদয়তার সঙ্গে বললেন, এর জন্যই তো আপনার এত সম্মান। কিন্তু ভাইসাহেব, সেবা করতে গেলে তো বাঁচাও দরকার। আমি এক প্রস্তাব করতে চাই। আপনি আমার হয়ে এক শ' লোকের কাছে ফ্রী পত্রিকা পাঠিয়ে দিন. আমি চাঁদা দেব।

ওঙ্কারনাথের কাছে এটা ছিল আশার অতীত। তিনি কৃতজ্ঞতায় মাথা নুইয়ে ধন্যবাদের সঙ্গে দান গ্রহণ করলেন। আরো দু'এক কথার পর রায়সাহেব বিদায় হলেন। ওঙ্কারনাথের মুখে প্রসন্নতার দীপ্তি এল না। এই দানে কোন শর্ত নাই, বন্ধন নাই, ঠিকই কিন্তু, ওঙ্কারনাথ এও জানেন, প্রেসের যা অবস্থা, তাতে অসহায় অবস্থায়ই এত মার খেয়েও তাকে এই দান গ্রহণ করতে হয়েছে। প্রেস কর্মচারীদের তিন মাসের মাইনে বাকী। কাগজের হাজার টাকা বাকী। এই বা কম কি যে তাকে হাত পাততে হল না।

এ বছর মিঃ খান্না এদিকে এক চিনির কল খুলেছেন। মিঃ খান্না দশ বছর আগে ছিলেন একজন সামান্য ব্যাঙ্কের কেরানী। আর আজ শুধু অধ্যবসায় আর নিজের প্রতিভাবলে ব্যাঙ্কের একজন ম্যানেজার ও চিনি কলের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। তাঁর পেয়াদা ও দালাল গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষকদের আখ দর করে কিনে নিত। কৃষকরা দর দস্তুর করে বুঝল গুড় তৈরী করলে কিছুই বাঁচে না। ঘরে বসে যদি আখের ঐ একই দাম মেলে তো মাড়াইয়ের মেহনৎ করা কেন। তাছাড়া মেহনৎ ও খরচা করে গুড় তৈরী করেই বা লাভ কি। একই দামে যখন মিলের চিনি পাওয়া যাবে, তখন গুড় নেবে কে? ক্ষেতের আখ বেচার জন্য তাই সমস্ত গ্রাম তৈরী হল। দাম কিছু কম হলেও ক্ষতি নেই, টাকা পাওয়া যাবে হাতে হাতে। হরির সবচেয়ে আগে প্রয়োজন দু'টি বলদের। অথচ মুশকিল এই যে টাকা হাতে এলেই মহাজনেরা টের পাবে। দাতাদীন, দুলারী, ঝিংগুরী সিংহ সকলেই তো প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলেছে। হরি ও শোভা মিলে যুক্তি করল যে আপাততঃ টাকা ওরা খান্নার কল থেকে নেবে না। পরে মহাজনের চোখ ফাঁকি দিয়ে ধীরে ধীরে টাকাটা নেওয়া যাবে। আর বলদ একবার কেনা হয়ে গেলে আর পায় কে!

একদিন সকালবেলা গ্রামের কয়েকজন আখ কাটতে লেগে গেল। হরিও নিজের ক্ষেতে কাটারি নিয়ে পৌঁছে গেল। পুনিয়া, ঝুনিয়া, ধনিয়া, সোনা, সকলেই ক্ষেতে এসে গেল। কেউ আখ কাটে, কেউ বা ছাল উঠায়, কেউ আঁটি বাঁধে। মহাজনের লোকেরাও আখ কাটতে দেখা মাত্র জ্ঞান শূন্য হয়ে

দৌড়াল। 'আগে আখ বিক্রী করি, তারপর তো তোমরাই টাকা পাবে',— বলে সবাইকে ফেরানো হল। দাতাদীনের ব্যাপার অবশ্য আলাদা। হরি এবারে তার নিজের জমিতেই দাতাদীনের সঙ্গে ভাগে চাষ করেছিল। গরু নেই বলে জমি পতিত ছিল, তাই দাতাদীন দয়া পরবশ হয়ে এগিয়ে এসেছিল সাহায্যের জন্য। দাতাদীন বীজ দিয়েছিল এই শর্তে যে ফসলের অর্ধেক পাবে সেই। অতএব, এ নিয়ে কোন ছলচাতুরী করা নীতি বিরুদ্ধ। জমির অর্ধেক ফসলই হরি গাড়িতে বোঝাই করে দিল। ঝিংগুরী সিংহ মিঃ খান্নার মিলের ম্যানেজারের সঙ্গে ব্যবস্থা করেই রেখেছিল। তারই পেয়াদা গাড়িতে আখ বোঝাই করে নৌকা পর্যন্ত পৌছে দিচ্ছিল। গাঁ থেকে নদী আধ মাইল। সারা দিনে এক গাড়ী সাত-আট খেপ দিত। আর নৌকা এক খেপে পঞ্চাশ গাড়ীর বোঝা নিত। এইভাবে ব্যবস্থা করে ঝিংগুরী সিংহ সমস্ত এলাকাটা নিজের হাতের মধ্যে রেখেছিল। ওজন শুরু হতেই ঝিংগুরী সিংহ মিলের ফটকে এসে উপস্থিত। আখ বেচে হরির একশত কুড়ি টাকা পাওনা হল। তার থেকে নিজের পুরো টাকাটা সুদ সমেত কেটে ঝিংগুরী গোটা পঁচিশেক টাকা হরির সামনে ধরল। হরি টাকার দিকে উদাসীন ভাবে দেখে বললে, এ নিয়ে আমি কি করব, ঠাকুর; ওটা তুমি নিয়ে নাও। আমার মজুরী অনেক জুটবে।

ঝিংগুরী মাটিতে পঁচিশ টাকা ছুড়ে ফেলে বললে, নাও কি ফেলে দাও, সে তোমার খুশী। তোমার জন্যই মালিকের কাছে ধমক খেলাম, আর এখনো রায়সাহেব মাথার উপর দাঁড়িয়ে, তোমার দণ্ডের টাকাটা আদায় করবেন। তুমি গরীব বলে দয়া করে টাকাটা দিচ্ছি। নইলে এক আধলাও দিতুম না। এখন যদি রায়সাহেব জেবা করেন তো উল্টে আমার ঘর থেকে টাকা যাবে।

ধীরে ধীরে টাকাটা হরি উঠিয়ে নিল। বাইরে আসতেই নোখেরাম খাজনার জন্য রুখে দাঁড়াল। হরি গিয়ে তার হাতে পঁচিশটি টাকা রেখে কিছু না বলে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এল।

হরি ঘরে আসতেই রূপা জল নিয়ে এল, সোনা এল ছিলিম নিয়ে, ধনিয়া নুন মুড়ি এনে দিল, সকলে আশা ভরা চাহনিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। ঝুনিয়াও চৌকাঠের ওপর এসে দাঁড়াল। হরি উদাস হয়ে বসেছিল। কি করে মুখ হাত ধোয়, কি করে মুড়ি খায়? এত লজ্জা, এত গ্লানি, যেন খুন করে এসেছে।

ধনিয়া জিজ্ঞাসা করলে, কত টাকার ওজন হল?

একশ কুড়ি পেয়েছিলাম, ওখানেই লুঠ হয়ে গেছে।

সব শুনে ধনিয়ার মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেল। বলল, তোমার

মত বোকা লোক ভগবান কেন গড়েছেন, কোথাও দেখা হলে জিজ্ঞাসা করতাম। হাতে ধরে সমস্ত টাকা বোনাইদের দিয়ে এলে! এখন গরু আসবে কোথা থেকে? হালে কি আমাকে জুড়বে? না, নিজেকে জুড়বে? পৌষের শীত। কারো গায়ে একটু ন্যাকড়া নেই। কতদিন আর পোয়ালে ঢুকে কাটাবে? আর পোয়ালে ঢুকেও পোয়াল খেয়ে তো কাটান যায় না। তোমার ইচ্ছা থাকে ঘাস খাও, আমাকে দিয়ে বাপু ঘাস খাওয়া হবে না।

বলতে বলতে সে একটু হেসে ফেলল। এতক্ষণে রাগের ধাক্কাটা কেটে গিয়ে ধনিয়ার কাছে হরির অসহায়তাটা পরিষ্কার হয়ে আসছিল। হরি মাথা নিচু করে ছিল। ধনিয়ার মুচকি হাসি দেখে নাই। বললে, মজুরী তো মিলবে। মজুরী করে খাব।

ধনিয়া বললে, এ গাঁয়ে মজুরী কোথায়। আর মোড়ল হয়ে কোন মুখে মজুরী করবে?

হরি ছিলিমে কয়েকবার টান দিয়ে বললে, মজুরীতে কোন পাপ নেই। মজুরের অবস্থা ভাল হলেই কিষাণ, আর কিষাণের অবস্থা খারাপ হলেই মজুর। মজুরী করা অদৃষ্টে না থাকলে এসব বিপদ আসে?

ধনিয়া পুত্রবধূ ও মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললে, তোমরা সকলে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাবা হাট বাজার থেকে আসে, আসবার সময় ছেলে পিলের জন্য দু'চার পয়সার কোন জিনিস নিয়ে আসে, তারা হল অন্য ধরণের লোক। চার পয়সার কোন জিনিস নিয়ে এসেও তো ছেলে পুলেদের হাতে দিতে পারতে। ঝিংগুরীকে বলতে যে আমায় একটা টাকা দিয়ে দাও, নইলে এক পয়সা ও দেব না। এসে আদালতে নিয়ে যেও। তাহলে ও নিশ্চয় দিত।

হরি লজ্জা পেল। ও যদি পঁচিশ টাকা চট করে নোখেরামকে না দিত, তাহ'লে এই বিপত্তিটা হত না। এখন তো যা হবার হয়ে গিয়েছে।

ঝুনিয়া গিয়ে সোনাকে বলল, আমার তো বাবাকে দেখে ভারী দুঃখ হয়। বেচারা সারাদিন খেটেখুটে এল, মা রাগ করতে লাগল। মহাজন টুঁটি টিপে ধরলে কি করবে?

সোনা বলে, বলদ আসবে কি করে তবে?

মহাজন চায় টাকা। তোমাদের দুঃখের বৃত্তান্তে ওর কি যায় আসে?

মা ওখানে থাকলে মজা দেখিয়ে দিত। মহাজন পালিয়ে বাঁচত।

ঝুনিয়া ঠাট্টা করে বলল,—তা এখানে টাকার অভাব কি? তুমি মহাজনদের সঙ্গে একটু হেসে কথা বল, দেখ সব টাকা ছেড়ে দেয় কিনা। সত্যি বলছি, বাবার সব দুঃখ দূর হয়ে যায়।

সোনা দুহাতে তার মুখ চেপে বললে, ব্যস চুপ কর নইলে সব বলে দেব।

হরিরা আজকাল নিজের জমিতেই দাতাদীনের মজুরী খাটছিল : সে উপলক্ষে ওদের আঙ্গিনায় দাতাহীন ও তাব পুত্র মাতাদীন প্রত্যহই আসে। মাতাদীন ওদের মজুর খাটায়। মাতাদীনের একটি চামারণী রক্ষিতা ছিল। ঝুনিয়া তার চেয়ে ঢের সুন্দরী। মাঝে মধ্যে ও ঝুনিয়ার ছেলেটাকে আদর করত, ঝুনিয়ার হাত চেপে ধরত তবে হাত ছাড়িয়ে নেবার কৌশল শহরফেরৎ ঝুনিয়া ভালই জানে। ও সোনাকে বললে, কি বলে দিদি মাকে? বলবার মত কথা হোক। যখন কোন অছিলায় ঘরে এসে যায়, আমি কি বলব—বেরিয়ে যাও? আমার কাছ থেকে ও কিছু নিতে তো পারে না, নিজেই দিয়ে যায়। আমি এত বোকা নই যে ফাঁদে পড়ব। তবে হ্যা, তোমার দাদা যদি অন্য কাউকে বেখে দেয় তো ভিন্ন কথা। এখনো তো আমাব বিশ্বাস ও আমারই আছে। হেসে কথা বলা আলাদা জিনিষ, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা আমি করব না। যে এক হতে দু'জনের হয়, সে কারুবই থাকে না।

শোভা এসেছিল হরির কাছে। তার সঙ্গে কথায় কথায় সন্ধ্যা হতেই শঙ্খধ্বনি কানে এল। গাঁয়ের মাথার ধ্যানসিংহ নামে এক ঠাকুর ছিল। তারই ওখানে আরতি হচ্ছে। শোভা বললে, চল প্রসাদ নিয়ে আসি।

হরি চিন্তিতভাবে বললে, তুমি যাও আমি আসছি।

ধ্যানসিংহের সঙ্গে মাঝে মধ্যে দেখা হতেই সে হরির কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। তার বাড়ীতে আবতিতে গিয়ে কিছু না দেওয়াটা অপমানের ব্যাপার। হয়তো আরতির থালা তারই হাতে। তার সামনে হরি কিভাবে খালি হাতে প্রসাদ নেবে। তার চেয়ে কথকতায় না যাওয়াই ভাল। সে গিয়ে খাটিয়ার উপর শুয়ে পড়ল।

কিন্তু তার প্রাণটা উস্‌খুস করতে লাগল। হাতে একটা তামার পয়সাও নেই। আরতির পুণ্য ও মাহাত্ম্যের কথা একেবারেই ওর মনে ছিল না। কথকতাটা যেন শুধু সামাজিক ব্যাপাব। ওর মনে ছিল মানসম্ভ্রমের ভয়। হঠাৎ সে উঠে বসল। মানসম্ভ্রমের গোলামীব জন্য পুণ্য সে ছাড়বে কেন? লোকে হাসুক, কিন্তু ভগবান তো তাকে কুকর্ম থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। সে আর কিছু চায় না।

ঠাকুরজীর বাড়ীর দিকে সে চলতে আরম্ভ করল।

॥ ছয় ॥

মিঃ খান্না এবং তার স্ত্রী গোবিন্দীর বনিবনা ছিল না। কেন যে ছিল না, তা বলা কঠিন। বাপ মা তো বিয়ের সময় গ্রহ নক্ষত্র খুব মিলিয়েই দিয়েছিলেন। কামশাস্ত্রের মতে হয়তো এর কোন কারণ থাকতে পারে, অথবা মনোবিজ্ঞানেও কিছু হদিশ মিলতে পারে। আমি শুধু এই জানি যে এদের বনিবনা হল না। মিঃ খান্না ধনী, সুরসিক, রূপবান, পণ্ডিত; এবং শহরের পাঁচজনের একজন। গোবিন্দী দেখতে অপ্সরা না হলেও সুন্দরী, গায়ের রং পাকা ধানের মত, চোখ দুটি লজ্জানম্র, লোকের সামনে একবার চোখ উঁচু করেই আবার নামিয়ে নেয়। গাল দুটি লাল না হলেও মসৃণ, অঙ্গের গড়নটি সুডৌল, বাহু দুটি গোল, পুষ্ট। মুখের ভাবে একটু গর্বমিশ্রিত বিরক্তির আভাস, মনে হয় যেন সংসারের কার্যকলাপে তার বিতৃষ্ণা এসেছে। খান্নার গৃহে বিলাসের উপকরণের অভাব নেই, কিন্তু গোবিন্দীর চোখে এসবের যেন কোন মূল্য নেই। এই লবণ সমুদ্রে ও থাকে পিপাসী। ও নিজেকে পুরুষের খেলনা বা ভোগের বস্তু বলে মনে করেনা। কাজেই আকর্ষণ করার চেষ্টা ওর নেই। যদি ওর আসল সৌন্দর্য দেখার চোখ পুরুষের না থাকে, পুরুষ যদি সুন্দরী মেয়ের পিছু পিছু ঘুরে বেড়ায় তবে তা পুরুষেরই দুর্ভাগ্য। বালিকা বয়সে ওকে কবিতা লেখার রোগে ধরেছিল। ও লিখত, দুঃখ আর বেদনাই জীবনের তত্ত্ব; সম্পত্তি, বিলাস আর ঐশ্বর্য তো জীবনকে দগ্ধ করে। গোবিন্দী আজও মাঝে মাঝে কবিতা লেখে, কিন্তু কবিতা শোনাবার লোক কই। ঐশ্বর্য, নারী ও সুরায় আসক্ত খান্নার কাছে গোবিন্দী কখনো ভালবাসা পায়নি। খান্না নিজের মক্কেলদের কাছে যেমনই নম্র আর সৌজন্য-পরায়ণ, ঘরে ঠিক তেমনি কটুভাষী আর দুর্দান্ত। তথাপি গোবিন্দীর জীবনে স্বামীই সর্বস্ব।

আজ না জানি কার মুখ দেখে খান্না ঘুম থেকে উঠেছিল। ভোরবেলা কাগজ খুলেই দেখে ওর কতকগুলি শেয়ারের দাম পড়ে গেছে। ওদিকে চিনিকলে শ্রমিকরা হরতাল সুরু করেছে, রূপোর দরও নেমে গেছে। রায় সাহেবের সঙ্গে যে ব্যবসায়ে একটু লাভের আশা ছিল তারও ক'দিন যাবৎ টলমল অবস্থা। রাত্রিবেলা পানেরও কিছু আধিক্য হয়েছিল, তার ওপর ড্রাইভার বলে গেছে ইঞ্জিন খারাপ। এই সব দুর্ভাগ্যের কথাই ভাবছিলেন মিঃ খান্না। এমন

সময় গোবিন্দী এসে বললে, ভীষ্মের জ্বর তো আজও সারল না, ডাক্তার ডাকতে পাঠাও।

ভীষ্ম এদের কনিষ্ঠ পুত্র। সর্বদাই ভোগে। দশমাস বয়সে দেখায় যেন পাঁচ মাসের। খান্না ধরেই নিয়েছিলেন এ ছেলে আর বাঁচবে না। তাই তার সম্বন্ধে তিনি উদাসীন। আর সেই একই কারণে গোবিন্দীর এ ছেলের ওপর মায়া সবচেয়ে বেশী। খান্না স্নেহের ভাব দেখিয়ে গোবিন্দীকে বোঝাতে চাইলেন যে বেশী ওষুধ খাওয়া ভাল নয়। কিন্তু গোবিন্দী এসব যুক্তি মানতে নারাজ। অগত্যা ডাক্তার আনাই স্থির হল। কিন্তু কোন ডাক্তার? গোবিন্দী ডাঃ নাগকে ডাকাতে চায়। কিন্তু তার ফী বেশী, এবং মিঃ খান্নার অপছন্দ। তারচেয়ে মিস মালতীকে ডাকা যাক না কেন? তার ফী কম, তাছাড়া সে লেডী ডাক্তার, ছোট ছেলেদের ব্যাপার বুঝবে ভাল।

মিস মালতী নামেই গোবিন্দী জ্বলে উঠে বললে, ও আবার ডাক্তার নাকি?

খান্নাও রাগত চোখে চেয়ে বললেন, তবে ও কি ইংলণ্ড গিয়েছিল কেবল ঘাস খেতে? আর এই যে হাজার লোকের প্রাণ বাঁচাচ্ছে সেটা কি?

তা হবে। তবে ওর উপর আমার ভরসা নেই। ও কেবল পুরুষের মন কাড়তে পারে। আর কোন ওষুধ ওর জানা নেই।

ব্যস, শুরু হয়ে গেল খান্নার তর্জন গর্জন। গোবিন্দীর চোখে বান ডাকল। শেষ পর্যন্ত, সমস্ত কাগজপত্র মাটিতে ফেলে দিয়ে খান্না বললেন, তোমার মন অত্যন্ত নীচ। তোমার সঙ্গে থেকে জীবনটাই আমার মাটি হয়ে গেল।

গোবিন্দী বললে, তবে মালতীকে বিয়ে কর না কেন?

খান্না খোঁচা দিয়ে বললেন, গোবিন্দী যদি চায় তো আজই তিনি মালতীকে বিয়ে করতে পারেন। আজই, এখনই ·

কিন্তু গোবিন্দী বিদ্রূপ করে বললে, তুমি সাত জন্ম নাক ঘষলেও ও তোমাকে বিয়ে করবে না। তুমি ওর টাট্টু হয়েছ। ও তোমাকে ঘাস খাওয়াবে। কখনো তোমার মুখে হাত বোলাবে, কখনো লেজে। সবই করবে তোমার ওপর চড়বে বলে। তোমার মত হাজারটা বোকা ওর আঁচলে আছে।

গোবিন্দী আজ বড়ই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে। মনে হয় যেন ছেলের অসুখ অছিলা মাত্র। আজ যেন স্বামীর সঙ্গে লড়াই করবার জন্যই ও প্রস্তুত। নিজের পৌরুষের ওপর এমন কটাক্ষ খান্না সহ্য করেন কি করে? তিনি বললেন, তোমার মতে আমি এতই বোকা! আর, এই আমার দরজায়ই হাজার লোক নাক রগড়ায়। এমন কটা রাজা জমিদার আছে যে আমার কাছে মাথা নোয়ায় না?

ওই তো মালতীর বৈশিষ্ট্য। সব সময় ও চলে উল্টো পথে। তুমি ওকে

যতই খারাপ বল, তুমি ওর পায়ের ধুলোও নও।
আমার চোখে ও বেশ্যাদেরও ছাড়িয়ে গেছে। কারণ ও পর্দার আড়াল থেকে শিকার খেলিয়ে বেড়ায়।
দু'জনেই নিজের নিজের ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করল। খান্না গোবিন্দীকে যতই কিছু বলুক ক্ষতি ছিল না। কিন্তু ঘৃণিত মালতীর সঙ্গে এই তুলনা ওর অসহ্য। গোবিন্দীও আর যাই বলুক, খান্না এতটা গরম হত না, কিন্তু মালতীর এই অপমান ওঁর সহ্য হল না। দুজনেই দুজনের দুর্বলতার ঠিক জায়গায় ঘা দিয়েছে। তাই দুজনেই জ্বলে উঠল। খান্না সংযম হারিয়ে গোবিন্দীর দুই কান ধরে জোরে টানার সঙ্গে সঙ্গে দুই চারিটি চড়ও বসিয়ে দিলেন। গোবিন্দী কাঁদতে কাঁদতে ঘরের ভিতরে চলে গেল। মার ও আগেও খেয়েছে, কিন্তু গোবিন্দীর কাছে আজ যা বেশী অসহ্য মনে হল, তা হল এই যে, ওই শাসন তো ওর স্বামীর নয়, এ যে পরোক্ষে মালতীরই। ও স্থির করল যে এ অত্যাচার ও কিছুতেই মাথা পেতে নেবে না। কিন্তু ছেলেটার যতদিন জ্বর না সাবে, ততদিন ওকে এখানেই থাকতেই হবে। তারপরই গোবিন্দী নিজের পথ দেখবে।

মিস্ মালতী ছিল বাইরে প্রজাপতি, অন্তরে মধুমক্ষিকা। ওর জীবনে সবটাই যে হাসি খেলা তা নয়। আর ওর হাসি ঠাট্টার পিছনেও সম্ভবতঃ একটা গূঢ় কারণ ছিল, যা লোকের নজর এড়িয়ে যেত। ইদানীং এই মালতীর সঙ্গে যে ব্যক্তির ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গিয়েছিল, সে হল মিঃ মেহতা। মেহতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। "বিজলী"র সম্পাদক ওঙ্কারনাথের মতও সেও রায় সাহেবের বন্ধু। কিন্তু চরিত্রে একেবারেই আলাদা। মিঃ মেহতা আধুনিক মতবাদ বা প্রগতিবাদের একেবারেই সমর্থক নয়, আর কখনো তা গোপনও করে না। যারা কম্যুনিস্টদের মত কথা বলে, আর বিলাসব্যসনে জীবন কাটায়, তাদের প্রতি তার একটুও সহানুভূতি নেই। রায়সাহেবের এক আসরে তার সঙ্গে মিস মালতীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেই যেবার জৈষ্ঠ্যে দশহরার উৎসবে ধনুর্যজ্ঞে হরি জনক রাজার মালী সেজেছিল। সেবারে উৎসব উপলক্ষে রায়সাহেব ভোজের আয়োজন করেছিলেন। পান এবং ভোজনের বিপুল সমারোহ হয়েছিল। উৎসব মণ্ডপের চারিধার ফুল ও চারাগাছের টবে সাজান হয়েছিল। বিজলী পাখা চলছিল। রায়সাহেব নিজের কারখানায় বিজলী তৈরী করেন। তাঁর সিপাহীরা, পরণে হলদে উর্দি, মাথায় নীল পাগড়ি, লোকজনের মধ্যে সম্ভ্রম ছড়িয়ে ফিরছিল। চাকরদের পরণে উজ্জ্বলবর্ণের জামা, মাথায় কেশর রঙ-এর পাগড়ি। তারা অতিথি ও প্রধান প্রধান

লোকদের আপ্যায়ণ করে ফিরছিল। রায়সাহেব অতিথিদের স্বাগত সম্ভাষণ করছিলেন। পানের রেকাবী থেকে তিনি নিজ হাতে অতিথিদের পান এলাচ দিচ্ছিলেন। মিঃ মেহতা বলছিল, আমি নকল জীবন, মিথ্যাচার পছন্দ করি না। মাংস খাওয়া যদি ভাল মনে কর তো খেও। এই আমার বুদ্ধিতে আসে। কিন্তু ভাল বোঝা অথচ লুকিয়ে খাওয়া—এ আমি বুঝি না। আমি একে কাপুরুষতা বা ধূর্ততা বলি। বাস্তবিক ও দুটি একই বস্তু।

কথাটা রায়সাহেব, সম্পাদকমশাই সবাইকে সমান আঘাত করেছিল।

রায়সাহেব বললেন, আপনার বিচাব ঠিক মেহতাজী। আপনি জানেন আপনাব নির্মল স্বভাবকে আমি কতটা শ্রদ্ধা করি। কিন্তু, আপনি ভুলে যাচ্ছেন, সব যাত্রার মতই বিচারের পথে যাত্রাতেও বিশ্রামের স্থান আছে। আপনি এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় লাফিয়ে যেতে পারেন না। আমি যে আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছি সেখানে রাজা হলেন ঈশ্বর, আর জমিদার ঈশ্বরের মন্ত্রী। এখন, আমি কাজে কর্মে যাই হই, এটা আমার গর্ব যে আমি বিচারে এগিয়ে গেছি। একথা মানতে সুরু করেছি যে যতদিন কিষানেরা অধিকার আদায় করতে না পারবে, ততদিন কেবল ভালোমানুষি করে ওদের অবস্থা পাল্টাবে না।

মিঃ মেহতা বললে, দুঃখের বিষয়, আপনি এত সব বুঝেও নিজের বুদ্ধিমত কাজ করেন না।

ওঙ্কারনাথ বললেন, একলা কোন কাজ হয়না মিঃ মেহতা। আপনারই বা কেন আটশ টাকা মাইনেতেও কুলোয় না বলুন তো, যখন কোটী কোটী ভাই আট দশ টাকায় সংসার চালায়?

রায় সাহেব ভেতরে ভেতরে খুশী হয়ে বাইরে দুঃখ দেখিয়ে বলেছিলেন, এসব ব্যক্তিগত কথা থাক, সম্পাদকমশাই।

কিন্তু মিঃ মেহতা শান্তভাবে বললেন, না, না, ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ সুতরাং একথা থাকবে কেন? আমি এত বেতন নিই, কারণ সাম্যবাদে আমার বিশ্বাস নেই।

সম্পাদক মশাই বিস্মিত হয়ে বললেন, সে কী? আপনি প্রচলিত ব্যবস্থা সমর্থন করেন?

আমি এই মত সমর্থন করি যে সংসারে ছোটবড় সর্বদাই থাকবে।

আপনি এই বিংশ শতাব্দীতেও উচ্চনীচ ভেদ মানেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, মানি এবং বিশেষ জোরের সঙ্গেই মানি। আপনি যে মত সমর্থন করেন, সেটা নূতন কিছু নয়। বুদ্ধ, ঈশা, প্লেটো—সবাই সাম্যের কথা বলে গেছেন। কিন্তু, য়ুনান, রোম, সীরিয়া কোন সভ্যতাতেই ওটা টেঁকেনি, কারণ, জিনিষটা অস্বাভাবিক।

আপনার কথা শুনে আমার আশ্চর্য লাগছে।

অজ্ঞানতার অন্য নামই আশ্চর্য।

আলোচনার মধ্যেই অন্য একটি গাড়ী এসে পৌঁছেছিল। তা থেকে নেমেছিলেন মিঃ খান্না, তাঁর স্ত্রী এবং মিস্ মালতী। সাদাসিধে পোষাকের মিসেস খান্নার পাশে উঁচু হিলওয়ালা জুতো পরা হাসি মুখের মিস্ মালতীকে মনে হচ্ছিল যেন সাক্ষাৎ নবযুগের প্রতিমা। কোমলাঙ্গী, কিন্তু রন্ধ্রে রন্ধ্রে চপলতা। লজ্জা সঙ্কোচের নামমাত্র নেই। প্রগলভতার সঙ্গে অপরিচিত মিঃ মেহ্তার হাত ধরে তিনি বলেছিলেন, সত্যি বলছি, আপনার চেহারা থেকেই মালুম হয় যে আপনি একজন ফিলসফার।

মিঃ মেহ্তা পুরুষদের আড্ডায় বকবক করতে পারতেন বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকের কাছে ছিলেন মুখচোরা। তিনি থমকে গেলেন।

মিঃ খান্না বলেছিলেন, ফিলসফারের চেহারায় কি বিশেষত্ব আছে বলুন তো?

মালতী বলেছিলেন, মিঃ মেহ্তা কিছু না মনে করেন তো বলি।

খান্না চোখ টিপে বলেছিলেন, ফিলসফার কোন কথাই মন্দ মনে করেনা, এই হল ওদের গুণ।

তবে শুনুন, ফিলসফার সর্বদাই মনমরা হন। যখনই দেখুন, দেখবেন আপন চিন্তায় বিভোর। আপনার দিকে তাকাবেন, কিন্তু, আপনাকে দেখবেন না। আপনি তার সঙ্গে কথা বলুন, কিছু শুনবেন না। যেন শূন্যে উড়ছেন।

সকলে হো হো করে হেসে উঠেছিল। মিঃ মেহ্তা যেন মাটিতে মিশে গিয়েছিলেন।

কিন্তু, ধীরে ধীরে নানা প্রসঙ্গে আবার মেহ্তা স্বাভাবিক হয়ে আসছিলেন। মিস্ মালতী তখন ওঙ্কারনাথের পেছনে লেগেছিলেন। এঁকে উস্কাবার জন্য বলছিলেন, জনসাধারণকে তো আপনি দেখে নিয়েছেন। কোন কাজ হয়নি। এখন কর্তাদেরও একটু দেখুন। আপনার সম্পাদকীয় আলোচনায় যদি বিষ একটু কম দেন তো, আপনাকে কথা দিচ্ছি, গবর্ণমেণ্ট থেকে অনেক সাহায্য দেওয়াতে পারি। তখন যদি আপনি মোটর গাড়ীতে না বেড়াতে পারেন আর সরকারী পার্টিতে যদি আপনার ডাক না আসে, তো আমাকে যতখুশী শাপ দেবেন।

ওঙ্কারনাথ গর্ব ভরে বলছিলেন, ঐটেই তো পারিনা। অর্থের পূজারী তো অলিতে গলিতে পাওয়া যায়, আমি মতবাদের পূজারী।

একে আমি বলি দম্ভ।

আপনার খুশি।

অর্থকে আপনি গ্রাহ্যই করেন না?

মতবাদের গলা টিপে নয়।

তবে আপনার কাগজে বিদেশী জিনিষের বিজ্ঞাপন কেন?

রায়সাহেব ওঙ্কারনাথের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসে বলেছিলেন, তা আপনি কি চান? এদিকেও মারা পড়বেন, ওদিকেও মারা পড়বেন? তাহলে কাগজ চলবে কি করে?

কাগজ যদি নাই চলে, ওটাকে বন্ধ করে দিন। আর আপনার অন্য উপায় যদি না থাকে, তবে মতবাদের দোহাই ছেড়ে দিন। কথায় ও কাজে যার সামঞ্জস্য নেই, সে আর যাইহোক আদর্শবাদী নয়।

মেহতা উল্লসিত হয়ে উঠলেন। তাঁর ধারণা হল, এই রমণী শুধু ঠাট্টা মশকরাই করে না, এর বিচারের শক্তিও আছে। তাঁর সঙ্কোচ কেটে যাচ্ছিল। তিনি বলে উঠলেন, এই কথা আমি এখনই বলছিলাম। মতে ও কাজে সামঞ্জস্য না হওয়ার নাম ধূর্ততা, কপটতা।

মিস মালতী প্রসন্নমুখে বললেন, তাহলে এ বিষয়ে আপনি আমি একমত। আমিও তাহলে ফিলসফার হওয়ার দাবী করতে পারি বলুন?

খান্নার জিভ চুলকাচ্ছিল। বললেন, দেবী, আপনার প্রতিটি অঙ্গই ফিলসফিতে ডোবানো আছে।

সেদিনের সেই আসরেই মেহতা ও মালতী মধ্যে যেন এক সেতুবন্ধন রচিত হয়েছিল। তারপর বহুবার বিরোধে বিতর্কে সংঘর্ষে এই যোগসূত্র দৃঢ়তর হয়েছে। মিস্ মালতী নারীমুক্তির আন্দোলন করেন, "উইমেন্স লীগ" খুলেছেন তিনি। অন্যদিকে মিঃ মেহতা তাঁর যুক্তির জোরে আধুনিক মতবাদকে উড়িয়ে দিয়ে প্রমাণ করতে চান, সেবায়, ক্ষমায়, ত্যাগে আর অহিংসায় মহীয়সী নারী, পুরুষের চেয়ে অনেক বড়। তাই নারী পুরুষের সমান অধিকারের কোন প্রশ্নই আসে না। ওঙ্কারনাথ বলেন, এগুলো পুরাণো ভেঁদো যুক্তি, প্রাচীনকাল থেকেই মেয়েদের এইসব মন ভুলানো কথায় দাবিয়ে রাখা হচ্ছে। মেহতা বলেন, পুরুষ ও নারীর কর্মক্ষেত্র আলাদা। পুরুষ হিংস্র। নারী মমতাময়ী। বাজপাখী শিকার করে—কিন্তু তাকে দেখে হাঁসের কি প্রবৃত্তি হবে মানস সরোবরের শান্তি ছেড়ে এসে পাখী শিকারে লেগে যেতে? মীরজা খুরশেদ বলেন, এতো কবিত্বের কথা। পুরুষ বাজ যেমন শিকার করে, মাদী বাজও তেমনি শিকার করে। কিন্তু এঁরা যাই বলুন, খোদ উইমেন্স লীগের সভায় মিঃ মেহতার এসব কথায় হাততালিও পড়ে। বিরোধিতার ঝড়ও যে না বয়, তা নয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা সভানেত্রীর আসনে মিস্ মালতীও মাঝে মাঝে অভিভূত হয়ে পড়েন। বক্তৃতার শেষে রায়সাহেব মিঃ মেহতাকে

খুব সুখ্যাতি করে বলেছিলেন, আপনি আমার মনের কথা বলেছেন, আপনার প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে আমি একমত।

মালতী হেসে বলেন, কেন সুখ্যাতি করবেন না। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই যে। এসব ত্যাগ, আদর্শ, মর্যাদার উপদেশ শুধু বেচারা মেয়েদের ওপরই চাপানো কেন ?

মেহতা বললে, এই জন্যই যে তারা কথাটা বুঝবে।

মিসেস খান্না উঠে বারান্দায় চলে গিয়েছিল। মেহতা তার কাছে গিয়ে নমস্কার করে বললে, আমার বক্তৃতা সম্বন্ধে আপনার কি রায় বলুন।

মিসেস খান্না চোখ নীচু করে বলেছিল, বেশ বলেছেন। তবে কিনা এখনো বিয়ে করেননি। এখন পর্যন্ত মেয়েরা দেবী, শ্রেষ্ঠ, কর্ণধার—সবকিছু। বিয়ে করুন, তারপর জিজ্ঞাসা করব।...আমি বলি কি, বিয়েটা সেরে ফেলুন। মিস মালতীর সঙ্গে আপনাকে বেশ মানাবে।

তা হতে পারে। তবে এক শর্ত আছে। ওকে আপনার পায়ের কাছে কিছুদিন নারীধর্ম শিখে নিতে হবে।

এটা তো স্বার্থপর পুরুষের কথা। আপনি কি পুরুষের ধর্ম শিখে নিয়েছেন ?

তাই তো ভাবছি, কার কাছে শিখি।

মিঃ খান্না আপনাকে ভাল শিখিয়ে দিতে পারবেন।

মেহতা উচ্চ হাস্যে বলেছিলেন, না, ওটাও আমি আপনার কাছে শিখব।

ভাল কথা, আমার কাছেই শিখুন। ভুলে যান নারীই শ্রেষ্ঠ। নারীর মধ্যে সেবা, কর্তব্য, সংযম, ক্ষমা সবকিছু পুরুষই জাগিয়ে দিতে পারে। নারীদের আজকের এই যে বিদ্রোহ, তার কারণ হচ্ছে পুরুষের মধ্যে এসব গুণের অভাব।

সভাশেষে মিঃ মেহতাকে সেদিন মিস মালতী হাতে ধরে নিজের বাড়ী নিমন্ত্রণ করেছিল। মালতীর গাড়ী ছোট বোন সরোজ নিয়ে গিয়েছিল। মিঃ মেহতার গাড়ীতেই দুজনে চলেছিল। পথে যেতে যেতে মেহতা জিজ্ঞাসা করেছিল আমি শুনেছি খান্না সাহেব তার স্ত্রীকে মারে। এদিকে দেখায় যেন মেয়েদের কত হিতৈষী।

মালতী বলেছিল, আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে এক হাতে তালি বাজে না।

আমি তো এমন কথা কল্পনাও করতে পারি না, যার জন্য কেউ তার স্ত্রীকে মারতে পারে। আমার তো মনে হয় আপনি খান্নার সাথে মেলামেশা করে তাকে আরও আস্কারা দিচ্ছেন।

মালতী উত্তেজিত হয়ে বলেছিল, আপনি এসময়ে কেন কথাটা তুললেন ? আপনি ভাবেন গোবিন্দী একজন দেবী। আমার দুর্নাম রটাবার জন্য উনি

যা করেছেন তা যদি শোনেন তবে আপনাকেও মানতে হবে ওরকম ব্যবহারই ওর প্রাপ্য।

আমার তো মনে হয় কোন পুরুষ যদি আমার আর আমার স্ত্রীর মধ্যে এসে যায়, তবে আমি তাকে গুলি করে মারি, নয়তো নিজের বুকে গুলি চালাই। আমার স্ত্রীর পক্ষেও কথাটা সত্য। এ ব্যাপারে আমি আপোষ মানতে রাজী নেই।

মালতী ঝাঁঝের সঙ্গে বলেছিল, আপনি কি করে ধরে নিচ্ছেন যে আপনার থিওরি অনুযায়ী আমি মিঃ ও মিসেস খান্নার মাঝখানে এসে পড়েছি। এটা আমার প্রতি অপমান। আমি খান্নাকে আমার জুতোর তলার সমানও মনে করি না।

মিস্ মালতী, এটা আপনার মনের কথা নয়। আপনি কি সারা তুনিয়ার লোককে বোকা ভাবেন নাকি ?

মালতী রেগে উঠে বলেছিল, তুনিয়ার লোক অন্যের নিন্দে করতে আমোদ পায়, আমি তা কি করে বদলাব। তবে হ্যাঁ, আমি এতটা কর্কশ নই যে খান্না কাছে এলেই তাকে গালাগাল করব। আমার কাজ সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা, সকলকে সম্ভ্রম দেখান,—এগুলো নিছক প্রয়োজন। এতে যদি কেউ অন্য অর্থ করে তবে সে—সে—মালতীর স্বর ভারী হয়ে এসেছিল। মুখ ফিরিয়ে রুমালে চোখের জল মুছেছিল। তু'এক মিনিট বাদে সে মুখ ফিরিয়ে বলেছিল, অন্য পাঁচজনের মত আপনিও আমাকে··· আমার এই তুঃখ···আপনার কাছ থেকে এতটা আশা করিনি।

তারপর ও নিজের তুর্বলতার কথা মনে করে পুনরায় ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ফুঁসে উঠেছিল। মেহতাও প্রত্যুত্তর দিতে ছাড়েনি। কলহের পরিণতি এই দাড়িয়েছিল যে, মালতীর বাড়ীর সামনে যখন গাড়ী এসে পৌছাল, তখন মালতী মিঃ মেহতাকে নমস্কার না করেই, নিমন্ত্রণের কথা ভুলে চলে গিয়েছিল। ওর ইচ্ছা করছিল এক কোণে গিয়ে কেঁদে নেয়। গোবিন্দী আগেও আঘাত করেছে। কিন্তু, এ আঘাত ছিল বড় গভীর, বড় ব্যাপক, বড় মর্মভেদী।

মিঃ খান্না ও গোবিন্দীর মধ্যে সেই প্রচণ্ড কলহের পরদিনই ভীষ্ম সেরে উঠেছিল। গোবিন্দী একটা টাঙ্গা আনিয়ে ঘর থেকে বের হল। এ গৃহ আর তার জন্য নয়। সন্তানের টানও সে সজল নয়নে উপেক্ষা করতে চাইল। কোলের ছেলেটিকে ছাড়া এ ঘরের কিছুই সে নিলনা। সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। টাঙ্গা থেকে নেমে চিড়িয়াখানার পার্কে বসে বসে ও আপন

দুর্ভাগ্যের কথাই ভাবতে থাকে। ভাবতে থাকে, এবারে ও কিভাবে স্বাবলম্বী হবে।

হঠাৎ গোবিন্দী দেখে মেহতা তার দিকেই আসছে। ও বিরক্ত হল। ও চেয়েছিল একাকীত্ব। তার ওপর কোলের শিশুটি কান্না জুড়ে দিল।

মেহতা মুখোমুখী এসে স্বাভাবিক সৌজন্য বিনিময়ের পরেই ক্রন্দনরত শিশুটিকে দেখে বললে, দিন এই বাচ্চাকে ঠাণ্ডা করি।

আপনি এ বিদ্যে কবে শিখলেন।

অভ্যাস করছি। পরীক্ষা তো দিতে হবে।

আচ্ছা! পরীক্ষার দিন এসে পড়েছে বুঝি! দেখব আপনি কোন বিভাগে পাশ হন।

গোবিন্দী বাচ্চাকে মেহতার কোলে দিল। শিশুকে কবার নাচাতেই চুপ করে গেল! মেহতা ছোট ছেলের মত নেচে উঠে বললে, দেখলেন? কেমন মন্ত্র বলে থামিয়ে দিলাম। এবার আমিও একটা বাচ্চা নিয়ে আসব।

শুধু বাচ্চাই আনবেন, না, তার মাকেও আনবেন?

পছন্দমত স্ত্রী পাই কোথায়?

কেন মিস্ মালতী নেই? সুন্দরী, শিক্ষিতা, গুণবতী, মনোহারিণী। ভ্রমরেরা তো সর্বদা ওকে ঘিরে থাকে। শুনেছি আজকাল পুরুষদের এরকমটাই পছন্দ।

আমার স্ত্রী হবে অন্য ঢঙের। সে হবে এমন যাকে আমি পূজো করতে পারি।

গোবিন্দী হেসে বললে, তাহলে আপনি স্ত্রী চান না, চান প্রতিমা। এমন স্ত্রী কোথাও পাবেন কিনা সন্দেহ।

আজ্ঞে না, এমন দেবী এই শহরেই আছেন! লক্ষপতির স্ত্রী হয়েও তিনি বিলাসকে তুচ্ছ মনে করেন। উপেক্ষা আর অনাদর সয়েও যিনি নিজের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হন না। মাতৃত্বের বেদীর সামনে তিনি নিজেকে বলি দিয়েছেন। ত্যাগই তাঁর সবচেয়ে বড় অধিকার।

গোবিন্দী সব বুঝতে পারল। ওর হৃদয় আনন্দে নাচছিল। কিন্তু সব বুঝেও সে না বোঝার ভান করে বললে, আমার মতে সে তো কৃপার পাত্র। সে এ যুগের উপযুক্ত নয়।

না, এ আদর্শ সনাতন আর অমর। মানুষই একে বিকৃত করে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছে।

গোবিন্দীর অন্তর আনন্দে ভরে গেল। বলল, চলুন একবার ওঁকে দর্শন করে আসি।

মেহতা শিশুটির হাত থেকে গোঁফজোড়া বাঁচাতে বাঁচাতে বললে, তিনি আমার

সামনেই বসে আছেন। আমি জীবনে সবচেয়ে বড় সুখ যা কল্পনা করি, তা হল আপনার মত কোনও দেবীর চরণসেবা।

গোবিন্দীর চোখে আনন্দাশ্রু দেখা দিল। এমন আনন্দ তার আগে কখনও হয়নি। তার রোমে রোমে মৃদু সঙ্গীত বাজতে থাকল। নিজের এই উল্লাস চেপে সে বললে এসব আপনি বাড়িয়ে বলছেন। আপনি কেন দার্শনিক হলেন মিঃ মেহতা। আপনার তো কবি হওয়া উচিত ছিল।

সরল হাসি হেসে মেহতা বললে, আপনি কি মনে করেন দার্শনিক না হলে কেউ কবি হতে পারে? দর্শন তো কেবল মাঝখানের কক্ষ।

আপনি এটাও তো জানেন যে কবিরা এ সংসারে সুখ পায় না।

সংসারের লোক যাকে দুঃখ বলে, তাতেই তো কবিদের সুখ। আপনার দু-চারটে কবিতা আমি পড়েছি। আমি জানি সে সব কবিতায় কি পুলক, কি কম্পন, কি মধুর ব্যথা, কি প্রাণ কাঁদান আবেগ আপনি অনুভব করেছেন। প্রকৃতির বড়ই অন্যায় যে আপনার মত দুজন মেয়ে সৃষ্টি হয়নি।

না মেহতাজী, এটা আপনার ভুল। ভেবে দেখুন, আমি তো কাউকেই প্রসন্ন করতে পারি না। আর দেখুন, মিস্ মালতী পরকেও আপন করে নেয়। মদ মানুষকে পাগল করে, তাই বলে কি জলের চেয়ে মদ ভাল?

গোবিন্দী ঠাট্টার আড়ালে থেকে বললে, আমি তো শুনেছি, আপনিও মদের উপাসক।

মেহতা লজ্জিত হয়ে বললে, আমি আপনার কাছে মিথ্যে সাফাই গাইব না। আজ আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, জীবনে আর একফোঁটা মদও আমি খাব না।

গোবিন্দী অপ্রস্তুত হয়ে কাছে এসে বললে, এ আপনি কি করলেন মেহতাজী। আমার কথার মধ্যে এরকম কোন মতলবই ছিল না।

তাতে কি, আপনি তো আমাকে উদ্ধার করলেন।

আমি? আমি বরং আমার নিজের উদ্ধারের জন্য আপনার সাহায্য চাই।

আমার সাহায্য চান? সে তো আমার সৌভাগ্য! বলুন তো আমি কি সাহায্য করতে পারি?

গোবিন্দী তখন করুণ সুরে মেহতার কাছে নিজের দুঃখের কথা অনর্গল বলতে থাকল। শেষে মিনতি করে বললে, আপনাকে গলায় আঁচল দিয়ে বলছি, আপনি মালতীর হাত থেকে আমায় বাঁচান।

চোখের জলে গোবিন্দীর গলা বুজে এল। ও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মেহতার বুক গর্বে ফুলে উঠল। ফরাসী একাডেমীর সর্বোৎকৃষ্ট সম্মান পেয়েও তার এত গর্ব হয়নি। তারই জীবনের ইষ্টদেবী, তার আদর্শের প্রতিমা আজ তার কাছে

প্রার্থী। অগ্রপশ্চাৎ, সম্ভাব্যতা অসম্ভাব্যতা বিচার না করেই সে গোবিন্দীকে কথা দিয়ে দিল, মালতীর দিক থেকে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ও আপনার পথ থেকে সরে যাবে।

গোবিন্দীর ভয় হল। বললে, মনে রাখবেন সিংহের মুখ থেকে শিকার ছিনিয়ে নেওয়া সহজ নয়।

মেহতা দৃঢ়স্বরে বললে, নারীহৃদয় ধরিত্রীর মত। সেখানে মিঠেও মেলে, তিতোও মেলে। যেমন বীজ, তেমনি ফল ফলবে।

মেহতা বলতে থাকল, আমি তো বলেছি, আপনার জন্য আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। আমার কাছে জীবন আনন্দের লীলা, আমি অতীত ভবিষ্যতের পরোয়া করি না। আমাদের জীবনীশক্তি এমনিতেই ক্ষীণ, তার ওপর ভূত-ভবিষ্যতের ভাবনা এসে জুটলে, সংস্কার, ঐতিহ্য আর ইতিহাসের ভগ্নস্তূপের নীচে পড়ে পিষে যাই। ঈশ্বর আর মোক্ষলাভের চক্র—এ দেখলেও আমার হাসি পায়। এ সবই অহঙ্কারের পরাকাষ্ঠা। আমার মতে যেখানে প্রাণ আছে, প্রেম আছে, প্রীতি আছে, আনন্দের খেলা আছে—সেখানেই ভগবান রয়েছেন। জীবনকে সুন্দর আর সুখী করাতেই ঈশ্বরের উপাসনা আর মোক্ষ। জ্ঞানী লোকেরা বলেন, হেসোনা, কেঁদো না। আমি বলি, তবে তুমি তো পাথর। জ্ঞান যদি মনুষ্যত্বকেই পিষে মারে—তবে সে তো জ্ঞান নয়, যন্ত্র।

মেহতাকে কথায় পেয়েছিল। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললে, ক্ষমা করবেন, আমি লম্বা বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম। বাচ্চাটাও কোলের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। চলুন আপনাকে বাড়ী পৌছে দিয়ে আসি।

কিন্তু বাড়ী? গোবিন্দীর বাড়ী কোথায়! গৃহে যে সে পরবাসী। তাই ও গৃহ সে ত্যাগ করেছে।

মেহতা তখন অনেক করে বুঝিয়ে বললে, সে ঘর তো গোবিন্দীর মাতৃত্বের সৃষ্টি। কে কি বলল, তাতে এসে যায় না। মিঃ খান্না আজ উন্মাদ, একদিন এই উন্মত্ততা কেটে যাবে। গোবিন্দী বেশী প্রতিবাদ করল না। ধীরে ধীরে মন্ত্রমুগ্ধের মত মেহতার গাড়ীতে এসে বসল। নিজের বাড়ী পৌছে ও যখন গাড়ী থেকে নামল, বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল ওর চক্ষুদুটি সজল।

ছেলেমেয়েরা ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরল। মুহূর্তে তার মুখে মাতৃত্বের উজ্জ্বল, গৌরবময় জ্যোতি ফুটে উঠল। অশ্রুসজল চোখে সে মেহতাকে বললে, ধন্যবাদ, অনেক কষ্ট দিলাম।

মেহতার চোখও জলে ভরে গেল। এত ঐশ্বর্য আর বৈভবের মধ্যে থেকেও এর নারী-হৃদয়ে কি গভীর দুঃখ!

হরি যেদিন নিজের জমিতে দাতাদীনের মজুরী খাটতে খাটতে মুখ থুবড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ল, সেদিনই গোবর গাঁয়ে ফিরে এল।

ফাল্গুন মাস। আম গাছে মুকুলের সুগন্ধ। ডালের আড়াল থেকে কোকিল গোপনে সঙ্গীত সুধা বিলোতে সুরু করেছে। গাঁয়ে আখ বসান আরম্ভ হয়েছে। রোদ উঠার আগেই হরি ক্ষেতে পৌঁছে যায়। ধনিয়া, সোনা, রূপা তিনজনেই ছোট পুকুর থেকে আখের ভিজে ডগা বের করে ক্ষেতে নিয়ে আসে, আর হরি তাই কাটারি দিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটে। এখন সে দাতাদীনের মজুর। কিষাণ নয়। দাতাদীনের সঙ্গে সম্পর্ক পুরোহিত যজমানের নয়, মালিক মজুরের। দাতাদীন এসে ধমক দিলে, হাত আরো ফুর্তি করে চালাও হরি। এভাবে তো সারা দিনেও কাটা হবে না।

হরি আহত হয়ে বললে, চালাচ্ছি মহারাজ, বসে তো নেই।

দাতাদীন মজুরদের পিষে কাজ আদায় করত এজন্য তার কাছে কোন মজুর টিঁকত না। কিন্তু, হরি তার জমি ছেড়ে যাবে কোথায়? দাতাদীনের ধমক শোনে আর দ্রুত কাজ করে। উপবাসী শরীর মাঝে মাঝেই তবু বিদ্রোহ করে। ধনিয়া কিন্তু ধমক খেয়ে চুপ থাকার লোক নয়। বলে, কাজ তো করছিই, মহারাজ। আমি মজুরী করছি বলে তো বলদ হয়ে যাইনি। একবার যদি মাথায় করে বোঝা বইতে, তবে বুঝতে ব্যাপারখানা কি?

দাতাদীনের এসব বেয়াদপি অসহ্য মনে হয়। গালাগাল করে বলে, বারে বারে ঘা খেয়েও দেখছি তোর মেজাজ ঠাণ্ডা হয়নি।

ধনিয়া বলে, চোখ রাঙাও কেন মহারাজ, তোমার দরজায় তো ভিখ মাঙতে যাই নাই।

দাতাদীন চীৎকার করে বলে, এই হাল হলে ভিক্ষাই মাগবি।

ধনিয়া জবাব দিতে যাচ্ছিল। সোনা অনর্থ এড়াবার জন্য তাকে টেনে পুকুরপারে নিয়ে গেল। সেখান থেকে মনের জ্বালা বের করে দিয়ে ধনিয়া বললে, তুমি ভিক্ষা কর, ভিক্ষা করার জাত যে। আমি তো মজুর হয়েছি, যেখানে কাজ করব, সেখানেই দুমুঠো পেটের ভাত জুটবে।

সোনা তাকে তিরস্কার করে বলে, ছাড়ান দাও, মা। সময় অসময় তুমি খালি ঝগড়া কর।

হরি পাগলের মত মাথার উপর পর্যন্ত কাটারি তুলে আখ টুকরো টুকরো করে জমা করতে থাকে। তাব শরীরে যেন আগুন লেগে গিয়েছিল। তার মধ্যে পূর্বপুরুষের যে শক্তি ছিল, তা যেন এখন জল থেকে বাষ্প হয়ে তাকে যন্ত্রের মত অন্ধশক্তি দিচ্ছিল। তার চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। মাথায় ঘূর্ণি, এদিকে হাত যন্ত্রব গতিতে বিনা বিরামে চলছে। দেহ থেকে ধারা বেয়ে ঘাম পড়ছিল। মুখ থেকে ফেনা উঠছিল। আর মাথার ভিতরে 'গুম গুম' শব্দ হচ্ছিল। হঠাৎ তার দুই চোখ ঘন অন্ধকারে ছেয়ে গেল। মনে হল কে যেন তাকে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। সামলাবার চেষ্টায় সে শূন্যে হাত মেলে জ্ঞান হারাল। কাটারিটা হাত থেকে ছুটে গেল। আর মুখ থুবড়ে সে মাটিতে পড়ে গেল।

চারদিকে একটা হৈ হৈ পড়ে গেল। ধনিয়া পাগলের মত ছুটে এসে হরির মাথা কোলে নিয়ে বিলাপ জুড়ে দিল। পাটেশ্বরী মুখে জল দিতে লাগল। দাতাদীন লাফাচ্ছিল, ওর আখ কাটায় দেরী হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মাতাদীন এতটা নিষ্ঠুর ছিল না। সে দৌড়ে ঘর থেকে গরম দুধ নিয়ে এল। এক শিশি গোলাপ জলও নিয়ে এল। ধীরে ধীরে হরির দেহে সম্বিৎ ফিরে এল।

এমন সময় গোবর একজন মজুরের মাথায় জিনিসপত্র নিয়ে এসে উপস্থিত। গাঁয়ের কুকুরগুলো প্রথমে ঘেউ ঘেউ করে ছুটল, পরে লেজ নাড়তে লাগল। রূপা 'দাদা এসেছে' বলে, হাততালি দিয়ে ছুটল। সোনা কয়েক পা এগিয়ে নিজের উৎসাহ ভিতরে চেপে রাখল। এক বৎসরের মধ্যে তার যৌবন তাকে আরও লজ্জানম্র করে তুলেছে। ঝুনিয়াও ঘোমটা খুলে দরজায় এসে দাঁড়াল। গোবর এসে বাপ মার পায়ে প্রণাম করল. রূপাকে কোলে বসিয়ে আদর করল। ধনিয়া তাকে আশীর্বাদ করল। আজ ধনিয়ার গর্ব কত? কিন্তু, হরি মুখ ফিরিয়ে নিল। সোনা-রূপা ভিতর কোঠায় বসে জিনিসপত্র ভাগাভাগিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। গোবর ঝুনিয়ার জন্য এনেছে আয়না-চিরুনী, চুন্নুর জন্য সুন্দর জামা, টুপি। মেয়েদের জন্য পাড়ওয়ালা পাতলা শাড়ী। যেরকম পাটেশ্বরী লালার ঘরে মেয়েরা পরে। হরির জন্য ধুতি ছাড়াও একখানা দোপাট্টা। ধনিয়া এটাতে সব চাইতে খুশী। সোনার জন্য চপ্পল এনেছিল, রূপার জন্য খেলনা। তাই নিয়ে রূপা খানিকক্ষণ ঝগড়া করে নিল। চারিদিকের দারিদ্র্য ও দুর্দশার মধ্যে গোবর একঝাঁক উল্লাস নিয়ে এসেছিল। ঝুনিয়ার অভিমান ভাঙ্গাতে আরও কিছু সময় গেল। কি দুর্দশায় এতদিন কেটেছে। একে একে সব কাহিনী সে গোবরকে শোনায়। ভাগ্যি বাবা-মা ছিল। ওরা ওর কাছে দেবতার চেয়েও বড়। গোবর তো নিশ্চয়ই সুখেই ছিল, নিশ্চয়ই অন্য মেয়েছেলেকে তাগ করেছে।

গোবর ভগবানকে সাক্ষী মেনে এসব অস্বীকার করে। না, ও পলাতক হয়নি। ও রোজগারের জন্যই লখনৌ গিয়েছিল। এবার সেখানে ঝুনিয়াকেও নিয়ে যাবে।

গোবর শহরে পুরো এক বছর থেকে এসেছে। এখন আর সে সাদাসিধা গ্রাম্য যুবক নাই। দুনিয়ার অনেক রং ঢং এখন সে বোঝে। মূলে অবশ্য আছে এখনো দেহাতীই। পয়সা কামড়ে ধরে, স্বার্থ কখনো ছাড়ে না, পরিশ্রমে ফাঁকি দেয় না, সাহসে কখনো হার মানে না, কিন্তু গায়ে শহরের হাওয়া লেগেছে। প্রথম মাসটা ও কেবল মজুরী খেটেছিল, আর আধ পেটা খেয়ে অল্প টাকা বাঁচিয়ে নিয়েছিল। পরে সে 'কচালু', মটর আর দইবড়া খুচড়া বিক্রী আরম্ভ করল। এদিকে বেশী লাভ দেখে চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিল। গ্রীষ্মকালে সরবৎ আর বরফের দোকান খুলল। শীতকালে চা বিক্রী শুরু করল। গোবরের এখন যথেষ্ট রোজগার হতে লাগল। সে এখন বিলিতি ঢং-এ চুল কাটায়, সরু ধুতি আর পাম্পশু পরে, লাল রং-এর এক পশমী চাদর কিনেছে। পান সিগারেটের অনুরাগী হয়েছে। সভা-সমিতিতে গিয়ে রাষ্ট্র-শ্রেণী—এসব বুঝতে আরম্ভ করেছে। সামাজিক প্রতিষ্ঠা বা লোকনিন্দার ভয় এখন তার আর প্রায় নাই। শহরে এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

একটু বিশ্রামের পরই গোবর দিগ্বিজয়ে বেরোল। কাকাদের 'রাম রাম' করে এল। গ্রামের মাতব্বরদের বাড়ীও গেল, কিন্তু সেলামের ধার ধারলো না। ও কথায়-বার্তায়, চাল-চলনে নিজের বৈভব প্রতিপত্তির কথা বলে, এমন কি ঝিংগুরী সিংহ বা দাতাদীনেরও ঈর্ষার উৎপন্ন করল। ছেলের দল তো ওকে 'হিরো' বানিয়ে তুলল, এবং ওর সঙ্গে লখনৌ যাবার জন্য প্রস্তুত হল। গোবর যখন হরির ওপর একশ' টাকা দণ্ডের জন্য দাতাদীনকে শাসাল, সকলেই তার পক্ষ নিল। দাও এদের টিট করে। গোবর গোঁফে তা দিতে দিতে বললে, থাকতাম যদি এখানে, তো দেখিয়ে দিতাম এদের। এক এক করে নাচিয়ে ছাড়তাম। এখন ধুমধাম করে হোলি লাগাও, আর হোলির সং বানিয়ে এদের সকলকে একচোট নাও। হোলির প্রোগ্রাম তৈরী হতে লাগল। খুব ভাঙ আর দুধিয়া ঘোঁটা হল, নুন দেওয়া হল। রং-এর সঙ্গে কালি তৈরী হল। বুড়োদের মুখে কালি দেওয়া হবে। হোলির সময় কে কি বলতে পারে। টাকা পয়সার চিন্তা নেই, গোবর দেবে।

দুপুরের আহারের পর গোবর ভোলার কাছে গেল। ধনিয়া আর হরি ভয়ে সিঁটিয়ে ছিল, না জানি গোবর কি অনর্থ বাধায়। ওর কথা এখন তীক্ষ্ণ। অকাট্য। তার মেজাজ চড়া। লজ্জাহীন। দণ্ডের টাকা দেওয়ার জন্য হরিকে গোবর খুব গালমন্দ করেছিল। ধনিয়ার এতটা ভাল লাগে নি। সে

বলেছিল, তা কি করা। ভাই বেরাদরি সমাজও তো দেখতে হবে? সোনার বিয়ে দিতে হবে না? সমাজচ্যুত হয়ে থাকা যাবে? তাতে গোবর ফস করে বললে, হুঁকো জল তো সবই ছিল, মা। বেরাদরির মধ্যে আদরও ছিল। কিন্তু আমার বিয়ে হল না কেন, বল? এই জন্যেই তো যে ঘরে রুটি ছিল না? টাকা থাকলে হুঁকো জলেরই বা কি কাজ? দুনিয়াটা হল টাকার বশ। বুঝলে, হুঁকো জলের কথা কেউ জিজ্ঞাসা করে না। এই হল এখন গোবরের কথাবার্তার ধরণ। অতএব সে ভোলার ওখানে বলদের জন্য কি বিপত্তি বাধায় কে জানে। কিন্তু ভোলার কাছে গোবর কোন মেজাজ দেখাল না। সেখানে সে পাকা কূটনীতিকের মত ব্যবহার করল। ভোলার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল, কৃতকর্মের জন্য মাপ চাইল। খুব রসাল করে নিজের উন্নতির কথা বলল, আর অকর্মণ্য বড় ছেলে জংগীকে শহরে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিল। বলল, চায় তো ভোলাও যেতে পারে, শহরে অনেক টাকা। ভোলাও তো হাতে স্বর্গ পেল। খুব আদর আপ্যায়ণ পেল গোবর। ফেরার পথে হরির বলদ দুটো ওর সঙ্গে ফেরত গেল, আর পেছনে জঙ্গী চলল দুই দুই হাঁড়ি দৈ নিয়ে!

গ্রামে বছরে ছয়মাস কোন না কোন উৎসবের ঢোল বাজতেই থাকে। ঘরে ধান নেই, শরীরে কাপড় নেই, গাঁটে পয়সা নেই—তাতে কি? আনন্দ-উৎসব বন্ধ করে তো আর বেঁচে থাকা যায় না। হোলির একমাস আগে থেকেই একমাস পর পর্যন্ত বাতাসে ফাগ উড়তে থাকে। অন্যান্য বৎসর নোখেরামের বাড়ীতে আসর বসে, ভাং ঘোটা হয়, পানের খিলি সাজা হয়, রং গোলা হয়, গান হয়। গোমস্তা সাহেবের পাঁচ দশ টাকা উড়ে যায়। এবার আসর বসেছে গোবরের বাড়ীর দুয়ারে। তরুণেরা গোবরের টানে জড় হয়েছে। গ্রামে অনেকেই অভিনয় জানে। সরলহৃদয় দর্শকরা অল্পতেই উপভোগ করতে, হাসতে জানে। এবারে হোলির পালায় ঝিংগুরী সিং-এর দুই বৌ-এর কেচ্ছা, সুদখোর মহাজনের কথা, মাতাদীনের অনাচার—এসব নিয়ে নক্সা হল। সারা গাঁয়ের লোক দেখে আর হাসে। কিছুদিন পর্যন্ত সবাই এই নিয়েই মেতে থাকল। আর গ্রামে মাতব্বরেরাও প্রতিহিংসা নেবার জন্য তৈরী হল।

কিন্তু গোবর ঠকবার পাত্র ছিল না। দাতাদীন যখন হরিকে এসে কাজের তাড়া দিল, গোবর বললে, কেউ কারু গোলাম নয়। হরি নিজের জমিতেই চাষ করবে। দাতাদীন তখন তার দুইশ' টাকা ফেরৎ চাইল। দু'শো টাকা? গোবর মাটীতে আঁক কষে বললে, আসল ত্রিশ টাকা, এক টাকা হারে সুদ ছত্রিশ টাকা—মোট ছেষট্টি টাকা। সত্তর টাকার বেশী সে

দাতাদীনকে দেবেনা। দাতাদীন ভাবে, কলিযুগে ব্রহ্মতেজ নেই, না হলে সে এদের ভস্ম করে দিত। তবে সে হরিকে শাসিয়ে বলে, থাকুক তোমার টাকা। এই আমি চললাম। যদি আমি ব্রাহ্মণ হই, তুমি আমার দরজায় এসে দু'শ টাকা দিয়ে যাবে।

দাতাদীন রাগ করে ফিরে যাচ্ছিল। হরি পায়ে ধরে ব্রাহ্মণকে শান্ত করে। এক পাই সেখানে চাতুরি চলে না। হরি ব্রাহ্মণকে বুঝিয়ে বললে, মহারাজ, তোমার পাই-পয়সা আমি চুকিয়ে দেব। তবে, কাল থেকে আমাকে নিজের চাষ করতে হবে। তোমার কাজ আমি পারব না। হরির এই আচরণে গোবর বিরক্ত হয়। সে সাফ জানিয়ে দেয়, হরি যদি এভাবে নিজের জমিতে গর্ত খোড়ে, তবে সে তাতে পড়তে যাবে না। গোবর আর হরির মধ্যে একটা অদৃশ্য সংঘাত বেঁধে গিয়েছিল। হরি তার নিজের রাস্তায় চলতে চায় চলুক। কিন্তু, গোবর তার জন্য জান দিতে রাজি নয়।

সেদিন হরি ও গোবর চাষ করছিল। কিন্তু, কেউ কারু সাথে কথা বলছিল না। সোনা রূপা ক্ষেতে জল দিচ্ছিল। এমন সময় দুজনে ঝগড়া বেধে গেল। ঝগড়ায় বিষয় বস্তুঃ ঝিংগুরী সিং এর ছোট ঠাকুরাণী আগে নিজে খায় না, স্বামীকে খাওয়ায়? সোনা বলছিল, সে আগে নিজে খায়, রূপার মত উল্টো। রূপা বলে, তাহলে ঠাকুর এত মোটা কেন? ও যদি ঠাকরুণের ওপর পড়ে যায় তো ও পিষে যাবে জানিস?

সোনা বলে—তুই মনে করিস, খেলেই মোটা হয়? ভাল খেলে গায়ে জোর হয়। মোটা হয় ঘাস পাতা খেলে।

তা হলে ঠাকুরের চেয়ে ঠাকরুণের গায়ে জোর বেশী?

তা ছাড়া কি? সেদিন এক ধাক্কায় ঠাকুরের হাঁটু ভেঙ্গে দিয়েছে, জানিস?

তাহলে, তুইও নিজে খেয়ে পরে বরকে খাওয়াবি?

তা নয় তো কি? আমি আমার মরদকে কাবু করে রাখব। তোর মরদ তোকে পিটাবে।

রূপা কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে, কেন পিটাবে? আমি তেমন কাজই করব না।

সে সব শুনবে না। মুখ খুললেই তোকে পিটাবে। মারতে মারতে চামড়া তুলে নেবে।

রূপা সোনার শাড়ী দাঁত দিয়ে ছিড়তে চাইল। না পেরে চিমটি কাটল।

সোনা আর একটু চড়িয়ে বলল—ও তোর নাকও কাটবে।

এরপর রূপা সোনাকে দাঁত দিয়ে কামড়াল। সোনা চটে গিয়ে মারলে এক ধাক্কা। রূপা পড়ে গেল, আর উঠে কাঁদতে লাগল। সোনাও তখন দাঁতের দাগ দেখে কাঁদতে লাগল।

দুইজনের চীৎকারে গোবর রাগে ফুলে উঠল আর দু'জনকে দু'ঘা বসিয়ে দিল। দুই বোন রাগ করে ঘরে চলে এল। আর সেচের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। এই নিয়ে পিতাপুত্রে এক হাত হয়ে গেল।

হরি বলল, এখন ক্ষেতে জল দেবে কে? দৌড়ে দৌড়ে গেলি, আর দুজনকে দিলি তাড়িয়ে।

গোবর রেগে বলে, তুমিই এদের সব বেয়াড়া করেছ। দুবেলা খাওয়া বন্ধ কর, ঠিক হয়ে যাবে।

হরিও গজর গজর করে, আমি ওদের বাপ, কসাই নই।

পায়ে একবার কোন কারণে লেগে গেলে, বার বার ওখানেই ঠোকর লাগে। কখনো কখনো আঙুল পেকে যায়। পিতাপুত্রের ভালবাসায় আজ ঐ রকমের ঠোকর লেগেছিল।

গোবর রাগ করে ঝুনিয়াকে নিয়ে এল। ঝুনিয়া শিশুকে নিয়ে ক্ষেতে গেল। ধনিয়া আর দুই মেয়ে তাকিয়ে রইল। মায়ের কাছে গোবরের এতটা বাড়াবাড়ি ভাল লাগে নাই। রূপাকে মারা এক কথা, তাই বলে, বিবাহযোগ্য মেয়ে সোনাকে?

গোবরেরও আর ভাল লাগে না। আজই রাত্রে গোবর লখনৌ যাবে, ঠিক করল। এখানে আর সে থাকবে না। লেন-দেন এর ব্যাপারে তার কথা টেঁকে না। মেয়েদের একটু মেরেছে তো সবাই এমন ব্যবহার করছে যেন বাইরের লোক। এ সরাই-এ ও আর থাকবেনা।

হরি ও গোবর খেয়ে দেয়ে বাইরে এসেছে, এমন সময় নোখেরামের পেয়াদা এসে বললে, চল, কারিন্দা সাহেব ডেকেছে। হরি অনিচ্ছা সত্বেও গেল, আর ফিরে এসে ছিলিম টানতে লাগল। নোখেরাম বলছে সব নাকি দুই বছরের খাজনা বাকী। অথচ, এই সেদিনও আখ বেচার টাকা থেকে ও পঁচিশ টাকা দিয়েছে। গোবর জিজ্ঞাসা করে, রসিদ আছে তো? নাই, শুনে বাবাকে ও গালমন্দ করে। হরি উল্টে দোষ দেয়। বলে গোবরের ঔদ্ধত্যই এর কারণ। গ্রামের মাতব্বরদের না হক চটিয়ে দিয়েছে। জলে থেকে কি কুমীরের সঙ্গে বিবাদ চলে? এখন বোঝ! সুদ সহ সত্তর টাকা চাইছে। এ টাকা আসবে কোথা থেকে?

গোবর তৎক্ষণাৎ নোখেরামের বৈঠকখানায় গেল। সেখানে প্রধান প্রধান ব্যক্তির কেবিনেট বসেছে। উত্তেজিত স্বরে গোবর তাদের শাসাতে থাকল। ওর কথার মধ্যে সত্যের বল ছিল। ভীরু প্রাণীর মধ্যে সত্যও বোবা হয়ে যায়। ইটের ওপর বসে যে সিমেন্ট পাথর হয়, মাটীর ওপর বসলে তাই মাটী হয়ে যায়। গোবরের নির্ভীক স্পষ্টবাদিতায় নোখেরাম নরম হল।

যেন কিছু মনে করার চেষ্টা করে বললে—আহা, গরম হও কেন? তুমি কি আর মিথ্যা বলবে? আমারও যেন মনে হচ্ছে, হরি টাকাটা দিয়েছিল।

ফিরে এসে গোবর হরিকে খুব তিরস্কার করল, তুমি তো ছোট ছেলেরও অধম, বিড়ালের ম্যাঁও শুনলে ভড়কে যাও। আমি তোমায় সত্তর টাকা দিয়ে যাচ্ছি। দাতাদীন নেয় তো দেখে শুনে পাই পয়সা পর্যন্ত লিখিয়ে নিও। এর ওপর যদি আর পয়সা দাও তো আর আমার কাছে কিছু পাবে না। তুমি বিলোতে থাকবে, আর আমি ভরতে থাকব, তা হয় না। আমি কাল চলে যাব। কিন্তু, এই বলে দিচ্ছি, তুমি কারু কাছে ধার করবে না, শতকরা এক টাকার বেশী সুদ দেবেনা।

ধর্মভীরু হরি কাঁদকাঁদ হয়ে গেল। ধনিয়া বললে—এখন কেন যাস বাবা? আর কটা দিন সব ঠিকঠাক করে, তারপরে যাস।

গোবর মুরুব্বির চালে বললে, এখানে রোজ দু'তিনটাকা লোকসান হচ্ছে, এটা তো বোঝ? এখানে আমি বড় জোড় চার আনার মজুরী করি। আর, এবার আমি ঝুনিয়াকে নিয়ে যাব।

ধনিয়া ভয়ে ভয়ে বললে—সে তোমার যা ইচ্ছা। কিন্তু সেখানে খোকাকে কে দেখবে? গোবর বলে, সঙ্গী সাথী ঠিক এসে যাবে। স্বার্থের সংসার। যার কাছে পাওনার চেয়ে দু'পয়স কম নাও, সেই নিজের। খালি হাতে তো বাপ মাও পোছেনা।

ধনিয়া কটাক্ষ বুঝতে পারল। তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত জ্বলে গেল। সে প্রাণপণ যুক্তি দিয়ে এই অপবাদ ঠেকাতে চাইল। গোবরকে মানুষ করার জন্য ওরা জীবনপাত করে নাই? কর্জ করে নাই? কিন্তু গোবর এসব কথায় পাত্তা দেয় না। মানুষ? যতদিন শিশু ছিলাম, দুধ খাইয়েছ। তারপর ধর্মের নামে ছেড়ে দিয়েছ। দুধ কি, মাখন কি, কখনো দেখি নাই। এখন তোমরা চাও, আমি সংসার দেখি, কর্জশোধ দিই, মেয়েদের বিয়ে দিই। কেন? আমারও তো ছেলেপুলে আছে।

ধনিয়া অন্ধকারে পড়ে গেল। এক মুহূর্তে তার জীবনের সমস্ত মধুর স্বপ্ন যেন ভেঙ্গে গেল। এখন আর কি রইল। যে নৌকায় চড়ে সাগর পার হবে ভেবেছিল, তাই যদি ভেঙ্গে যায় তবে রইল কি?

কিন্তু না। তার গোবর তো এত স্বার্থপর নয়। এ নিশ্চয়ই ঝুনিয়ার কারসাজি। ওরা তো কেউ গোবরকে লেনদেনের কথা বলেনি। সে নিজেই তো সব মাথায় করে নিয়েছিল। ঐ ডাইনীই ছেলেকে বশ করেছে, ওর জীবনের নিধিকে ছিনিয়ে নিয়েছে।

মনের এই সন্দেহ কথায় প্রকাশ পেল। কথা থেকে কথা। কলহ। ঝুনিয়া ও

ধনিয়ার প্রচণ্ড লড়াই হয়ে গেল। পাড়ার লোকেরা ঝুনিয়ার দিকে। কারণ ধনিয়া চিরকালের মুখরা। কারণ ঝুনিয়ার কথায় আগল ছিল। কারণ ঝুনিয়া পয়সাওয়ালার বৌ।

গোবর ঝুনিয়া ও শিশুপুত্র নিয়ে চলে গেল। যাবার আগে গোবর মাকে একটা প্রণামও করল না। ঝুনিয়া শাশুড়ীর কাছে গিয়ে আঁচল দিয়ে তার পা ছুঁল। কিন্তু ধনিয়ার মুখ থেকে কোন আশীর্বাণী বের হল না।

ধনিয়ার হৃদয়কে কেউ করাত দিয়ে চিরছিল। তার মাতৃত্ব আজ সেই ঘরের মত যা আগুনে ভস্ম হয়ে গেছে, একটু বসে কাঁদবার জায়গাও আর নাই।

॥ আট ॥

সোনা সতেরোয় পা দিয়েছে। হরি পাত্রের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। কিন্তু কিছুতেই টাকা জমিয়ে উঠতে পারেনি। এদিকে ঝিংগুরী, পটেশ্বরী, নোখেরাম তিন মাতব্বরের ছেলেদেব নজর আজকাল ওর বাড়ীর দিকে পড়েছিল। গোবরের আনা শাড়ী পরে যখনই সোনা বাইরে আসত তখনই এদের ঘুরঘুর করতে দেখা যেত। এসব রঙ্গ দেখে হরির রক্ত শুকিয়ে যেত, যেন তার ক্ষেত নষ্ট করার জন্য আকাশে শিলাবৃষ্টির হলদে মেঘ ঘনিয়ে আসছে।

সেদিন সন্ধ্যায় হরি দুলারী সাহুয়াইনের কাছে গেল। রঙ্গ রসিকতায় ও একটু সাহুয়াইনকে ভেজাতে চাইল। দুলারীও কানে কানে বললে—এদের থেকে সাবধান। আমার কৌশল্যা শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছিল। আমি সকলের ঢং দেখে পাঠিয়ে দিয়েছি। কে কতক্ষণ পাহারা দেবে।

হরিকে মুচকি হাসতে দেখে সে বললে, হাসছ হরি। তোমারও নটখট কম ছিল না। দিনে সাতাশ বার একটা না একটা বায়নায় আমার দোকানে আসতে যেতে। কিন্তু আমি কখনো তাকাইনি পর্যন্ত।

হরি বললে, এ তুমি মিথ্যে বলছ বৌঠান! আমি রস না পেলে আসি? পাখী একবার দেখে যায়, তবে পরের বার আঙ্গিনায় আসে।

দূর মিথ্যাবাদী।

হুসেনী এক পয়সার নুন নিতে এসে ওদের রঙ্গ রসিকতায় থমকে দাঁড়িয়েছিল। সে চলে গেলে দুলারী বললে, গোবরের কাছে চলে যাও না কেন? ওদেরও দেখে আসবে, কিছু পেয়েও যাবে।

ও কিছু দেবে না। তা আমি তো বেহায়াপনা করে যেতে রাজী ছিলাম।

কিন্তু ধনিয়া মানে না। ওকে তো তুমি চেনো।
দুলারী কটাক্ষ করে বলে, তুমি তো বৌ-এর গোলাম হয়ে গেছ।
তুমি ডেকে জিজ্ঞাসাই করো না, কি করি।
আমার গোলামী করবে বললে লিখিয়ে নিতাম। সত্যি।
তা, এখন অভাব কিসের। লিখিয়ে নাওনা দুশ টাকায়। লিখে দিচ্ছি।
ধনিয়াকে বলবে না তো ?
নাঃ, দিব্যি।
আচ্ছা যাও, তবে বর ঠিকঠাক কর। আমি টাকা দিয়ে দেব।
হরি আবেগে দুলারীর পা ধরতে গেল। ও পা সরিয়ে নিয়ে বললে, খোসামোদ ভাল লাগে না। এক বছরের মধ্যে কান মলে টাকা আদায় করে নেব।
হরি খুব উচ্ছসিত। কিন্তু ধনিয়ার এসব ভাল লাগে না। বিয়ের জন্য নূতন করে কর্জ ওর পছন্দ নয়। যখন শুনলে দুলারীর সঙ্গে কথাবার্তা চলছে তখন নাক সিঁটকে বললে, ওই ডাইনীর কাছে গেছ? কত বসে সুদ নেয়! বলনা কেন, গিয়েছিলে খানিকটা গালগল্প করতে। বুড়ো হলে, তবু বদ অভ্যাস গেল না।

সোনা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছিল। সে বাইরে এসেই সিলিয়াকে ধরল। সিলিয়া আজকাল মাতাদীনের ঘরে থাকেনা, সেদিনের এক কেলেঙ্কারীর পর ধনিয়ার ঘরে থাকে। সিলিয়াকে নিয়ে দাতাদীনের কোন ক্ষোভ ছিলনা। সিলিয়া কাজকর্মের মেয়ে, একা দশজনের কাজ তুলে দেয়। ধর্মের কথা যদি বল, তবে তার মূল কথা হল পূজাপাঠ, ব্রত-কথা আর হাড়ি কুঁড়ি। পিতাপুত্র দুজনেরই এসব ব্যাপারে কোন ত্রুটি নেই। স্ত্রীদেহ হল পবিত্র। অতএব, চামারীর সঙ্গে সহবাসের ব্যাপারটা ধর্তব্য নয়। মহাভারতে-পুরাণে ব্রাহ্মণের দ্বারা অন্য জাতির কন্যা গ্রহণের হাজারটা কাহিনী আছে। এইরূপ বিবাহের উৎপন্ন সন্তানরা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিত। আজকালকার ব্রাহ্মণরা তো তাদেরই সন্তানের সন্তান। অতএব, এতে লজ্জার কি ? লুকোবারই বা কি ?
কিন্তু, একদিন সিলিয়ার বাপ ঐ পাজী হরখুটা বৌ, ছেলে, দলবল নিয়ে এসে অনর্থ বাধিয়ে গেল। ওরা জোর করে মাতাদীনের পৈতে ছিঁড়ে, মুখে মাংসের হাড্ডি পুরে দিয়ে ওর ধর্মনাশ করে গেল। সিলিয়াকে জোর করে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। পারেনি। ওকে টেনে হিঁচড়ে লাথি মেরে রক্তারক্তি কাণ্ড করে গেছে। কিন্তু, সিলিয়া মাতাদীনকে ছেড়ে যাবে না।

ও ধর্মত্যাগী হবে না। যাকে ভালবেসেছে সে যদি গাছতলায় রাখে তবে তাই-ই রাখবে। হরখুরা রাগ করে চলে গেল। ক্রুদ্ধ দাতাদীনও সিলিয়াকে সাফ জানিয়ে দিল, আর ওর ঘরে নয়। মাতাদীনও তখন তার ধর্মচ্যুতির লজ্জায় উন্মাদ হয়েছিল, এব ওর চামারণী-প্রেম উড়ে গিয়েছিল। মাতাদীনের হাত ধরে শত অনুনয়েও তার দয়া হয় নি। সেই থেকে সিলিয়া ধনিয়াদের একটা কোঠায় আশ্রয় নিয়ে আছে। হরির আপত্তি ছিল, কিন্তু ধনিয়া শোনে নি। পরিত্যক্তা এই নারীকে এনে ঘরে ঠাই দিয়েছিল।

সিলিয়া সোনার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। সোনা ওকেই দূতী করে পাঠাল পাত্রের বাড় সোনারী। এই আর্জি জানিয়ে পাঠালে যে মথুরা যেন বিয়েতে যৌতুক না নেয়। সোনার জন্য ওর বাবা মা আবার কর্জের দায়ে পড়বে, তার চেয়ে মৃত্যু ভাল, এই কথাই সে বলে পাঠাল। মথুরা সোনার সঙ্গে বিয়ের আশায় উল্লসিত ছিল। পয়সাওয়ালা চাষী। কটা পয়সা যৌতুকে ওর লোভ ছিলনা। কিন্তু, পিতা গৌরী মাহাতো ছেলের কাছে প্রস্তাব শুনে তো প্রথমে ওকে জুতো পেটা করলে। সিলিয়া সঙ্কুচিত ভাবে সব দেখল। কিন্তু, ওর দৌত্য সফল হল। মথুরা হুঁশিয়ার ছেলে। বাপকে রাজী করিয়ে ছাড়ল। একদিন হরির কাছে লোক মারফৎ চিঠি এসে পৌছাল যে যৌতুকের প্রয়োজন নেই। গৌরী মাহাতো কন্যা রত্নটিকেই শুধু চায়।

হরির তো উল্লাসের অন্ত ছিলনা। কিন্তু সে ধনীয়াকে বুঝে উঠতে পারেনি। এতদিন সে নিজেই কর্জ করার বিপক্ষে ছিল। কিন্তু, আজ যখন যেচে এসে লক্ষ্মী ধরা দিলেন, তখন সে বেঁকে বসলে এই বলে যে, ব শ মর্যাদা বলে তো একটা বস্তু আছে। আগে গৌরী মাহাতো লোভ করেছিল। এখন দেখাচ্ছে ভালোমানুষী। ইটের জবাব পাথর হতে পারে, কিন্তু, সেলামের জবাব তো গাল নয়।

হরি আর কি করে! ধনিয়ার ঘাড়ে সব সময়ই ভূত চেপে আছে। এখন ওকে দুলারী সাহুয়াইনের কাছেই হাত পাততে হবে।

কিন্তু, এদিক নূতন বিপত্তি দেখা দিল। মংরু শা'র কাছে হরির কিছু পুরানো দেনা ছিল। মংরু গাঁয়ে সব চেয়ে ধনী। কিন্তু স্থানীয় দলাদলিতে মাথা গলাত না। প্রভাব বা অধিকারের লালসা তার ছিল না। তার বাড়ীটিও ছিল গাঁয়ের বাইরে। সেখানে সে একটি বাগান, একটি কূয়ো ও ছোটখাট শিবমন্দির বানিয়ে দিয়েছিল। মংরু টাকার জন্য তাগাদার বিশেষ ধার ধারতনা। কিন্তু, বুদ্ধি দিল পটোয়ারীলাল।

এবারে বরাতক্রমে হরির ক্ষেতে আখ সবচেয়ে বেশী হয়েছিল। লালা পটেশ্বরী ন্যায়ের অবতার। কেউ কাউকে ঠকায় এ তার অসহ্য ছিল। সেই মংরুকে

পরামর্শ দিলে এবারে চাপ দিয়ে হরির কাছ থেকে টাকাটি আদায় করে নাও। মংরু ততটা দয়ালু নয়, যতটা অলস। কিন্তু, পাটেশ্বর যখন আশ্বাস দিয়েছে ঘরে বসেই ডিক্রী পাওয়া যাবে সে আদালতের টাকাটা দিয়ে দিল। আদালতের আদেশে একদিন হরির জমির আখ দেড়শ টাকায় নীলাম হয়ে গেল। মংরু শার নামেই ডাক হল।

আখ তো গেল। এখন টাকা আসে কোত্থেকে? এই আখ বাঁধা দিয়েই হুলারী টাকা ধার দিতে চেয়েছিল। এখন বিয়ের সম্মিতি ঠাক। হরি অনেক ধরাপড়া করল। কিন্তু, দয়া এক, ব্যবসা ভিন্ন। হুলারী দয়ার ব্যবসা করতে শিখে নাই। সে টাকা দিতে অস্বীকার করল।

জমি বন্ধক রাখা ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। কিন্তু, হরি এবং ধনিয়া হু'জনেরই জমি সমান প্রিয়। অতএব, বরযাত্রীদের একবেলা কোন মতে খাইয়ে সকালে মেয়ে বিদায় করা ছাড়া পথ ছিল না। ভগবানের যখন ইচ্ছে মুখে কালি পড়ুক, তখন আর কি করা।

কিন্তু চাষীর ঘরে উপায় জুটে যায়। একদিন নোহরী এসে সেধেই হু'শ টাকা দিয়ে গেল। নোহরী ভোলার নূতন বৌ। বিধবা, এক কচি শিশুসহ ভোলার ঘরে এসেছে। বিয়ের পর হু'দিনও ভোলা ঘরে টিঁকতে পারেনি। বড় ছেলে জংগী গোবরের সঙ্গে লখনৌ গিয়েছিল। ছোটছেলে কামতা আর বৌ হুজনে মিলে এদের তাড়াল। আশ্রয় পেল নোখেরামের ঘরে। ভোলাকে দেখে তার দয়া হয়নি। ভোলার যুবতী বৌটিকে দেখেই সে আশ্রয় দিয়েছিল। নোখেরামকে গাঁয়ে সবাই মান্য করত। কিন্তু পাটেশ্বরী সবদাই তাকে টেক্কা দিতে চাইত। নোখেরামের বড়াই সে ব্রাহ্মণ, কায়স্থদের আঙুল নাড়িয়ে নাচায়, আর পাটেশ্বরীরও গর্ব সে কায়স্থ, কলম পেশার রাজা, এই বাজারে ওকে ঠকিয়ে কেউ বাজী জিততে পারে না। তাছাড়া সে নোখেরামের মত জমিদারের চাকর নয়, সরকারের নোকর—যে সরকারের রাজ্যে বিনা সূর্য অস্ত যায় না। আর একটি বিষয়ে পাটেশ্বরী ওর উপরে ছিল। লোকে বলে, কাহারদের যে বিধবা মেয়েটি বাড়ীতে জল দিত, সে পাটেশ্বরীর রক্ষিতা ছিল। এখন, ভোলা-ভোলার বৌকে আশ্রয় দিয়ে নোখেরামের এই ত্রুটিটা পূরণের অবকাশ মিলল।

ক্রমে ক্রমে গ্রামে নোহরীর প্রতিপত্তি এবং নিন্দা দুই-ই বেড়ে গেল। ভোলা নোহরীর ভৃত্য হয়ে এবং নোহরী নোখেরামের গৃহের ঈশ্বরী হয়ে বাস করতে লাগল।

বুটিদার শাড়ী পরে নোহরী হরিদের বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ধনিয়াই ডাকলে, আজ কোনদিকে চলেছ বেয়ান, এস, বস।

নোহরী এল। মেয়ের বিয়ের কথা, গোবরের কথা, সব প্রসঙ্গই এল। এমন সময় সোনা বলদগুলিকে খাওয়াবার জন্য একবোঝা ঘাস মাথায় নিয়ে, যৌবনকে আঁচল দিয়ে ঢাকতে ঢাকতে বালিকার মত সরলভাবে এল, আর মাথার বোঝা ফেলে রেখে চলে গেল।

নোহরী বললে—মেয়ে তো খুব বড় সড় হয়েছে।

ধনিয়া বললে, মেয়ের বাড, রেড়ীর বাড়। বর ঠিকঠাক। টাকা হলেই বিয়ে দিয়ে দিই। কিন্তু টাকা দেয় কে?

নোহরী ভাবল, যদি সোনার বিয়েতে কিছু টাকা দেয়, তবে নাম যশ হয়। যারা আজ ওকে আঙুল দিয়ে দেখায়, ওদের মুখ তবে সেলাই হয়ে যায়। ও যা অল্প সল্প টাকা জমিয়ে ছিল, তাই ও দিয়ে দিতে প্রস্তুত হল। ধনিয়া হরি দুজনের চোখেই ছিল, কৃতজ্ঞতা, সন্দেহ, লজ্জা। নোহরীকে যতটা খারাপ ভাবত, ততটা খারাপ তাহলে নয়! কিন্তু নোহরী ঠাট্টা করছে নাতো?

নোহরী বললে, কত টাকা চাই?

হরি বললে, তুমি কত দিতে পার?

একশ' টাকায় চলবে?

একশ' টাকায়ও চলে, পাঁচশ'তেও চলে। যেমন ইচ্ছা।

বেশ, আমার কাছে দু'শ টাকা আছে। আমি তা দিয়ে দেব।

ওতেই হেসে খেলে চলে যাবে। ঠাকরুণ, তুমি আজ বাঁচিয়েছ। তুমি লক্ষ্মী। সন্ধ্যাবাতির সময় হল। ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। জমি নীল চাদর পরে নিয়েছে। ধনিয়া ভিতর থেকে আগুনের কড়াই নিয়ে এল। সকলে হাত পা সেঁকতে লাগল। দেয়ালের আলোতে কান্তিমতী, সুরসিকা, কুলটা নোহরী তাদের সামনে বসে আছে, যেন ভগবানের আশীর্বাদ। এই সময়ে তার চোখে কি সহৃদয়তা, গালে কত লজ্জা, ওষ্ঠে কেমন সাধু-প্রেরণা।

॥ নয় ॥

শহরে আসার পর গোবর দেখতে পেল, যে আড্ডায় সে নিজের পসরা নিয়ে বসত, তা বেদখল হয়ে গেছে এবং খরিদ্দাররাও তাকে ভুলে গেছে। শহরের ঘর ঝুনিয়ার কাছে পিঁজরার মত মনে হল। শিশুর খেলার জায়গা নেই, খেলা দেবার কেউ নেই, বাতাসে দুর্গন্ধ, শোওয়া বসার পর্যাপ্ত জায়গা নাই, গোবর মজুর আর একাওয়ালাদের সঙ্গে তাস আর জুয়ায় মত্ত থাকত—গোবর শহরের যে মোহন চিত্র এঁকেছিল, নিষ্ঠুর কুঠুরিটি ছাড়া ঝুনিয়া তার কিছুই

পেল না। শিশুটিও ক্রমে যেন তার কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠল। এই চুন্নু একদিন বর্ষার দিনে দাস্ত-বমিতে বিনা চিকিৎসায় মারা গেল। তখন এই পুত্রের স্মৃতি পুত্রস্নেহ অপেক্ষা সজীব হয়ে ঝুনিয়াকে কাঁদাতে লাগল।

গোবর ফিরি করে জিনিষপত্র বিক্রী সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে চিনির কলে চাকরী নিল। মিঃ খান্না প্রথম মিলে উৎসাহ পেয়ে এই দ্বিতীয় কল খুলেছিলেন। গোবর এই কল থেকে যখন ফিরত, তখন তার দেহে একটুও প্রাণ থাকত না। গাঁয়ে পরিশ্রম ছিল, হাসিখেলাও ছিল। এখানে শরীরের মেহনতের ওপর ঐ কলের কোলাহল, ঐ গতি, আর ঝড়ের মত গর্জন বোঝার মত চেপে থাকত। সব শ্রমিকের মতই তাড়ি বা মদে গোবরও তার দৈহিক শ্রান্তি ও মানসিক অবসাদ ডুবিয়ে রাখত। আর ঘরে এসে ঝুনিয়াকে গালি দিত, ঘরের বাইরে বার করে দিত, অথবা পিটত।

এরই মধ্যে আবার নূতন শিশুর আগমনবার্তা পাওয়া গেল। ঝুনিয়া এই বাচ্চা বিয়োতেই মারা যেত। ভাগ্যিস চুহিয়া ছিল। চুহিয়ার দোহারা শরীর, কালো রং, বেঁটে, কুরূপা, বড় বড় স্তন,—স্বামী এক্কা চালাত, নিজে লাকড়ির দোকান করত। যে রাত্রিতে মঙ্গলের জন্ম হল, মাঝরাত্রি পর্যন্ত তো গোবর নেশা করে বেহুঁশ হয়েছিল। তারপর অত রাত্রে দাই কোথায় পাওয়া যায়। চুহিয়াই দৌড়ঝাঁপ করল। তারপর নিজেই সব দায়িত্ব নিয়ে গোবরকে বলল—চারটা ছেলে খসিয়েছে তো সব দাই হয়ে গেছে! তুমি বাইরে যাও তো গোবরধন, আমি সব করে নেব। বারোটা ছেলের মা কি আমি এমনিতেই হয়েছি।

শিশুপুত্রটিকে চুহিয়াই তার বুকের দুধ দিয়ে পালন করতে লাগল। কারণ, ঝুনিয়ার স্তনে দুধ ছিল না।

ঝুনিয়া আর গোবরের মধ্যে কিন্তু বনিবনা ছিল না। শীত এসে গেল। কিন্তু না আছে পরার কাপড়, না বিছাবার। ডাল-রুটি খেয়ে যে দু'চার টাকা বাঁচে, তা তাড়িতে উড়ে যায়। পুরাণো এক লেপ ছিল, তাতেই দুজনে শোয়। তবু যেন দু'জনের মধ্যে এক ক্রোশ ফাঁক। দু'জনে পাশ ফিরে শুয়ে রাত কাটায়।

গোবরের কারখানাতেও একটা না একটা হাঙ্গামা লেগেই থাকত। এবারকার বাজেটে চিনির ওপর ডিউটি ধার্য হয়েছিল। মিলের মালিক এতে মজুরী কমাবার ছুতো পেল। কয়েকমাস ধরে এই মিলে গোলমাল চলছিল। মজদুর সংঘ হরতালের জন্য প্রস্তুত ছিল। মিরজা খুরশেদ ছিলেন সংঘের সভাপতি, আর "বিজলী" সম্পাদক পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ তার সম্পাদক। উগ্র স্বভাবের গোবর স্বভাবতঃই হরতালকারীদের মধ্যে সকলের আগে ছিল। সে মরতে

ভয় পেত না। ঝুনিয়া তাকে খুব বোঝাবার চেষ্টা করেছিল—তুমি ছা-পোষা লোক। তোমার এভাবে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া ঠিক নয়। কে শোনে কার কথা। এইকথা নিয়েই একদিন গোবর ঝুনিয়াকে খুব পিটাল। এই নিয়ে চুহিয়ার সঙ্গেও গোবরের একহাত হয়ে গেল। কিন্তু চুহিয়া মুখরা মেয়ে; গোবর কি তার সঙ্গে পারে?

কলে অসন্তোষ ঘনীভূত হচ্ছিল। মজুররা "বিজলী"র সংখ্যা পকেটে করে ঘুরে বেড়াত। কাগজখানার বিক্রী খুব বেড়ে গিয়েছিল। "বিজলী"র অফিসে সারারাত ধরে হরতালের পরিকল্পনা চলে, আর সকালে পত্রিকায় সে সব খবর বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ তিনগুণ দামে বিক্রী হয়ে যায়। কোম্পানীর ডাইরেকটররাও ওৎ পেতে ছিলেন। হরতাল হলেই ভাল। অনেক বেকার, সস্তায় লোক পাওয়া যাবে। তবে, মজুররা চাইছিল, এমন সময় হরতাল করে, যখন গুদামে খুব অল্প মজুত, আর বাজারে চাহিদা বেশী। কিন্তু ডাইরেকটাররা এই পরিকল্পনাটা ভেস্তে দিলেন। একদিন পুলিশে খবর দেওয়া হল। মজুরেরা যখন সন্ধ্যায় চলে যাবে তখন ঘোষণা করা হল যে মজুরী কমান হল। পুলিশ এসে গেল। মজুরদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হরতাল করতে হল। গুদামে এত মজুত, যে ছয়মাসের আগে ফুরোবে না।

মির্জা খুর্শেদ হাসলেন। যেন কোন মনস্বী যোদ্ধা শত্রুর রণকৌশল দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এক মুহূর্ত চিন্তায় ডুবে থেকে বললেন, আমাদের আছে ন্যায়ের বল। ওরা যাতে নতুন লোক নিতে না পারে, তাই আমাদের দেখতে হবে। এই হবে আমাদের ফতোয়া।

ঠিক হয়েছিল, কোন হিংসার পথ নেওয়া হবে না। কিন্তু ধর্মঘটিরা যখন দেখল যে পঙ্গপালের মত নূতন মজুর মিলের দরজায়, তখন বলপ্রয়োগ ভিন্ন আর কোন পথ রইল না। কিন্তু অপর পক্ষও ক্ষুধার্ত, মরার জন্য প্রস্তুত। দুই দলে তাই ফৌজদারী বেধে গেল। "বিজলী" সম্পাদক পালিয়ে বাঁচল। মির্জা সাহেবকে বাঁচাতে গিয়ে গোবর এমন মার খেল যে তার জীবন সংশয় দেখা দিল।

গোবরকে যখন বাড়ী নিয়ে আসা হল, ওর করুণ চীৎকারে ঝুনিয়ার সমস্ত চৈতন্য শিউরে উঠছিল। সে যেন অকূল পাথারে পড়েছিল। ওর অশ্রু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিল। ঘরে একটি পয়সা ছিল না। এবারেও চুহিয়াই হল রক্ষাকর্ত্রী। ঝুনিয়া তার পা জড়িয়ে ধরে বললে, দিদি, তুমি মায়ের কাজ করলে, আমার তো আর কেউ নেই।

যমে মানুষে যুদ্ধ করে গোবর বেঁচে উঠল কিন্তু শরীর দুর্বল। অনেকদিন ঘরে থাকতে হবে। ঝুনিয়া অর্থোপার্জনের জন্য ঘাস কাটার কাজ ধরল।

গোবরের হাত মুখ ধুইয়ে, ছেলেকে তার কাছে রেখে ঘাস কাটতে যায়। তিন প্রহর পর্যন্ত ক্ষুধাতৃষ্ণা সয়ে ঘাস কাটে। তারপর ঘাস বেচে ও সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরে। কিন্তু এতখানি পরিশ্রম করেও, তার মন প্রসন্ন থাকে। মনে হয় সে যেন দোলনার ওপর বসে গান করছে। সারা রাস্তা সঙ্গী স্ত্রী পুরুষদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করে, ঘাস কাটার সময়ও সকলে মিলে হাস্যকৌতুক চলতে থাকে। অদৃষ্টের জন্য কেউ বিলাপ করে না। জীবনের সার্থকতায়, কঠিন আত্মত্যাগে, স্বাধীন সেবায় যে উল্লাস, তার জ্যোতি ঝুনিয়ার প্রত্যেক অঙ্গে খেলতে থাকে।

এদিকে ভাল হয়েও গোবর কিছুটা উদাসভাবে থাকত। প্রিয়জনের প্রতি অত্যাচারেব জন্য সে অনুতপ্ত ছিল। সে প্রায়শ্চিত্তের জন্য ব্যাকুল হয়েছিল।

মজুরদের হরতাল মিঃ খান্নার বড়ই অন্যায় মনে হতে লাগল। তিনি তো সর্বদাই জনসাধারণের কথা শোনাব জন্য প্রস্তুত। দুবার জেল খেটেছেন, বেশ কয়েক হাজার টাকা লোকসান দিয়েছেন। মজুরদের অভিযোগ তিনি শুনতে প্রস্তুত। কিন্তু অংশীদারদেব ভাল মন্দও তো তাঁকে দেখতে হবে। মজুররা হাত দিয়ে কাজ করে ঠিকই, কিন্তু ডাইরেক্টররা কাজ করে বুদ্ধি, বিদ্যা, প্রতিভা, প্রভাব আর প্রতিপত্তি দ্বারা। তিনি নিজেও তো কম বেতন নেন, মাত্র হাজার টাকা। শ্রমিকদের এসব বোঝা উচিত। এখন মন্দার বাজারে তাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আসলে তারা সন্তুষ্টই। ওদেব কোন দোষ নেই। মূর্খ, ওরা মহামূর্খ। দোষ ঐ ওঙ্কারনাথ আর মীর্জা খুরশেদের। ওঙ্কারনাথ নিজের পত্রিকার কাটতি বাড়াতে চায়। তার যদি মুনাফা বেড়ে যায় সে কি সব কর্মচারীদের বেঁটে দেবে? আর ঐ যে ত্যাগী মির্জা খুরশেদ, একদা লক্ষপতি ছিল। হাজার হাজার মজুর ওর কাছে খাটত। সেকি নিজের খোরপোশটুকু রেখে সব বিলিয়ে দিত? ও তো ইউরোপীয়ান মেয়েদের সঙ্গে ঢলাঢলি করত, মাসে হাজার টাকার মদ খেত, আর ফি বছর ফ্রান্স-সুইজারল্যাণ্ড ঘুরে আসত। আর আজ উনি হয়েছেন মজদুর-প্রেমী!

রায়সাহেবের মতামতের ওপরও মিঃ খান্নার ভরসা নেই। একজন পরিচিত ব্যক্তির অপক্ষপাত বিচারে তাঁর শ্রদ্ধা আছে—তিনি হলেন ডাঃ মেহতা। মিঃ খান্না তাঁরই মতামতের প্রার্থী হলেন। মেহতা তার গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। সব শুনে বললেন, সরকারী ডিউটি বসেছে বলে মজুরদের পাওনা কেন কমাবেন। আপনি কি ভাবেন যে ওরা এতই বেশী পায় যে মাইনে সিকি ভাগ কমালেও গায়ে লাগবে না? ওদের খাবার তো আপনার কুকুরেও খাবে না। আর, আপনার অংশীদাররা এত গরীব নয় যে লাভের অংশ কমে

গেলে মরে যাবে। হ্যাঁ, একটা চাকর হয়তো কমাতে হবে, দুধ, ফল, মাখনের বিল একটু খাটো করতে হবে। কিন্তু, তাকে আধপেটা খেতে হবে না, উলঙ্গ থাকতে হবে না। যারা কেবল টাকা খাটিয়ে বাড়ায়, তাদের চাইতে যারা প্রাণ দিয়ে খেটে দিচ্ছে তাদের দাবী নিশ্চয় বেশী।

স্বার্থলিপ্সু ওঙ্কারনাথ, দায়িত্বজ্ঞানহীন খুরশেদ, আর তাঁর নিজের অকর্মণ্য পত্নী গোবিন্দীও এসব কথা বলে! কিন্তু মেহতা তো পণ্ডিত ব্যক্তি ও দৃঢ়চেতা। মিঃ খান্না এবার একটু মুশকিলে পড়লেন।

এমন সময় মালতী এসে উপস্থিত। খান্নাকে দেখতেই বললে, ও, আপনিও এখানে? আমি আজ মেহতাজীকে খেতে বলেছি! সব জিনিষ নিজে হাতে রেঁধেছি। আপনাকেও নেমন্তন্ন করছি।

খান্নার অদ্ভুত লাগল। মালতী আজকাল নিজে রাঁধছে? সেই মালতী, যে নাকি নিজের জুতো কখনো নিজে পড়ত না, আলোর সুইচটা কখনো নিজে হাতে টিপত না, বিবিয়ানি আর ফূর্তিই ছিল যার প্রাণ।

ঠাট্টা করে বলল, আপনি যখন রেঁধেছেন, নিশ্চয় খেতে হবে। কিন্তু আপনি রান্নায় ওস্তাদ, তা তো জানা ছিল না।

অসঙ্কোচে মালতী বলল, এই যে ইনি আমায় জোর করে রাঁধুনি বানিয়েছেন। এঁর হুকুম কি অমান্য করা চলে? পুরুষ যে দেবতা!

কথাটায় রসিকতা ছিল। উইমেন্স লীগের সেই সভায় মেহতা বক্তৃতা আরম্ভ করেছিলেন এই বলে, "দেবীগণ, আমার এই সম্বোধনে অবাক হবেন না। আপনারা সত্যি এ সম্মানের অধিকারী। কখনো কি শুনেছেন মহিলাদের পুরুষকে "দেবতা" সম্বোধন করতে? পুরুষ দেয় না, 'দেওতা' নয় 'লেওতা', নেয়। পুরুষের কি আছে যে দান করবে? তারা অধিকারের জন্য কলহ করে, যুদ্ধ করে, হিংসায় উন্মত্ত হয়..."

প্রবল করতালি হয়েছিল সভাকক্ষে। সেদিনকার সভানেত্রী মালতী আজ কথাটা ফিরিয়ে দিল। মিঃ খান্না রসিকতাটা উপভোগ করলেন।

চিনির কলের চিমনি এখান থেকে চোখে পড়ে। খান্না গর্বভরে সেদিকে চেয়েছিলেন। এখনই ওঁকে মিলের অফিসে জরুরী সভায় যেতে হবে। এই সমস্যা সমাধানের একটা উপায় চাই।

কিন্তু চিমনীর কাছে এত কিসের ধোঁয়া? দেখতে দেখতে বেলুনের মত সারা আকাশ ছেয়ে গেল। কোথাও আগুন লাগে নি তো?

সহসা চোখে পড়ল রাস্তা দিয়ে হাজার হাজার লোক ছুটে চলেছে। আগুন লেগেছে...খান্নার চিনির কলে আগুন লেগেছে। খান্না মেহতার দিকে চাইলেন, মেহতা খান্নার দিকে। আপশোষ আর আলোচনার সময় নয়।

খান্নার গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। শঙ্কাকুল তিনটি প্রাণী তাতে উঠে বসল। গাড়ী কলের দিকে ছুটে চলল। চৌরাস্তায় পৌছে দেখে লোকারণ্য। লোককে কাছে টানার মন্ত্রশক্তি আগুনের আছে। গাড়ী আর এগোবে না।

মেহতা জিজ্ঞাসা করলেন, আগুনের বীমা করিয়েছেন তো?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে খান্না বললেন, কোথায় আর সময় পেলাম? এই তো লেখাপড়া হচ্ছিল। কে জানত, এমন বিপদ এসে পড়বে।

ওখানেই গাড়ীখানাকে ভগবানের হাতে দিয়ে ওঁরা ভিড় ঠেলতে ঠেলতে কলের কাছে পৌছাল। আগুনের সাগর লোল জিহ্বা মেলে আকাশ পর্যন্ত উথলে উঠেছিল। আর সেই সমুদ্রের নীচে ধোঁয়ায় এমন ছেয়ে গিয়েছিল, যেন শ্রাবণের ঘনঘটা কাজলসমুদ্রে স্নান করে ধরায় অবতরণ করেছে। আর ওপরে যেন দাঁড়িয়ে আছে হিমালয়ের মত উঁচু আগুন—উদ্বেল, কম্পমান। কলের হাতায় লক্ষ লোকের ভীড়। পুলিশ আছে। ফায়ার ব্রিগেড আছে। সেবাসমিতির ভলানটিয়ার আছে। কিন্তু আগুনের ভীষণতায় সকলে যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঐ আগুনের সমুদ্রে পড়ে ফায়ার ব্রিগেডের জলের ছিটে বুদ্বুদের মত উড়ে যাচ্ছে। ইঁট পুড়ছে, গলা চিনির রস চারিদিকে স্রোতের মত গড়াচ্ছে। মাটির ভিতর থেকেও যেন আগুন বেরোচ্ছিল।

হঠাৎ হাওয়ার বেগ এত প্রবল হল যে অগ্নিশিখা দুর্বার বেগে নিচে ছড়িয়ে পড়ল। সমুদ্রে যেন জোয়ার এল। এ ওকে দলিত মথিত করে ছুটতে লাগল। এক হল্কা এসে খান্নার মুখে লেগেছে। মালতী মেহতাকে দুই হাতে ধরে আছে। নতুবা সে নিশ্চয় পড়ে যেত। তিনজনে কোনমতে একটা তেঁতুল গাছের নীচে এসে দাঁড়াল।

মেহতা জিজ্ঞাসা করল, আপনার খুব লাগেনি তো?

খান্না কিছু জবাব দিল না। ওর চোখে মুখে বিক্ষিপ্ত চঞ্চলতা ফুটে উঠেছিল। মেহতা ঘাবড়ে গিয়েছিল। বলল, চলুন, আপনাকে বাড়ী পৌছে দিই। আপনার শরীরটা ভাল নেই।

অট্টহাসি হেসে খান্না বললেন, আমার শরীর খারাপ? কলটা জ্বলে গেল, তাই? এরকম কতগণ্ডা মিল আমি খুলতে পারি। আমার সর্বস্ব আমি এই মিলে ঢেলেছি।···এক ঘণ্টা আগে আমি ছিলাম দশ লাখ টাকার মালিক। জানেন, ঠিক দশ লাখ। আর এখন আমি দেউলিয়া হয়ে গেলাম। শত্রুরা জ্বলবে না, আমায় দেখে হাসবে। জানেন মিঃ মেহতা, আমি নিজের মত ও বিশ্বাস প্রতিদিন হত্যা করেছি। কত ঘুস দিয়েছি, কত ঘুস নিয়েছি। কিষানদের আখ মাপবার জন্য নকল বাটখারা রেখেছি। এসব শুনেই বা কি হবে? কিন্তু আমি বেঁচে আছি কেন? না, খান্না বেঁচে থাকবে না, খান্না

নির্লজ্জ বেহায়া নয়।

বলতে বলতে খান্না নিজের মাথা চাপড়িয়ে কেঁদে উঠল।

মেহতা খান্নাকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনজনে চৌরাস্তায় এসে দেখেন গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। দশমিনিটের মধ্যে গাড়ী কুঠিতে এসে পৌছাল। তিনজনে ঘরে গিয়ে বসল। দরজা খোলার শব্দ পেয়েই গোবিন্দী এসে বললে, আপনারা কি ওখান থেকে আসছেন? রান্নার ঠাকুর তো বড় দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে।

খান্নার মনে এমন ঝড়ের মত আবেগ জন্মাল যেন সে গোবিন্দীর পায়ের ওপর পড়ে তার চোখের জলে পা ভিজিয়ে দেয়। ভারী গলায় বললে, হ্যাঁ গো, আমাদের সর্বস্ব গেছে।

খান্নার ভগ্ন আহত নির্জীব প্রাণ সান্ত্বনার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। জীবনসূত্র ক্ষীণ হয়ে এসেছে বুঝেও রোগী যেমন বৈদ্যের দিকে চেয়ে থাকে, খান্নাও তেমনি ব্যগ্রভাবে গোবিন্দীর কাছে সান্ত্বনা খুঁজছিলেন। সেই গোবিন্দী যাকে এতদিন হরদম্ অপমান করেছেন, সেই যেন আজ দুহাতে বরাভয় বয়ে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। গোবিন্দী খান্নাকে একটি সোফায় বসিয়ে স্নেহকোমল স্বরে বললে, তুমি এত মন খারাপ করছ কেন? টাকার জন্য? দেখ, ঐ ধনে আমাদের কি সুখ ছিল? সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শুধু ঝঞ্ঝাট। হ্যাঁ, মান ছিল। কারণ, লোকে টাকার ভক্ত। কিন্তু, অমন মানে কাজ কি? ভাল লোকে টাকার কাছে মাথা নোয়ায় না। ভাল লোক খোঁজে খাঁটি লোক। আমি ভুল বলছি না তো মেহতাজী?

মেহতা যেন স্বর্গের স্বপ্ন দেখছিলেন। চমকে উঠে বললেন, ভুল? জ্ঞানী লোকেরা বহুদিনের সাধনায় এসব কথা বলে।

গোবিন্দী বললে, আমার তো আনন্দ হচ্ছে, তোমার মাথা থেকে টাকার ভার নেমে গেছে। তোমার ছেলেরা এখন মানুষ হবে, অহঙ্কার আর স্বার্থের পুতুল নয়। ঈশ্বর আজ তোমাকে সব দিকে বঞ্চিত করে পবিত্র, উন্নত জীবনের পথ খুলে দিয়েছেন···

গোবিন্দীর কৃশ বিবর্ণ মুখে এক জ্যোতি ফুটে উঠল। ওর এতদিনের মূক সাধনা আজ যেন প্রগলভ হয়ে উঠেছে। মেহতা ভক্তি শ্রদ্ধাভরা চোখে এঁকে দেখছিলেন। খান্না মাথা নীচু করে ছিলেন। আর মালতী লজ্জিত হয়ে ভাবছিল, গোবিন্দীর মন কত উঁচু, বিশাল। এতদিন ও তাকে ভুল বুঝে এসেছে।

একদিন গ্রামে খবর রটে গেল যে নোহরী জুতো মেরে ভোলার মাথায় টাক করে দিয়েছে। হরি এমন কথা জীবনে শোনে নাই। ওই এক নোহরী, আর এদিকে চামারণী সিলিয়া। দেখতে শুনতে ওর চেয়ে লাখ গুণ শ্রেষ্ঠ। মতই এর নাম ধরে বসে আছে, অথচ, সেই জানোয়ারটা একবার ডেকেও জিজ্ঞাসা করেনা। কে জানে, ধনিয়া মারা গেলে হরিরও হয়তো আজ এই দশা হত! মৃত্যুর কল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই হরির মানস নেত্রের সামনে এসে ধনিয়া দাঁড়ায়। সেবা ও ত্যাগের দেবী। যৌবনের তেজ কিন্তু মোমের মত কোমল হৃদয়। যুবতী বয়সে কম রূপবতী ছিল না। নোহরী তার কাছে কি। চলত যখন, তখন মনে হত রানীর মত চলেছে। পাটেশ্বরী ঝিঙ্গুরী তখন ওর দরজায় চক্রাকারে ঘুরত। হরি এদের সন্ধানে থাকত, কিন্তু, কলহের সূত্র খুঁজে পেতনা। আর তেজস্বিনী ধনিয়ার সামনে মন্দভাবে মুখ তুলে দাঁড়ায়, সাধ্যি কার!

সহসা সেদিন মাতাদীন এসে একথা সেকথার পর হরিকে দুটি টাকা দিল। অনেক খরচ করে দাতাদীন পুত্রের জাত উদ্ধার করেছিল। ইদানীং মাতাদীন একমাস ম্যালেরিয়ার ভুগে উঠল। একদিন তো নাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল। তখন থেকেই ওর ধারণা হয়েছিল সিলিয়ার ওপর অত্যাচারের এই সাজা। সিলিয়াকে যখন ঘর থেকে বের করে দেয় তখন সে গর্ভবতী। তার একটুও দয়া হয় নি। পুরো গর্ভ নিয়ে সিলিয়া মজুরী করছিল। টাকা দুটি সিলিয়াকে দেবার জন্য সে হরিকে বলল।

হরি বললে, তুমি নিজে গিয়ে দাওনা।

মাতাদীন দীনভাবে বলল, কোন মুখে ওর কাছে যাব, মাহাতো? তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে দিও, ও যেন আমায় মাপ করে। এ ধর্মের বাঁধন বড় কড়া।

সন্ধ্যাবেলা টাকাটা পেয়ে সিলিয়া যেন তপস্যার বর পেল। দুঃখের ভার তো ও একাই বইতে পারে, কিন্তু, সুখের ভার একা বহন করা যায় না। প্রাণের সখী সোনাকে কথাটা বলার জন্য ওর প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠল। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে খুব আদর করল। এখন এই ছেলেকে দেখে ওর লজ্জা বা গ্লানি নয়, গর্ব হচ্ছিল। ওকে ঘরে রেখে সিলিয়া সোনারীর পথ ধরল। কার্তিকের রূপালী জ্যোৎস্না প্রকৃতির ওপর মধুর সঙ্গীতের মত

বিরাজ করছিল। সিলিয়া নদীর ঘাটে এসে দেখে, ডোঙা ওপারে বাঁধা। মাঝির দেখা কোথাও পাওয়া গেলনা। চাঁদ গলে যেন নদীর মধ্যে বয়ে চলেছিল। একমুহূর্ত সিলিয়া ভাবল। তারপর নদীতে নামল।
মাঝনদীতে বুকজল। নদীতে স্রোত ছিল। তীরে পৌছে কাপড়ের জল নিংড়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে সিলিয়া চলল। চারদিক নিঝুম। গাঁয়ের কিষাণেরা সন্ধ্যা হতেই যে যার মত শুয়ে পড়ে। এখন সিলিয়ার মনে সঙ্কোচ হতে লাগল, এত রাত্রে ওকে দেখে সোনা কি বলবে। মথুরার ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। সেই দরজার সামনে তখনও ধুনিতে আগুন জ্বলছিল। সিলিয়া সেই আঁচে গায়ের কাপড় সেঁকতে লাগল।
হঠাৎ দরজার খিল খুলে মথুরা বাইরে এল। সিলিয়া তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় দিল। মথুরা অবাক হয়ে বললে, এত রাত্রে তুই? মথুরা লম্পট ছিল না। কিন্তু, সময়টা অন্ধকার, স্থান নির্জন, আর সিলিয়ার যৌবন দেখে ওর চিত্ত চঞ্চল হয়েছিল। দু'এক কথায় সে ওর হাত ধরল। সিলিয়া এক হেঁচকানিতে হাত ছাড়িয়ে নিল। সোনা ভেতর থেকে ডেকে বলল, ওখানে কার সঙ্গে কথা বলছ?
সিলিয়া পিছিয়ে গেল। মথুরা এগিয়ে আঙিনায় এসে বলল, তোমাদের গাঁ থেকে সিল্লী এসেছে।
মথুরার পিছুপিছু ও আঙিনায় এল। সোনা আজকাল কত আরামে থাকে। বারান্দায় খাটিয়া আছে, তার ওপর সুজনীর নরম বিছানা পাতা। ঠিক যেমনটি থাকত মাতাদীনের চারপাইএর ওপর। তাকিয়া আছে, লেপ আছে। আঙিনায় আয়নার মত জ্যোৎস্না। এক কোনে তুলসী মঞ্চ, বারান্দায় অন্য কোনে গরু বাঁধা। সোনার গায়ের রঙ এখন কাঞ্চন বর্ণ। মুখের ওপর গৃহিনীত্বের গরিমার সঙ্গে যুবতীর হাস্যময়ী কান্তিও আছে। সিলিয়া মুহূর্তের জন্য মন্ত্রমুগ্ধবৎ হয়ে গেল। এই সেই সোনা, যে শুকনো শরীর নিয়ে এলো চুলে ঝুঁটি বেঁধে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াত। আজ সে ঘরের রাণী। গলার হাঁসুলী আর হার, কাণে কর্ণফুল, সোনার মাকড়ি, হাতে চাঁদির চুড় ও কঙ্কণ, চোখে কাজল, সিঁথিতে সিঁদুর। সিলিয়ার এ কল্পনার স্বর্গ। কিন্তু ও খুশী হলনা। সোনা কত অহঙ্কারী হয়ে গেছে। যে সোনা সিলিয়ার গলা জড়িয়ে ঘাস কাটত. সে আজ ওর মুখের দিকেই তাকাতে চায় না। সে ভেবেছিল, সোনা তার গলা ধরে একটু কাঁদবে, আদর করে তাকে বসাবে, খাওয়াবে, গ্রামের এর ওর তার খবর জিজ্ঞাসা করবে, সোহাগরাত ও মধুর মিলনের কথা বলবে। কিন্তু, সোনার মুখে ভাবের লেশমাত্র নাই। সোনা রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করল, এ রাত্রে কি মনে

করে, সিল্লো ?

এখানে আসার জন্য সিলিয়ার অনুশোচনা হতে লাগল।

বাস্তবিক পক্ষে এটা ছিল সোনার প্রেমক্রীড়া ও হাস্য বিলাসের সময়। এসময়ে এসে সিলিয়া যেন ওর মুখের থালা কেড়ে নিয়েছিল। ওর মনে মনে সন্দেহ হচ্ছিল, সিলিয়া নিশ্চয়ই মথুরার সঙ্গে দেখা করার জন্য এসেছে। সোনার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় পাপ ছিল, কোন পুরুষের পরস্ত্রীর দিকে আর কোনও স্ত্রীর পরপুরুষের দিকে তাকান। চুরি, হত্যা, জাল—কোন অপরাধই এত ভীষণ নয়। ছোট বেলায় দেখেছে হরির তুলসী ওঁড়য়াইনের দোকানে যাওয়া নিয়ে কতদিন ধনিয়া গোঁসা করে থেকেছে, বাপের বাড়ী চলে গেছে। এই মনোবৃত্তি সোনার মধ্যে আরও তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল। বিশেষত, বিয়ের পর এই চিন্তা ওর কাছে ব্রতের রূপ ধারণ করেছে।

সোনার আচরণে বন্ধুত্ব বা আতিথেয়তার চিহ্নমাত্র ছিলনা। সে কটু কথা বলে, কাটারি দিয়ে আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে সিলিয়ার মুখ থেকে মথুরার হাত ধরার কথা বের করে নিল। অনেক দিব্যি কেটে সিলিয়া কিন্তু বলল, স্বপ্নেও মথুরার প্রতি তার কোন খারাপ দৃষ্টি নেই। তবু সোনা কটু কথা বলতেই থাকল। বলে দিল, তুই চলে যা, তোর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই।

সিলিয়া ধীরে ধীরে উঠল। নিজেকে সামলিয়ে নিল। মনে হল, ওর কোমর ভেঙে গেছে। মুহূর্তের জন্য সাহস সঞ্চয় করল। কিন্তু, নিজের সাফাই ও কত দেবে ? ও এক একটা পা ফেলছে, যেন সামনে গভীর খাদ।

মথুরা অপরাধীর মত অদূরেই দাঁড়িয়েছিল। বলল, এসময় কোথা যাও, সিল্লী ?

সিল্লো জবাব দিলনা। মথুরাও আর কিছু বলল না।

সেই রূপালী চাঁদ এখনো বিদ্যমান আছে। নদীর ঢেউ এখনো চাঁদের কিরণে স্নান করছে। আর সিলিয়া পাগলের মত, স্বপ্নের ছায়ার মত নদীর মধ্যে চলে যাচ্ছে।

মেহতার জীবন এতকাল পর্যন্ত পড়া আর চিন্তায় কেটেছে। সব কিছু পড়ে শুনে আত্মবাদ আর অনাত্মবাদ খুব ঘাঁটাঘাঁটি করে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি এই দুই এর মধ্যে যে আছে সেবামার্গ—তাকে কর্মমার্গও বলতে পারা যায়—তাই কেবল জীবনকে পবিত্র আর উন্নত করতে পারে। আর মালতীও মেহতার এই নূতন সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। মালতী আজকাল সর্বত্র বিনা ভিজিটে গরীবের ঘরে রুগী দেখে বেড়ায়। অবশ্য সাজসজ্জা, রং, পাউডার এখনও ও ছাড়ে নাই। আজকাল এক একদিন ওরা দুজনে

গ্রামের দিকে চলে যায়। তাদের কুটীরেই কখনো রাত কাটায়। একদিন ওরা ঘুরতে ঘুরতে সেমারীতে এসে উপস্থিত। হরি দরজায় বসে তামাক খাচ্ছিল। মেহতা ওকে দেখেই চিনতে পারল—মনে আছে, সেবার আমরা রায় সাহেবের বাড়ী এসেছিলাম, আর ধনুর্যজ্ঞ পালায় তুমি মালী সেজেছিলে ?

হরির বিলক্ষণ মনে ছিল। আদর আপ্যায়ন হল। সিলিয়া ছেলে কোলে কি কাজে যাচ্ছিল। মালতী ওকে কোলে নিয়ে আদর করতে থাকল। তারপর আরও মেয়েরা এল। মালতী সন্তান পালন আর শিশু শিক্ষা সম্বন্ধে বলতে থাগল। মেয়েরা মন দিয়ে শুনতে লাগল। মালতী অসুস্থ শিশুদের ওষুধ দিল। কিন্তু, আসল তো খাদ্য। মালতী শুনে অবাক হল যে এরা ঘি দুধ খেতে পায়না। ওর শুনে খুব দুঃখ হল যে যারা পরিশ্রম করে সব উৎপন্ন করে, তারাই পেট পুরে খেতে পায়না। মালতী তখন মেয়েদের অধিকারের দাবীতে লড়াই করার জন্য, নিজেদের সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা ত্যাগ করার জন্য বুঝিয়ে বলতে লাগল। ওরা শ্রদ্ধা সহকারে সব শুনছিল। ওদের শ্রদ্ধা দেখে ওর সেবার প্রেরণা আরও বেড়ে যাচ্ছিল, এবং ওর নিজের অলঙ্কার, সজ্জা, সুগন্ধ সব যেন ওকে লজ্জা দিচ্ছিল। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। ওর কথা শুনে মেয়েদের আশ মেটে নাই। ওরা ওকে একরাত্রি থাকার জন্য নিমন্ত্রণ জানাল। এবং সে নিমন্ত্রণও স্বীকার করে নিল।

মেহতা সাহেব খাটিয়ার উপর বসে আসব জমিয়ে কিষাণদের কুস্তি দেখছিল। এমন সময় দেখল গাঁয়েব কয়েকটি লোকের সঙ্গে একটি শিশুকে কোলে নিয়ে মালতী এমনভাবে চলেছে যেন সে ওদেরই একজন। মেহতার হৃদয় আনন্দে ভরে গেল। মালতী এই একপ্রকার নিজের ধরণে মেহতার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল। মালতী যেন অনাহূত অতিথির মত ওর দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে, আর মেহতা তাকে স্বাগত জানিয়েছে। এর মধ্যে প্রেম নেই, আছে শুধু পৌরুষ। মেহতা চেয়েছিল, গোবিন্দীর পথ থেকে মালতীকে সরিয়ে আনতে। ও জানত, মালতী এক পা শক্ত না করে, অন্য পা তুলবে না। তাই এভাবে সে মালতীকে জড়াচ্ছিল এবং এও বুঝেছিল যে মালতীর সঙ্গে ছলনা করে ও নীচতার পরিচয় দিচ্ছে। এর জন্য ওর ধিক্কারের সীমা ছিল না। কিন্তু, আজ উজ্জ্বল অন্তরেব পূর্ণ দীপ্তিতে ওর সঙ্গে সে একাত্মতা অনুভব করল। গাঁয়ের চারদিক ঘোরা শেষ করে মালতী যেই ফিরল, অমনি সে ওকে নিয়ে নদীর পারে চলল। কি কারণে যেন আজ মালতীর বুক দুরু দুরু করছিল। মেহতার মুখে এক বিচিত্র জ্যোতি আর কামনা ফুটে উঠেছিল।

নদীর ধারে কে যেন রূপার চাদর বিছিয়ে রেখেছে। রত্ন-অলঙ্কারে সেজে নদী

তারাদের, ঘুমে ঢলে পড়া গাছগুলিকে আর চন্দ্রকে নৃত্য দেখাচ্ছে। এই মোহন শোভায় মেহতা যেন পাগল হয়ে গেল। মালতী সাবধান করে বলল, জলের মধ্যে দাঁড়িও না, ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

জল ছিটাতে ছিটাতে মেহতা বলল, আমার তো ইচ্ছে হচ্ছে সাঁতার দিয়ে নদীর ওপারে চলে যাই।

না, না, জল থেকে উঠে এস। আমি যেতে দেব না।

তুমি আমার সঙ্গে যাবে না?

আমি তো সাঁতার জানি না।

আচ্ছা এসো, একটি নৌকা বানাব, তাতে বসে চলে যাব।

ছুটোছুটি করে ঝাউডাল আর খড় এনে হাত কেটেকুটে মালতীর বারণ না শুনে মেহতা বালির বিছানায় বসে বসেই এক ভেলা বানিয়ে ফেলল। ফাঁকে ফাঁকে পাতা ভরে দিল যাতে জল না ওঠে। ব্যস, নৌকা হয়ে গেল প্রস্তুত। ততক্ষণে রাত্রি আরও স্বপ্নময় হয়েছে।

জলে নৌকা ভাসিয়ে মালতীর হাত ধরে মেহতা বলল, এসো বসো।

শঙ্কিত মালতী বলল, দু'জনের ভার সইবে তো?

দার্শনিকের হাসি হেসে মেহতা বলল, যে নৌকায় বসে আমরা জীবন কাটাই, তা কি এর চেয়ে বেশী মজবুত, মালতী? কিসের ভয়?

নাঃ। ভয় আবার কি তুমি সঙ্গে থাকতে?

দুজনে ঐ ঝাউয়ের ভেলার ওপর বসল। আর মেহতা ভেলা বাইতে সুরু করল। ভেলা ডগমগ করে জলের মধ্যে ভেসে চলল।

ভয়ের মধ্যে একটু অন্যমনস্ক হবার জন্য মালতী বলল, আচ্ছা, তুমি তো চিরকাল শহরে কাটালে। গ্রামের জীবন তোমার অভ্যাস হল কিভাবে? আমি তো কিছুতে পারতাম না এরকম ভেলা বানাতে।

অনুরক্ত নয়নে মেহতা ওর দিকে চেয়ে বললে, এটা বোধহয় আমার পূর্বজন্মের সংস্কার। প্রকৃতির স্পর্শে যেন আমি নূতন জীবন পাই।

ভেলা কখনও সোজা, কখনো বাঁকা, কখনো ঘুরপাক খেতে খেতে ছুটছিল। সহসা মালতী বলল, আমি এক এক সময় ভাবি কি জানো? আমি যদি কোনদিন তোমার জীবনে না আসতাম?

ওর হাতখানি নিজের হাতে নিয়ে মেহতা বলল, নিশ্চয় আসতে। কতবার আসছ, আবার একঝলক সৌরভের মত, কল্পনার ছায়ার মত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছ। আমি ছুটে যাচ্ছি, আর তুমি বারবার পালিয়ে যাচ্ছ।

তীব্র আবেগে মালতী বলল, তুমি কখনো বুঝতে চেয়েছ, কেন এমন হয়?

হাঁ মালতী, অনেক ভেবেছি। বারবার ভেবেছি।

কি মনে হয় তোমার ?

কি জান ? আমি যে ভিত্তির ওপর নিজের জীবনের গৃহ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি, তা স্থির নয় চঞ্চল। সে গৃহ প্রাসাদ নয়, ছোট্ট কুটির। কিন্তু তারও ভিত্তি তো চাই একটা স্থির আধার।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মালতী অভিমান ভরে বলল, এ তোমার বৃথা আক্ষেপ। তুমি আমাকে বার বার পরীক্ষকের চোখে দেখেছ, প্রেমের চোখে দেখনি। তুমি আমাকে পরীক্ষা করেছ, আর আমাকে অস্থির, চঞ্চল ভেবে দূরে সরে গেছ। কেন আমি এমন অস্থির, চঞ্চল ? কারণ আমি এমন ভালবাসা পেলাম না যা আমাকে অচঞ্চল করে দেয়। আজ আমি যেমন সঁপে দিয়েছি, তুমিও যদি তেমন আত্মসমর্পণ করতে পারতে, তবে দেখতে আমার বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিযোগ থাকত না।

মালতীর এই অভিমান উপভোগ করে মেহতা বললে, তুমি আমায় কখনো পরীক্ষা করোনি ?

কখনও না।

তা হলে তোমার ভুল হয়েছে।

তা হোক, সেজন্য আমার দুঃখ নেই।

মালতী, এটা ভাবুকতার কথা নয়। ভালবাসার আগে আমরা সবাই যাচাই করে নিই। তুমিও নিশ্চয়ই নিয়েছ অজ্ঞাতসারে। আমি প্রথম দিন থেকেই তোমার আত্মার সন্ধান করেছি। আর আজ বলছি মালতী, তোমার হৃদয়ের গভীরে যখনই আমি নামতে পেরেছি, আমার রত্নলাভ হয়েছে। আমার ভিতরে তুমি কি দেখেছ তা অবশ্য জানি না।

এতক্ষণে ওরা নদীর অন্যপারে এসে পড়ল। চরের উপরকার বালির বিছানায় বসে মেহতা আগেকার কথার খেই ধরে বলল, আজ ঐ কথা জিজ্ঞাসা করব বলেই তোমাকে এখানে নিয়ে এলাম।

মালতী কম্পিত স্বরে বলল, এখনও কি তা তুমি জান না ?

না। তার কারণ, আজ আমি তোমাকে আমার যে রূপটা দেখাব, তুমি কখনোও দেখনি। আচ্ছা ধর, আজ তোমায় বিয়ে করে কাল যদি তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করি, তুমি কি করবে ?

আমি তো তার কোন সম্ভাবনা দেখিনা।

তবু, সংসারে কিছু অসম্ভব তো নয়।

তবে, আমি তার কারণটা খুঁজে বার করে সরিয়ে দেব।···জানিনা···হয়তো বিষ খাব।

কিন্তু, তুমি যদি আমায় জিজ্ঞাসা কর, আমার জবাব হবে অন্যরকম।

মালতী ভয়ে ভয়ে বলল, বল, শুনি।

আমি তোমায় আগে মেরে ফেলব, পরে নিজে মরব।

মালতীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত শিউরে উঠল। সে কাঁপুনি লুকোতে ও জোরে হেসে উঠল। মেহতা বলল, তুমি হাসছ যে?

আমার মনে হয় না, তুমি এমন হিংসাবাদী।

না মালতী, এ বিষয়ে আমি আস্ত পশু। প্রেম শান্ত গাভী নয়, রাগী খুনে রক্তপিপাসু বাঘ।

মালতী চোখে চোখ রেখে বলল, প্রেম যদি খুনে বাঘ হয়, আমি তার থেকে দূরেই থাকব। আমার মতে প্রেম সন্দেহের ওপরে, প্রেম দেহের টান নয়, আত্মার।

মালতী উঠে নদীর দিকে পা বাড়াল। মালতী নিজেকে মেহতার কাছে যোগ্য প্রমাণ করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেনি। কিন্তু, আজ যখন সে দেখতে পেল যে আশার দ্বার পর্যন্ত এনে মেহতা এমন এক প্রেমের আদর্শ তুলে ধরেছে, যে প্রেমে সমর্পণ নেই, যে প্রেমে হিংসা-দ্বেষের রাজত্ব, তখন ও প্রচণ্ড ধাক্কা পেল।

মেহতা একটু লজ্জিত হয়ে বলল, মালতী, এস, আর একটু বসি।

ও বলল, না, এবার ফিরতে হবে। অনেক দেরী হয়ে গেছে।

ডাক্তার মেহতা ছিল পরীক্ষক, হয়ে গেল পরীক্ষার্থী। কয়েক মাস মালতী আর তার কাছে আসেনি। মেহতার ভয় হতে লাগল, মালতীকে না হারিয়ে ফেলে। কাঁদারই সে ওর খোঁজে গেল, কিন্তু মালতীকে পাওয়া গেল না। কিন্তু, কতদিন আর দূরে থাকা যায়? মেহতা বেহিসেবী, আত্মভোলা, আদর্শবাদী। ক্রমে সে দেনা, বাড়ী ভাড়ার তাগাদা আর আদালতের শমনে অসহায় হয়ে পড়ল। তখন, একদিন মালতী এসে অনায়াসে তার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করল, তাকে নিজের বাংলোয় নিয়ে এল। ওকে দু'খানা বড় বড় ঘর দিল। বাগান করার জন্য বাড়ীর হাতা ছেড়ে দিল, আর ওর আহারাদির ব্যবস্থাও নিজের সংসারের মধ্যে করে নিল। মেহতার জন্য জিনিষপত্র ছিল না, কিন্তু, কয়েকগাড়ী বই ছিল। এইসব নিয়ে সে মালতীর সংসারে চলে এল। তার হিসাবপত্রের ভার মালতীই নিয়ে নিল এবং তার সমস্ত অপাত্রে দানখয়রাতগুলি বন্ধ করে দিল।

মালতী ইতিমধ্যে গোবরকে মালী নিযুক্ত করেছিল। ঝুনিয়া ওর কাছে আসত, সঙ্গে আসত মঙ্গলও। মঙ্গলের ওপর মালতীর টান পড়েছিল। একদিন মঙ্গলের জ্বর হল। মালতী তখন ঝুনিয়াকে নিজের বাড়ীতেই নিয়ে

এল। চার দিনের দিন শিশুর গুটি দেখা গেল। গোবর তখনও সেই আঘাতের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেনি, এবং ঝুনিয়াও সারাদিনের খাটনির পর ক্লান্ত থাকত। অসুখের আধুনিক চিকিৎসায়ও ওদের উৎসাহ ছিলনা। অতএব, মালতী শিশুটির দিবারাত্রি পরিচর্যার ভার নিজেই নিল।

এতদিন শিশুটির প্রতি মেহতার কোন বিশেষ অনুরাগ ছিলনা। কিন্তু, যখন মঙ্গলের বসন্তের গুটি দেখা দিল, মেহতারও খুব ভাবনা হল। সর্বদা ঘরে গিয়ে শিশুটিকে দেখে আসত। দেখে কষ্ট হত। কিন্তু, এ ব্যাপারে তার কিছুই করার ছিলনা। মালতী কোমল হাতে তাকে ওঠায়, কাঁধে ফেলে ঘরে পাইচারী করে, কেমন আদর করে ভুলিয়ে দুধ খাওয়ায়,—মালতীর এই বাৎসল্য ওকে মেহতার চোখে অনেক ওপরে উঠিয়ে দিয়েছিল। মালতী শুধু রমণী নয়, মাতাও বটে। যেমন তেমন মা নয়, পরের ছেলেকেও নিজের করতে পারে, সে বিশ্বধাত্রী। মালতীর বাৎসল্য, অদম্য মাতৃভাব দেখে মেহতার চোখে জল আসত। মাঝে মাঝে সে আপন হাতে মালতীকে সাহায্য করত। তার অনুরাগ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল।

দুই সপ্তাহে মঙ্গল ভাল হয়ে গেল। মুখের দাগগুলি অবশ্য গেল না। মালতী সেদিন আশপাশের ছেলে পিলেদের মিঠাই খাওয়াল। এই ত্যাগের জীবনে কত আনন্দ, তা অনুভব করল। এখন ওর যত উল্লাস, ভোগ-বিলাসের জীবনে কখনো তেমন হয়নি। এখন সেই সব ভোগ-লালসা ফল উদ্গমের পর শুকিয়ে যাওয়া ফুলের মত ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল।

যেদিন থেকে মেহতা এই বাংলোয় এসেছে, সেইদিন থেকে বন্ধুরা মনে করে, এ বিবাহের প্রস্তুতি, শুধু অনুষ্ঠানের অপেক্ষা। মেহতাও এই স্বপ্ন দেখছিল। মেহতা ভেবে চিন্তে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌচেছে যে মালতী বিনা সে অন্ধ, মালতীই তাকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। আজকাল মেহতার বেদনায় দুঃখে মালতীই ছিল শান্তি। ও অনেক সময় অবাক হয়ে ভাবত, মালতীর হাতে কি আছে যে কপালে ছোঁয়ালেই সব যন্ত্রণা চলে যায়। কখনো শরীর অসুস্থ হলেই সে চাইত মালতী তার পাশে বসুক। কিন্তু, মালতীর সে পরিপূর্ণ সময় ছিলনা, ওর ছিল বাইরের অনেক কর্তব্যের ডাক। মালতী তখন নারীত্বের সেই উচ্চ আদর্শে পৌচেছে যেখানে ও অনেক উর্দ্ধে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত চোখে পড়ে।

মেহতা তিন বছরের চেষ্টায় এক বই লিখেছিল। তাতে সে সংসারের সমস্ত দর্শন তত্ত্বের সমন্বয় করেছিল। এ বইটি সে মালতীর নামে সমর্পণ করেছিল। ইংলণ্ড থেকে যেদিন তা ছাপা হয়ে এল, আর মেহতা মালতীকে তার একখণ্ড উপহার দিল, সেদিন ও বিস্মিত এবং দুঃখিত হয়ে বলল, এ তুমি কি করেছ,

আমি যে এর উপযুক্ত নই।

মেহতা সে কথায় আমল না দিয়ে বলল, মালতী, তুমি দেবী।...তোমার কাছে আমার একটা প্রার্থনা ছিল। তুমি কি তা মঞ্জুর করবে, মালতী?

আমার কাছে তো তোমার চাইবার কিছুই নেই। আমি নিজেকে তোমার কাছে সমর্পণ করেই বসে আছি। সংসারে তোমার চেয়ে আপন আমার আর কেউ নেই। তুমি আমার পথপ্রদর্শক, আমার গুরু, আমার দেবতা।

কথাগুলি বলতে বলতে মালতীর চোখে জল এসেছিল। মেহতা চাইছিল মালতীকে একান্ত নিজের করে পেতে। তাকে ওর জীবন মন্দিরের ঈশ্বরী করে নিতে। কিন্তু মালতী গম্ভীর হয়ে বলল, মেহতা, আমি মাসের পর মাস বিচার করে আসছি। শেষটায় এই স্থির করেছি যে বন্ধুভাবে বাস করা, স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনের চেয়েও সুখের। নিজেদের ছোট্ট সংসার রচনা করে, নিজেদের সুখ দুঃখের মধ্যে ডুবে থেকে, আমরা কি অসীমের কাছে পৌঁছাতে পারব? তোমার মত বিচারশীল প্রতিভাশালীর আত্মাকে আমি এই কারাগারে বন্ধ করতে চাই না। ঈশ্বরের কাছে শুধু প্রার্থনা, তোমার আমার ভালবাসা যেন অটুট থাকে।· বল মেহতা, তোমার কি হুকুম।

মেহতা অভিভূত হয়েছিল। ওর কাছে যেন নূতন জগৎ খুলে গিয়েছিল। সে শুধু বলল তোমার হুকুমই শিরোধার্য মালতী।

আবেগাপ্লুত দুটি নরনারী আলিঙ্গনাবদ্ধ হল।

সিলিয়ার ছেলে রামু এখন দু'বছরের হয়েছে। ও এখন সারা গাঁ ছুটে বেড়ায়। রুটিকে বলে উটি, দুধকে বলে তুত্। চটপট নিজের নাম বলে দেয়, লামু। বাবার নাম বলে মাতাদীন, মার নাম ছিলিয়া। 'দাতাদীন কে হয়' জিজ্ঞাসা করলেই বলে, ও আমার ছালা। দাতাদীনের সঙ্গে ওর এই সম্পর্কটি কে পাখিয়েছে কে জানে?

রূপার সঙ্গে রামুর খুব ভাব। ওকে যেন ছোট্ট একটা খেলনা পেয়েছে। ওকে কাজল পরায়, স্নান করায়, নিজের হাতে খাওয়ায়, কোলে করে ঘুম পাড়ায়। ধনিয়া বলে, তুই সব ছোঁয়াছুঁয়ি করে দিলি। কিন্তু রূপা শোনে না।

মাতাদীন আজকাল মাঝে মাঝেই রামুকে লুকিয়ে আদর করে আসত, কোন দিন কোলে নিত। ধনিয়ার হাতে ওর জন্য দু'একটি টাকা দিয়ে আসত। শাস্ত্রমতে মাতাদীনের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছিল। তবে বিদ্বান পণ্ডিতেরা ওর ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করে নিলেও, সাধারণ লোকে ওর জল খেত না। পাঁজির খবর নিত, দান-দক্ষিণা দিত, কিন্তু বাসন ছুঁতে দিত না। প্রায়শ্চিত্তের হোমাগ্নিতে মাতাদীন ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কার আহুতি দিয়েছিল। এখন সে পাকা চাষী হয়ে

গিয়েছে।

রামু একদিন হঠাৎ মরে গেল। সিলিয়া বাড়ী ছিলনা। শিলাবৃষ্টিতে ভিজে, খেলা করে, শিল খেয়ে রাত্রিতে রামু জ্বরে পড়ল। নিউমোনিয়ায় ভুগে তিন দিনের দিন সন্ধ্যার মুখে সিলিয়ার কোলেই বালকের প্রাণ বেরিয়ে গেল। মাতাদীন সেদিন ধরা দিয়ে ফেলল। হাওয়া বাঁচাবার জন্যই পর্দা। আবার জোর ঝড়ের সময় পর্দা উঠিয়ে রাখতে হয়, যেন ঝড়ের সঙ্গে উড়ে না যায়। রামুর মৃত্যুর পর, মাতাদীন না করল লজ্জা, না বিন্দুমাত্র ভয়। ছেলের মৃতদেহ দুই হাতে তুলে নিয়ে সে একাই দূরে নদীর পারে শ্মশানে নিয়ে গেল।

তারপর একমাস কেটে গেল। সিলিয়া আবার মজুর খাটছে। সেদিন, সন্ধ্যাবেলা পূর্ণিমার চাঁদ হেসে হেসে উদয় হয়েছে। ফসল কাটার শেষে মাটিতে লুটান যবের শীষগুলি বেছে বেছে ঝুড়িতে ভরে ঘরের দিকে রওনা হবে, এমন সময় সিলিয়ার চোখ গেল চাঁদের দিকে। মনের মাঝে সমস্ত ব্যথা আর স্মৃতি যেন জেগে উঠল। স্তন্যধারায় বুকের আঁচল, আর অশ্রুধারায় দু'চোখ ভিজে গেল।

হঠাৎ মাতাদীন সামনে দাঁড়িয়ে বললে, আর কতদিন কাঁদবি, সিলিয়া? কাঁদলেও তো সে আর ফিরবে না।

বলতে বলতে মাতাদীন নিজেও কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

সিলিয়ার উদ্যত ভর্ৎসনা থেমে গেল। গলা পরিষ্কার করে বলল, তুমি এখানে? কাতরভাবে মাতাদীন বললে, এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম তুই বসে আছিস। তাই এলাম।

চলতে চলতে মাতাদীন কত কথা বলছিল। কতবার সে হরির আঙিনায় গেছে, রামুকে কোলে নিয়েছে, খেলা করেছে। গাঁয়ের কাছাকাছি এসে সিলিয়া বললে, এখন তুমি ঘরে যাও। পণ্ডিত যদি দেখে ফেলে?

ঘাড় উঁচু করে মাতাদীন বললে, আমি এখন কাউকে ভয় করিনা। আমি এখন নিজের ঘর তৈরী করে নিয়েছি।

সত্যি? কই, আমি তো দেখিনি।

চল, আজ দেখাব।

দুজনে এগিয়ে চলে। মাতাদীন আগে, সিলিয়া পিছনে পিছনে। হরির ঘরের কাছে এসে মাতাদীন বলে, এই আমার ঘর।

অবিশ্বাস, ব্যঙ্গ, ক্ষমা, আর দুঃখ, সব কিছু স্বরে ঢেলে দিয়ে সিলিয়া বলল, এ তো সিলিয়া চামারণীর ঘর।

দরজার ঝাঁপ খুলতে খুলতে মাতাদীন বলল, এ আমার সিলিয়া দেবীর মন্দির।

সিলিয়ার চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল। বলল, ও, মন্দির! এক ঘড়া জল ঢেলে দিয়ে চলে যাবে বুঝি?

সিলিয়ার মাথার ঝুড়িটি নামাতে নামাতে কম্পিত স্বরে মাতাদীন বলল, না, সিলিয়া, যতদিন বাঁচব, তোর আশ্রয়ে বাঁচব, আর তোর পূজো করব।

সিলিয়া দিয়াশলাই দিয়ে কুপি জ্বালল। একদিকে মাটির ঘড়া, আর এক দিকে উনান। তার পাশে কয়েকটা পিতল আর লোহার চকচকে বাসন। ঘরের মধ্যে পোয়াল বিছান আছে। ঐ হল সিলিয়ার বিছানা। ওই বিছানার শিয়রে রামুর ছোট শয্যাটি যেন কাঁদছে। আশে পাশে পড়ে আছে কয়েকটি মাটি আর কাঠের ভাঙা পুতুল।

মাতাদীন খড়ের উপর বসে পড়ল। বুকের মধ্যে এমন তোলপাড় করছে যে, ইচ্ছে করছে প্রাণ খুলে কেঁদে নেয়। সিলিয়া মাতাদীনের পিঠে হাত রাখল। মাতাদীন ওর হাতখানা বুকে চেপে ধরল। সিলিয়া জিজ্ঞাসা করল, তোমার রান্না করবে কে?

আমার সিলিয়া রাণী।

তাহলে তোমার বামনাই থাকবে কি করে?

আমি বামুন নই, চামার হতেই চাই। যে নিজের ধর্ম পালন করে সেই বামুন। আর যে ধর্মপথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সেই চামার।

সিলিয়া দুই হাতে মাতাদীনের গলা জড়িয়ে ধরল।

॥ এগার ॥

হরির অবস্থা দিন দিন পড়ে আসছিল। জীবনযুদ্ধে তার প্রতিবারই হার হয়েছে, কিন্তু আজ এমন দশা যে আত্মবিশ্বাসও লোপ পেয়েছে। সুদিনের কল্পনা এখন মৃগতৃষ্ণিকার মত দূরে দূরান্তরে অপসৃত, দুরাশা আর মনে জাগে না। পরাজিত রাজার মত এতদিন নিজেকে তিন বিঘা জমির কেল্লায় অবরুদ্ধ করে রেখেছে—অনাহারে, উপবাসে, দুর্নামে, অপমানে এই কেল্লা ছাড়েনি। কিন্তু এবারে বুঝি সে কেল্লাও আর থাকে না। তিন বছরের খাজনা দেওয়া হয় নাই বলে, নোখেরাম জমি বেদখলের নোটীশ দিয়েছে। কোথাও টাকা পাবার আশা নেই, জমি বেদখলি হলে দিন মজুরী করে খেতে হবে। ভগবানের বিধান, রায়সাহেবের কি দোষ? সকলের যে দশা, ওরও তাই হবে। ভাগ্যে যদি সুখই থাকবে, তবে কি ছেলে এমন করে ছেড়ে যায়। একদিন সন্ধ্যাবেলা দাতাদীন এসে বললে, যেভাবেই হোক, বাপ দাদার জমি

তো বাঁচাতেই হবে। উপায় আছে, যদি হরি তা করে।

হরি হাতে স্বর্গ পেল। পণ্ডিতের পায়ে আছড়ে পড়ে বলল, আপনি ছাড়া আমার আর কে আছে মহারাজ। আপনার অনেক পুণ্য হবে। আমি তো আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম।

দাতাদীন বললে, নিরাশ হবার কিছু নেই। জানতো সুখের আর দুঃখের ধর্ম এক নয়! সুখে লোকে করে দান, দুঃখে করে ভিক্ষা। তখন তাই ধর্ম। শরীর যখন ভাল থাকে স্নান আহ্নিক না করে মুখে জল দিই না, কিন্তু যখন অসুখে পড়ি তখন বাসি কাপড়ে খাটে শুয়েই পথ্য খাই। তখনকার যা ধর্ম। আপৎকালে শ্রীরামচন্দ্রও শবরীর উচ্ছিষ্ট ফল খেলেন, লুকিয়ে বালি বধ করলেন। সঙ্কটকালে বড় বড় লোকেরই যখন মর্যাদা চলে যায়, তখন তোমার আমায় আর কথা কি? রামসেবক মাহাতোকে চেন তো?

হরি নিরুৎসাহের ভঙ্গীতে বলল, চিনি মহারাজ।

আমার যজমান। বেশ পয়সাকড়ি আছে। ক্ষেত আছে, তা ছাড়া লেন-দেনের কাজ করে। এমন তেজী লোক দেখিনি। ক'মাস হলো স্ত্রী মারা গেছে, ছেলেপুলে নেই। তোমার রূপার সঙ্গে যদি বিয়ে দিতে চাও, আমি রাজী করাতে পারি। এ মস্ত সুযোগ। মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে, তোমার জমিটুকুও বেঁচে যাবে। খরচখরচাও কিছু লাগবে না।

রামসেবক হরির চেয়ে বছর দুই চারের ছোট হবে। কোথায় ফুলের মত মেয়ে রূপা। কোথায় ঐ বুড়ো হাবড়া। আজ হরির এমনই অবস্থা যে মেয়ে বেচার কথাও শুনতে হয়। অথচ অস্বীকার করার পথ কই? গ্লানিতে ওর মাথা মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ল।

ভেবে দেখি ধনিয়াকে জিজ্ঞাসা করি,—ইত্যাদি বলে হরি আপাতত এড়িয়ে গেল। দাতাদীন বলে গেল, পাঁচ ছ'দিনের মধ্যে জবাবটা দিও। এমন যেন না হয় যে তুমি ভাবতেই থাকলে, আর জমি বেদখল হয়ে গেল।

দাতাদীনের ভয় হরিকে নয়, ভয় ধনিয়াকে। তার নাক বড় উঁচু। মরবে, তবু মর্যাদা ছাড়বে না। তবে হরি যদি হ্যাঁ করে, তবে সেও হয়তো মানবে, কারণ, জমি হারানোও তো অপমানের কথা।

ধনিয়া শুনেই বললে, ওতো বুড়ো। তুমি কেন স্পষ্ট বলে দিলে না, আমরা মেয়ে বেচব না। বুড়োর এই সাহস হল কি করে!

দুইদিন কাটল। দু'জনের মধ্যে এ বিষয়ে কোন কথা নাই। তবে, ইশারায় ইঙ্গিতে কথা চলে। যেমন:

ধনিয়া বলে, বরকনের জোড় মেলে, তবে গিয়ে বিয়ের আনন্দ।

পাগলি, বিয়ে শুধু আনন্দ নয়, এ হল গিয়ে তপস্যা।

রাখ তোমার তপস্যা।

আমি যা বলছি, তাই ঠিক। ভগবান যেমন ভাবে রাখেন, তাইতেই খুশী থাকা—এ যদি তপস্যা না হয় তো কি?

পরদিন ধনিয়া আবার স্থরু করে, ঘরে শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, জা, দেওর—এসব যদি না থাকে তো শ্বশুর বাড়ীর আনন্দ কি?

তুই তো ভরা ঘরেই এসেছিলি, তা তোর কি সুখ হল শুনি?

সব বাড়ীর লোকই কি এক হবে?

তা না তো কি? সব যেন আকাশের দেবী হবে। একলা বৌ কার মন রাখে? সব চেয়ে ভাল একলা থাকা।

ব্যস ঐ পর্যন্ত। তাও ধনিয়ার দিকে পাল্লা হাল্কা হয়ে আসছে। চতুর্থ দিনে রামসেবক মাহাতো নিজে এসে হাজির। এসেছে মস্ত ঘোড়ায় চড়ে, সঙ্গে নাপিত, চাকর, যেন কোন জমিদার। বয়স চল্লিশের ওপরে। কিন্তু বেশ সতেজ, জোয়ান। হরিকে তার কাছে নিতান্ত বুড়ো দেখায়। কি এক মোকদ্দমার তদ্বির করতে যাচ্ছিল। এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মে দুপুরটা এখানেই কাটিয়ে যেতে চায়। সাহুয়াইনের ঘর থেকে ময়দা, ঘি এল। অতিথি তিনজনেই খেল।

দাতাদীন এসে জিজ্ঞাসা করল, কিসের মোকদ্দমা, মাহাতো?

রামসেবক বললে, আর বলেন কেন? মোকদ্দমা একটা না একটা লেগেই আছে। সংসারে ভেড়া বনে থাকলে চলেনা। থানা, পুলিশ, আদালত, আপিল—সব আমাদের রক্ষার জন্য। কিন্তু সবাই লুঠের ধান্দায় আছে। ভগবান করুন, যেন কোন বেইমানী না করি। কিন্তু, নিজের হকের জন্য লড়াই না করাও পাপ। আমি তো দেখছি কিষাণ সবার পায়ের নীচে। পাটোয়ারী বল, জমিদার বল, দারোগা বল,—সবাইকার মরজি জোগাতে হবে। আবার কভরকামের ইনস্পেকটার, অফিসার। খালের ভিন্ন, জঙ্গলের ভিন্ন, তাড়ি-মদের ভিন্ন, কৃষি বিভাগের ভিন্ন। আবার গ্রামসংস্কারক আছে। এত সব হাঙ্গামায় কৃষকের যদি ভাল হত, তবে বুঝতাম। তা নয়, শুধু চাঁদা, সিধা, নজরানা, দস্তুরি, আর এসব না দাও তো জরিমানা! আমি তো গাঁয়ে ঢেঁড়া পিটিয়ে দিয়েছি,—কেউ এরকম দণ্ড দেবেনা, জমিও ছাড়বে না। গাঁয়ের লোক আমার কথা মেনে নিয়েছে, জমিদার যখন দেখলে সবাই এক জোট, ওখন নাচার। ক্ষেত কেড়ে নেবে বললেই তো হয় না। আজকালকার দিনে ঠেকায় না পড়লে কেউ কথা শোনে না। দেখুন, না কাঁদলে মায়ের কাছেও ছেলে দুধ পায়না।

তৃতীয় প্রহর বেলায় রামসেবক চলে গেল। কিন্তু, হরি আর ধনিয়ার মনের

ওপর যে ছাপ ফেলে গেল তা বলার নয়। দাতাদীনের মন্ত্র কাজ করছিল। এবারে যখন দাতাদীন জিজ্ঞাসা করলে তখন কেউই আর ফিরিয়ে দিতে রাজী নয়। ধনিয়া শুধু বললে, বয়সটা বড়ই বেশী। অবশ্য তোমরা যা ঠিক করবে, আমারও তাই মত। কপালে যা আছে তা তো হবেই। লোকটা ভাল।

বলশালী লোকের উপর দুর্বলের যেমন বিশ্বাস জন্মে, হরিরও রামসেবকের উপর কতকটা সে ধরণের বিশ্বাস জন্মাল।

বিবাহের দিন ঠিক হয়ে গেল।

হরির চিঠি পেয়েই গোবর আসার জন্য প্রস্তুত হল। ঝুনিয়ার কিছু আপত্তির কারণ ছিল। কিন্তু, টেঁকেনি। সোনার বিয়েতেও যাওয়া হয়নি, এ কি কম কলঙ্ক। দুই জনেই মালতীর কাছে কথাটা তোলা মাত্র ছুটীই শুধু মিললনা, মালতী রাশি রাশি খেলনা দিল, মঙ্গলকে কত চুমা খেল, আদর করল। শিশু অবশ্য অত আদরের দাম না দিয়ে যে গৃহ দেখে নাই সেখানে যাবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল। ওর কল্পনায় সে ছিল স্বর্গের চেয়েও বিস্ময়কর।

বাড়ীর অবস্থা দেখে গোবরের মন দমে গেল। ও চিরকাল গ্রামে এই অবস্থা দেখে এসেছে। জ্যৈষ্ঠমাস, এখনও গোলায় ফসল মজুদ, কিন্তু কারু মুখে হাসি নেই। এদের তারুণ্য নাই, আশা নাই, চেতনা নাই। গোবর শহরে থেকে শিখেছে ভাগ্যকে মানুষ নিজ হাতে গঠন করে। ওর মনে আজকাল সকলের প্রতি গভীর সমবেদনা এসেছে। আগেকার সে ঔদ্ধত্য নেই। এখন গোবর নম্র, উদ্যোগ পরায়ণ। আজকাল ও হরির হাত থেকে কেড়ে নিয়ে কাজ করে, যেন ও আগেকার দুর্ব্যবহারের প্রায়শ্চিত্ত করছে।

হরিকে গোবর সান্ত্বনা দেয়, এখন সে যেন না ভাবে। মাসে মাসে গোবর টাকা পাঠাবে, এখন কিছুদিন হার বিশ্রাম করুক। হরির মন এক অলৌকিক আনন্দে ভরে ওঠে। কিন্তু বলে, না বেটা, তুমি কেন কষ্ট করবে? তুমি বা এমন কি পাও? রূপা চলে যাচ্ছে। কর্জ তো শোধ হল। এখন তুমি নিজেকে তৈরী কর। তোমাকে এখনই এই ক্ষেতিতে জুড়তে চাই না।

এই সময়টাতে দাতাদীন ইশারায় একটু দূরে নিয়ে গিয়ে কোমর থেকে দু'খানা একশ টাকার নোট বের করে হরির হাতে দিল। টাকাটা নিয়ে হরির হাত কেঁপে উঠল। মাথাও তুলতে পারে না, মুখে শব্দ নেই, ও যেন অপমানের অতল তলে গড়িয়ে পড়েছে। আজ ত্রিশ বছর যুদ্ধ করার পর জীবনে ও হার মানল। এ হার এমন যে ওর মনে হল, কে যেন তাকে

নগরের প্রবেশ পথে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আর যে কেউ নগরে আসে সকলেই ওর মুখে থুতু দিচ্ছে। ও যেন চীৎকার করে বলছে, ভাইসব, আমি দয়ার পাত্র। আমি কোনদিন জ্যৈষ্ঠের লু আর মাঘের বর্ষাকে গ্রাহ্য করিনি। আমার বুক চিরে দেখ, কতটুকু প্রাণ আছে, কি আঘাতে আমি জর্জর, ক্ষতবিক্ষত। জিজ্ঞাসা কর, আমার বুককে—কখনও কি ও বিশ্রাম চোখে দেখেছে, কখনও কি ছায়ার নিচে বসেছে? তার ওপর এই অপমান! আর তাও ও বেঁচে আছে? কাপুরুষ, লোভী, নীচ!

হরির সমস্ত অগাধ বিশ্বাস যা স্থূল আর অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আজ যেন সব টুকরো টুকরো হয়ে গেল!

দুই দিন পর্যন্ত গাঁয়ে খুব ধুমধাম ছিল। বাদ্যভাণ্ড বাজল। গান বাজনা হল। আর রূপা কেঁদেকেটে বিদায় নিল। কিন্তু হরিকে কেউ ঘরের বাইরে আসতে দেখেনি।

গোবর তার আচার ব্যবহারে সবাইকে মুগ্ধ করে রাখল। ভোলা তো তার পায়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। নোহরী তাকে পান খাওয়াল, এক টাকা বিদায় উপহার দিল, আর লখনৌ-এর ঠিকানাও জিজ্ঞাসা করল। নিজের টাকা সম্বন্ধে কোন কথাই বললে না।

দুইদিন পরে যখন গোবর রওনা দেবে তখন হরি ধনিয়ার সামনে সজল নেত্রে সেই অপরাধ স্বীকার করল, যা ক'দিন থেকেই তার প্রাণকে মথিত করছিল। গোবর কোনও রাগের চিহ্ন দেখাল না। শ্রদ্ধার ভাবে বলল, এতে তো অপরাধের কোন কথা নাই বাবা। হাঁ, রামসেবকের টাকাটা শোধ করে দিতে হবে। এ না নিয়ে তুমি কি করতে? তুমি নীতির পথ কখনও ছাড় নাই। এ হল তারই ফল। তোমার জায়গায় আমি থাকলে হয় জেল হত, নয় ফাঁসি কাঠে ঝুলতাম। এ ছাড়া কোন পথই তো ছিল না।

ধনিয়া বৌকে পাঠাতে রাজী হল না, ঝুনিয়াও থেকে যেতে চাইল। গোবর একলাই গেল। হরি তাকে গাঁয়ের বাহির পর্যন্ত পৌঁছে দিল। গোবরকে এর আগে কখনো এতটা ভালবাসেনি। গোবর যখন তাকে প্রণাম করল, হরি কেঁদে ফেলল, যেন আর কখনো দেখা হবে না। হরির প্রাণে উল্লাস, গর্ব, সঙ্কল্প এল। কয়েকদিন আগেকার সেই অন্ধকারের মত অবসাদ ওর কেটে গেল। রূপা শ্বশুরবাড়ীতে খুশী ছিল। যে অবস্থায় ওর বাল্যকাল কেটেছে তাতে পয়সা ছিল সবচেয়ে দামী জিনিষ। আর রামসেবক আধাবয়সী হয়েও জোয়ান হয়ে গেল। তবে সে রূপার স্বামী; জোয়ান, কি আধবয়সী, কি বুড়ো—এ নিয়ে রূপার মনে কোন চিন্তা ছিল না। রূপার বুদ্ধি ছিল অনেক

গভীরে, যুগযুগান্তের সংস্কারে যা গঠিত, যা শুধু প্রলয়ের ভূমিকম্পই নাড়াতে পারে।

শ্বশুরবাড়ির বৈভবের মধ্যে রূপার মন সব-সময়ই বাপের বাড়ির জন্য কাঁদত। সেই গরুর স্মৃতি তার মনে এখনও নবীন, যে অতিথির মত এসেছিল, আর সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গিয়েছিল। সেই স্মৃতি এতদিন পরে আরও মধুর হয়েছিল। এখনও এই নূতন সংসারে তার মমত্ব জমাট বাঁধে নাই। সেই পুরানো সংসার ছিল তার নিজের সংসার। সেখানে সবাই ছিল তার আত্মীয়, তাদের সুখ ওর সুখ, তাদের দুঃখ ওর দুঃখ। রূপা স্থির করল বাপের বাড়ি একটি গরু পাঠিয়ে দেবে। রামসেবককে শুধু জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষা ছিল। ওর প্রার্থনা মঞ্জুর হয়ে গেল। পরদিন গরু গেল। লোক মারফৎ রূপা বলে পাঠাল, বাবাকে বলো, মঙ্গলের দুধ খাওয়ার জন্য পাঠালাম।

হরিও গরু কেনার ফিকিরে ছিল। মঙ্গলের জন্য দুধ দরকার। কিন্তু টাকা পায় কোথায়? ঘটনাচক্রে এক ঠিকাদার রাস্তার জন্য গাঁয়ের অনুর্বর জমিতে কাঁকর তুলতে সুরু করল, আর হরি চটপট আট আনা রোজ হারে মাটি খুঁড়তে লেগে গেল। দু'মাস খাটতে পারলেই ও গরুর পুরো টাকাটা পায়। দিনভর লু চলে। এই রোদে কাজ করে হরির দেহে প্রাণ থাকে না। কিন্তু মনে কোন অবসাদ নেই। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়ে সুতলী কাটে। ধনিয়াও পাগল হয়ে গিয়েছিল। হরিকে এতটা মেহনতে বাধা না দিয়ে নিজেও সঙ্গে বসে বসে সুতলী কাটত। গরু তো নিতেই হবে, রাম সেবকের টাকাটাও শোধ করতে হবে। গোবর বলে গেছে। সে এক মস্ত ভাবনা। গোবরের চিন্তা দু'জনকে ছেয়ে আছে। গোবরের কত আক্কেল হয়েছে, কত ঠাণ্ডা হয়েছে। যাওয়ার সময় পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল।

ক' দিন ধরেই এই কাজ চলছিল। একদিন রাত্রে হীরা এল। জেগে উঠে হরি দেখে, ভাই সামনে দাঁড়িয়ে। বড় বড় চুল, কাপড় ছেঁড়া-খোঁড়া, মুখ শুকনো, শরীরে রক্ত আর মাংসের নাম গন্ধ নাই, যেন লম্বাতেও খাটো হয়ে গেছে। ছুটে এসে হরির পায়ে পড়ল।

সেদিন রাত্রিতেই হরি ধনিয়াকে বলেছিল, আমার মন বলছে হীরা কখনো নিশ্চয় আসবে। হরি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, এ কি চেহারা হয়েছে, হীরা? হীরা কোন কথা না বলে কাঁদতে লাগল।

হরি তার হাত ধরে বললে, কেন কাঁদছ ভাই। লোকের ভুলচুক হয়েই থাকে। কোথায় ছিলে এতদিন।

হীরা কাতর স্বরে বললে, কি বলব দাদা। ব্যস এইটুকু বুঝে নাও, তোমার দর্শন

বাকী ছিল, তাই বেঁচে গেলাম। প্রাণ থাকতে তোমার ঋণ শোধ করতে পারবো না দাদা।

হরি খুশী হল। জীবনের সমস্ত সংকট সমস্ত নৈরাশ্য যেন তার পায়ে লুটাচ্ছে। কে বলে তার হার হয়েছে। এই উল্লাস, এই গর্ব, এই পুলক— এ কি হারের লক্ষণ? এই হারেই তার জয়। এই টুটাফুটা অস্ত্র আজ তার বিজয় পতাকা! হীরা তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে বললে, তুমিও তো খুব রোগা হয়ে গেছ দাদা!

হরি হেসে বললে, এ কি আমার মোটা হবার বয়স?

আজ যখন হরি মাটি খুঁড়তে গেল, তখন গা ভার বোধ হচ্ছিল। কিন্তু চলনে একটা দর্প ছিল যে সংসারে কেউ তার শত্রু নাই। সকাল নটা থেকে লু বইতে সুরু করল। দুপুর না হতেই আগুনের বৃষ্টি আরম্ভ হল। হরি কাঁকড়ের বোঝা খাদ থেকে উঠিয়ে এনে গাড়ি বোঝাই করত। আজ যখন দুপুরের ছুটি হল, তার দম রইল না। এত ক্লান্তি আর কখনো হয় নাই। একজন মজুরের কাছ থেকে নিয়ে একঘটি জল খেল। খালি পেটে জল খাওয়া। আধঘণ্টার মধ্যে বমি হয়ে গেল। মুখের উপর যেন মৃত্যুর ছায়া এসে পড়েছে। সেই মজুরটি বলল, কেমন লাগছে, হরি ভাই?

হরির মাথা ঘুরছিল। বলল, ও কিছু নয়, ভাল আছি।

এই কথা বলতে বলতে আবার বমি হল। আর হাত পা ঠাণ্ডা হতে থাকল। ও ঘাবড়ে গেল। মাথা ঘুরছে কেন? চোখের সামনে যেন আঁধার ঘনিয়ে আসছে, তার চোখ বুজে গেল। জীবনের সমস্ত স্মৃতি জীবন্ত হয়ে হৃদয়পটে আসতে লাগল। কিন্তু, তার ক্রম নেই, স্বপ্নের মত অসম্বদ্ধ। সেই সুখের ছেলেবেলা এল যখন সে ডাংগুলি খেলত, মার কোলে শুয়ে থাকত। আবার দেখল গোবর এসে যেন তার পায়ে পড়ছে। এরপর দৃশ্য বদলে গেল। ধনিয়া কনে সেজে লাল শাড়ি পরে ওকে খাদ্য পরিবেশন করছে। আবার একটা গরু এসে উপস্থিত হল, কামধেনুর মত। সে মঙ্গলের জন্য তার দুধ দুইছিল। সহসা সেই গরু দেবীমূর্তি ধারণ করল, আর···

মজুরটির ডাকাডাকিতেও হরি আর ঝুঁড়ি ওঠাতে উঠলনা।

একঘণ্টার মধ্যে ধনিয়া দৌড়াতে দৌড়াতে এল। শোভা আর হীরা পিছনে পিছনে ছোট খাটিয়াটাকে ডুলির মত বয়ে আনছিল। ধনিয়া হরির গায়ে হাত দিয়ে দেখা মাত্রই ওর বুক কেঁপে করে উঠল। ওর মুখ নিষ্প্রভ হল। কম্পিত কণ্ঠে বলল, তুমি কেমন আছ?

হরি অস্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, তুই এসেছিস গোবর। আমি মঙ্গলের জন্য

গরু এনেছি। ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে, দেখ।

ধনিয়া মৃত্যুর চেহারা জানত। তাকে পা টিপে টিপে আসতে দেখেছে, আঁধির মতও আসতে দেখেছে। তার চোখের সামনে শ্বশুর, শাশুড়ী, দুই ছেলে, গাঁয়ের কত লোক মরেছে। কিন্তু, ধনিয়া নিজেকে মনে মনে সান্ত্বনা দিতে চাইল, লু লেগেছে, এ অজ্ঞান হয়েছে মাত্র।

উদ্গত অশ্রু রুদ্ধ করে বলল, আমার দিকে তাকাও, আমায় চিনতে পারছ না?

হরির জ্ঞান ফিরে এল। মৃত্যু নিকটে এসে গিয়েছিল। আগুন ধক ধক করে জ্বলছিল, ধোঁয়া থেমে গিয়েছিল। ধনিয়াকে সে দুই চোখ ভরে দেখল। দুই চোখের কোন থেকে দুই বিন্দু অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। ক্ষীণস্বরে বলল, আমার কথা মাপ করিস, ধনিয়া। আমি যাচ্ছি। কাঁদিস না ধনিয়া, কতদিন বাঁচিয়ে রাখবি। সব দুর্দশা তো ভোগ হয়েছে, এখন মরতে দে।

হরিকে হীরা আর শোভা খাটিয়াটায় করে গাঁয়ে নিয়ে এল। সমস্ত গাঁ একত্র হল। হরি তার খাটের ওপর পড়ে হয়তো সব কিছুই দেখছে। তার চক্ষুর নির্গত অশ্রু বলে দিচ্ছিল, মোহের বন্ধন ছেড়া কত কঠিন লাগছে। যা সে নিজে করতে পারেনি, তার জন্য দুঃখের নামই তো মোহ।

ধনিয়া সব বুঝেও আশার বিলয়মান ছায়া ধরে রইল। কখনো চোখ বেয়ে জল পড়ছে, যন্ত্রের মত ছুটে কখনো আমসেদ্ধ করে রস তৈরী করছে, কখনো হরির শরীরে যবের ভূষি মালিশ করে দিচ্ছে। কি করবে, পয়সা নেই, না হলে কাউকে পাঠিয়ে ডাক্তার দেখাত।

হীরা কাঁদতে কাঁদতে বললে, বৌ ঠাকরুণ, মনকে শক্ত কর। গোদান করাও, দাদা চলল। ধনিয়া তার পানে তিরস্কারের দৃষ্টিতে চাইল।

আরও কয়েকজনের স্বর কানে এল, গোদান করাও, এখনই—এই মুহূর্তেই—

ধনিয়া যন্ত্রের মত উঠল। আজ ও যে সুতলী বেচেছিল, তার বিশ আনা পয়সা নিয়ে এল। আর স্বামীর ঠাণ্ডা হাতের মধ্যে তা রেখে সম্মুখে দণ্ডায়মান দাতাদীনকে বলল, মহারাজ, ঘরে না রয়েছে গরু, না আছে বাছুর, না আছে টাকা ; এই যে পয়সা রয়েছে এইটেই এর গোদান।

তখনই আছাড় খেয়ে ধনিয়া পড়ে গেল।

জীবনপঞ্জী

[নির্দেশিকা—উপন্যাস=উ, গল্পগুচ্ছ=গ, নাটক=না, প্রবন্ধ=প, জীবনী=জী]

১৮৮০, ৩১ জুলাই : বারাণসী থেকে ৬ মাইল দূরে লামাহিতে জন্ম।

১৮৮৮ : মাতার মৃত্যু।

১৮৯৬ : প্রথম বিবাহ।

১৮৯৭ : পিতার মৃত্যু।

১৮৯৮ : ম্যাট্রিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ।

১৮৯৯ : চুনার গড় মিশন স্কুলে শিক্ষক হিসাবে যোগদান।

১৯০০ : বহরাইচ-এ সরকারী স্কুলে শিক্ষকতা পরে প্রতাপগড়ে বদলী।

১৯০২ এলাহাবাদে সেন্ট্রাল ট্রেনিং কলেজে প্রশিক্ষণলাভের জন্য ভর্তি।

১৯০৩ অক্টোবর থেকে ১৯০৫ ফেব্রুয়ারী : বারাণসীর উর্দু সাপ্তাহিক আওয়াজ-এ-খাল্ক্-এ "আসরারে মা আ বিদ" (উ) ক্রমপ্রকাশ।

১৯০৪ শিক্ষকতার পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিন্দী ও উর্দু সাহিত্যের বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৯০৫ এলাহাবাদ সেন্ট্রাল ট্রেনিং কলেজের সঙ্গে যুক্ত মডেল স্কুলে বদলী। পরে কানপুরে জেলা স্কুলে ইংরেজী শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ।

১৯০৬ বালবিধবা শিবরাণী দেবীর সঙ্গে দ্বিতীয় বিবাহ। "হাম খুর্মা ওয়া হাম সাবাব" (উ) প্রকাশিত।

১৯০৭ প্রথম ছোট গল্প "দুনিয়া কা সবসে আনমোল রতন" এবং "প্রেমা" (উ) ও "কিশ্না" (উ) প্রকাশ।

১৯০৮ "সোজ এ ওয়াতন" (গ) প্রকাশ।

১৯০৯ হামিরপুরে স্কুলসাহেব ডেপুটি সাব-ইনস্পেক্টর পদে নিয়োগ। "সোজ-এ ওয়াতন" (গ) বাজেয়াপ্ত। ৭০০ কপি বই দগ্ধ।

১৯১০ "প্রেমচন্দ" ছদ্মনামে প্রথম উর্দু ছোট গল্প "বড়ে ঘর কি বেটী" "জমানা" পত্রিকার ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশ।

১৯১২ "জলওয়ে ইসার" (উ) প্রকাশ।

১৯১৫ : প্রথম হিন্দী ছোটগল্প "সৌত" হিন্দী মাসিক পত্র "সরস্বতী"তে প্রকাশ। "প্রেম পচিশী" (গ)র প্রথম খণ্ড প্রকাশ।

১৯১৬ : এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। গোরখপুর গভর্ণমেন্ট নরম্যাল স্কুলে সহকারী শিক্ষকের পদে উন্নতি।

১৯১৭ : "সপ্ত সরোজ" (গ) এবং "নবনিধি" (গ) প্রকাশ।

১৯১৮ : "সেবাসদন" (উ) এবং "মহাত্মা শেখ সাদি" (জী) প্রকাশিত।

১৯১৯ : বি এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। "রুথী রাণী" (উ) প্রকাশ।

১৯২০ : "প্রেম বত্রিশী" (গ) এবং "প্রেম পূর্ণিমা" (গ) প্রকাশ।

১৯২১ : গান্ধীজীর আহ্বানে সরকারী চাকুরিতে ইস্তফা, কানপুর মারোয়ারী স্কুলে প্রধান শিক্ষকরূপে যোগদান। বাজার-এ-হুস্‌ন্‌" (উ) ও "বরদান" (উ) প্রকাশিত।

১৯২২ : মারোয়ারী স্কুল থেকে পদত্যাগ এবং কাশী বিদ্যাপীঠে যোগদান। "প্রেমাশ্রম" (উ) প্রকাশ।

১৯২৩ : "প্রেম পঁচিশী" (গ) এবং "সংগ্রাম (না) প্রকাশিত।

১৯২৪ : "কারবালা" (না) এবং "প্রেম প্রসূন" (গ) প্রকাশিত।

১৯২৫ : "রঙ্গভূমি" (উ) এবং "প্রেম-প্রতিমা" (গ) প্রকাশিত।

১৯২৬ : "কায়াকল্প" (উ) "প্রেম দ্বাদশী" (গ) এবং "প্রেম প্রমোদ (গ) প্রকাশিত।

১৯২৭ : "নির্মলা" (উ) ও "খোয়াব-ও-খয়াল" প্রকাশিত।

১৯২৮ : "গল্প সমুচ্চয়" (গ) প্রকাশিত।

১৯২৯ : "অগ্নি সমাধি" (গ) "বকমালোঁ কে দর্শন", "বেওয়া" (উ) "চৌগন-এ-হস্তি" (উ) "ফিরফৌস-এ-খয়াল", "গল্প রত্ন" (গ) "গোশা-এ-অফিয়াত" (উ) "হাব-এ-ওয়াতন কে কিস্‌সে মারুফ" (গ) "পঞ্চ-ফুল" (গ) প্রতিজ্ঞা" (উ) "প্রেম চতুর্থী" (গ) "প্রেম প্রতিজ্ঞা" (গ) "প্রেমতীর্থ" (গ) প্রকাশিত।

১৯৩০ : "প্রেম চলিশী" (গ) "প্রেম পঞ্চমী" (গ) এবং "সপ্ত সুমন" (গ) প্রকাশিত। হিন্দী মাসিকপত্র "হংস" প্রকাশনা।

১৯৩১ : হিন্দী পত্রিকা জাগরণের" পাক্ষিক থেকে সাপ্তাহিকে রূপান্তর ও সম্পাদনা আরম্ভ। "গবন" (উ) প্রকাশিত।

১৯৩২ : "কর্মভূমি" (উ) "প্রেম আউর অন্য কাহানিয়াঁ" (গ) এবং "প্রেরণা" (গ) প্রকাশিত।

১৯৩৩ : "মেরে বেহেত্রিন অফসানে" এবং "প্রেম কি বেদী" (গ) প্রকাশিত।

১৯৩৫ : "ময়দান-এ-অমল" (উ) "নবজীবন" (গ) এবং "প্রেমপীযূষ" (গ) প্রকাশিত।

১৯৩৬ : লক্ষ্ণৌ-এ "প্রগতিশীল লেখক সম্মেলনে"র প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব। "গোদান" (উ) প্রকাশিত। শেষ রচনা "মহাজনী সভ্যতা" (প্র) "হংসে"র সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত।

৮ই অক্টোবর : বারাণসীতে মহাপ্রয়াণ ॥

প্রেমচন্দের গ্রন্থসমূহের অনুবাদের তালিকার দিকে তাকালে দেখা যাবে, ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হওয়ার ক্ষেত্রে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে, শরৎচন্দ্র ছাড়া আর কেউ তাঁর জুড়ি নেই। বিদেশী ভাষায় অনুবাদের ব্যাপ্তিতে তাঁর স্থান রবীন্দ্রনাথের পরেই। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রেমচন্দ-চর্চা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা পশ্চিমবঙ্গে সর্বপ্রথম পাওয়া যায় "ভারতীয় ভাষা পরিষদ" প্রকাশিত "সন্দর্ভ ভারতী"র আগস্ট, ১৯৭৯ সংখ্যায়। এই প্রয়াস পূর্ণাঙ্গ না হলেও আন্তরিক। ইদানীং আমাদের 'জাতীয় গ্রন্থাগার' বহু পরিশ্রমে একটি প্রামাণ্য Prem chand Bibliography প্রস্তুত করেছেন। তবে এটিও একেবারে পূর্ণাঙ্গ বলে প্রকাশকগণ দাবী করেননি। বস্তুতঃ, "সন্দর্ভ ভারতী"তে উল্লিখিত কিছু কিছু গ্রন্থের নামও এই গ্রন্থপঞ্জীতে অনুপস্থিত। আমরা উক্ত দুই সূত্রের সঙ্গে অমৃত রায় কৃত "প্রেমচন্দ : কলম কা সিপাহী" মিলিয়ে নিম্নের সংক্ষিপ্ত তালিকাটি প্রস্তুত করেছি। সাধারণ পাঠক এ থেকে প্রেমচন্দের ব্যাপক জনপ্রিয়তার কিছু ধারনা পেতে পারেন।

॥ ক ॥ ভারতীয় ভাষায় (মূল ও অনুবাদ)

উপন্যাস :

১। "অসরারে ম আবিদ" বা "দেবস্থান রহস্য" উর্দুতে ৮ই অক্টোবর ১৯০৩ থেকে ১ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৫ পর্যন্ত "আওয়াজ-এ-খাল্ক" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

২। "হম খুর্মা ওয় হম সবাব," ১৯০৬? মূল উর্দু। হিন্দী রূপান্তর "প্রেমা," ১৯০৭।

৩। "কিশনা," ১৯০৭। উর্দু।

৪। "জলয়ে ইসার," ১৯১২। উর্দু।

৫। "সেবাসদন," ১৯১৮। উর্দু "বাজার-এ-হুস্ন" (১৯২১) এর হিন্দী রূপান্তর হলেও হিন্দী সংস্করণই প্রথমে প্রকাশ। এর অনুবাদ হয়েছে : অসমীয়া ("রাষ্ট্র সেবক" পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে), গুজরাটী (১৯২৭), তামিল (১৯৩০), কানাড়ী (১৯১২), তেলেগু (১৯৫৫), পাঞ্জাবী (১৯৬৯), মালয়ালাম "পবন কুসুমন" নামে ১৯৬৯ ও "সেবাসদন" নামে (১৯৫৫), সিন্ধী ("খুনী সমাজ" নামে, ১৯৩৪)

৬। 'রূঠারাণী' (১৯১৯) উর্দু ও হিন্দী। "সিন্ধী"তে অনূদিত হয়েছে।